প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩

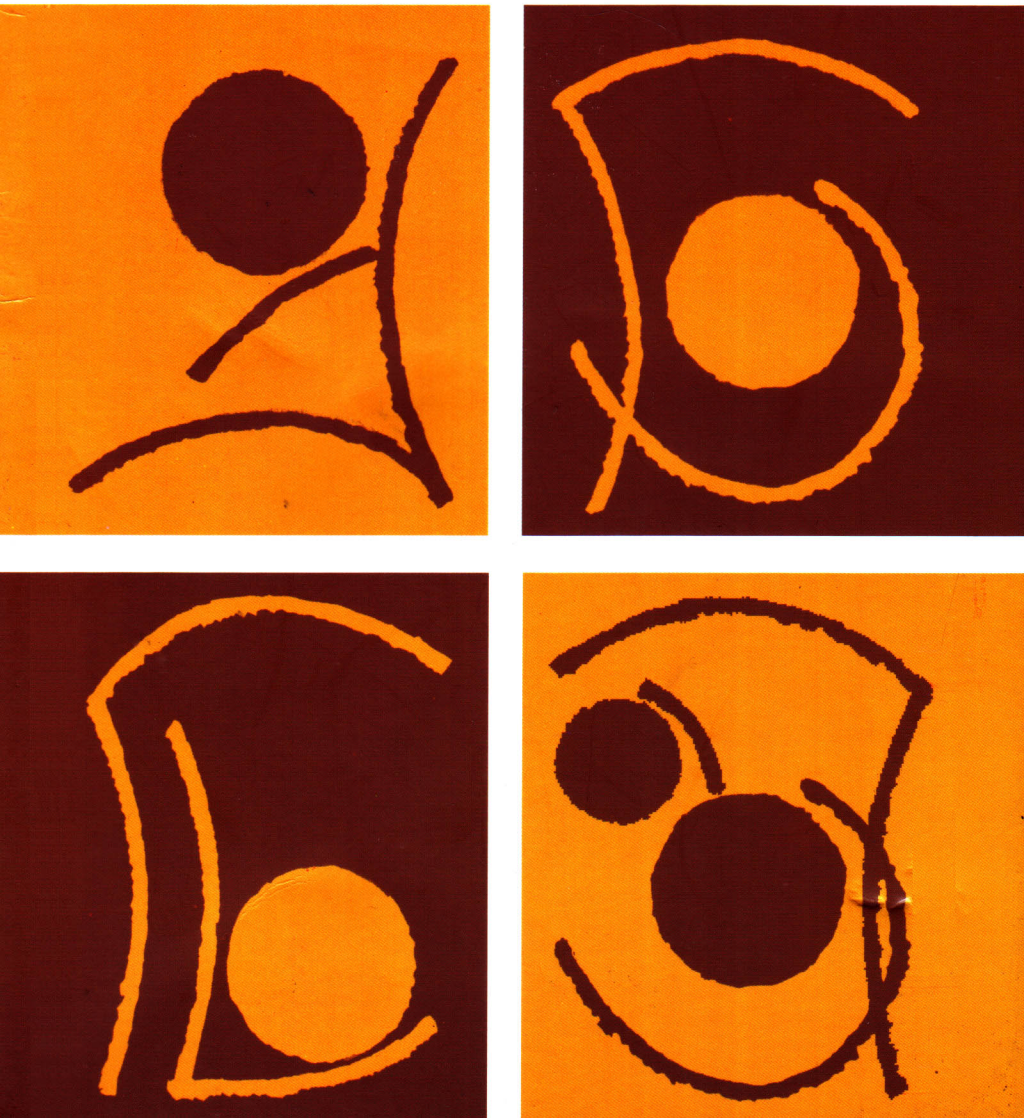

ORION is one of the largest business conglomerates in Bangladesh. With the support of dedicated professionals, **ORION** has achieved a degree of success that is unparalleled in the country's business domain.

ORION has taken the leadership in forging ahead with its operations in Pharmaceuticals; Cosmetics & Toiletries; Real Estate & Infrastructure Development; Power Generation; High-tech Agro-products; Aviation Management & Hospitality Management, and many more are in the pipeline.

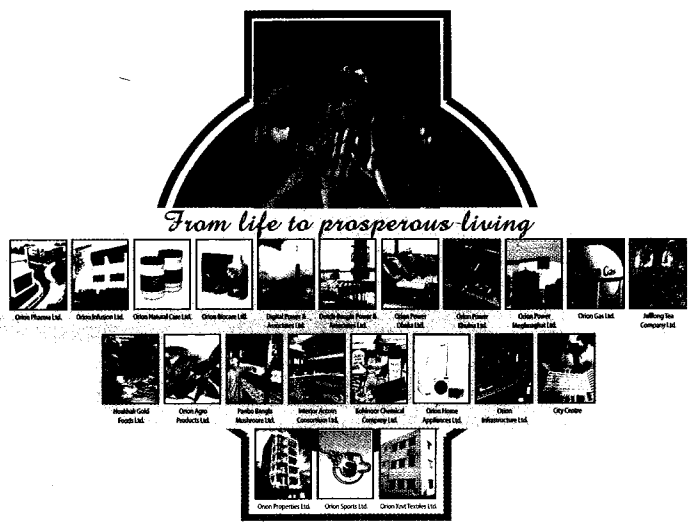

ORION
GROUP

Orion House, 153-154 Tejgaon Industrial Area, Dhaka-1208, Bangladesh
Tel: +880 2 9888494, 9888176, 9862076, 9891963 Fax: + 880 2 8826374
E-mail: orion@bol-online.com Web: www.orion-group.net

প্রতিচিন্তা

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার
ঢাকা-১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১

খাতি চিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

তৃতীয় বর্ষ ● দ্বিতীয় সংখ্যা ● ঢাকা ● অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা ২০১৩

সম্পাদক

মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; ফেলো, পিপিআরসি

উপদেষ্টা পর্ষদ

নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, লেখক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মাহবুব হোসেন, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক

সম্পাদনা পর্ষদ

নজরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; উর্ধ্বতন অর্থনীতিবিদ, ইকোসক
বদরুল আলম খান, লেখক; অধ্যাপক, সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
হাসান ফেরদৌস, লেখক; জাতিসংঘে কর্মরত
আলী রীয়াজ, লেখক; অধ্যাপক, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, অনুবাদক; ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, প্রথম আলো

প্রচ্ছদ

কাইয়ুম চৌধুরী, চিত্রশিল্পী

শিল্প নির্দেশক

অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

সহকারী সম্পাদক

খলিলউল্লাহ্, প্রতিচিন্তা

দাম : ৫০ টাকা

ওয়েবসাইট : www.protichinta.com, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

---

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
October-December Issue, 2013; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
100 Kazi Nazrul Islam Avenue (CA Bhaban), Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৬

রাজনীতি

গণতন্ত্র, উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রশক্তি ও রাজনৈতিক উন্নয়ন : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট
হোসেন জিল্লুর রহমান ৯

রাজনৈতিক দলীয় অর্থায়ন : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান ২১

সমাজ

গণজাগরণ মঞ্চ : আত্মপরিচয়ের পুনঃ অনুসন্ধান
সাঈদ ইফতেখার আহমেদ ৪৪

বাঙালি পল্টন ও তৎকালীন নারীসমাজ
মুহাম্মদ লুৎফুল হক ৬২

সাংস্কৃতিক পাঠ

ফুটপাতের চটি বই ও 'মাঝারি' গরিবের আত্মপরিচয়
সুমন রহমান ৮৬

অনুস্মৃতি

আবু জাফর শামসুদ্দীনের সাক্ষাৎকার
আমার সাংবাদিকতা জীবন, দেশভাগ ও তৎকালীন সমাজ ১০৫

বই আলোচনা

মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর কথোপকথন
মুনির-উজ-জামান ১৩৫

পরিবেশতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বাংলা বদ্বীপের রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাস
আজিজুল রাসেল ১৪৭

লেখক পরিচিতি ১৫৮

১.

প্রতিচিন্তার এবারের সংখ্যাটিও সাজানো হয়েছে রাষ্ট্র ও সমাজসম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে। রাজনীতি অধ্যায়ে হোসেন জিল্লুর রহমান উপনিবেশোত্তর বাংলাদেশে রাষ্ট্রশক্তি, গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি আল মাসুদ হাসানউজ্জামান বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থায়ন প্রসঙ্গে মূল্যায়নধর্মী বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। সমাজ অধ্যায়ে সাঈদ ইফতেখার আহমেদ বাঙালির আত্মপরিচয়ের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে পাঠকদের সামনে সাম্প্রতিক কালে গণজাগরণ মঞ্চের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেছেন। মুহাম্মদ লুৎফুল হক বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাঙালি পল্টনকে কেন্দ্র করে তৎকালীন নারীসমাজের অবস্থা কী ছিল তা তুলে এনেছেন। সাংস্কৃতিক পঠন অধ্যায়ে সুমন রহমান চটি বই নামক মুমূর্ষু শিল্পমাধ্যমটিকে ধরে শহরকেন্দ্রিক অল্পশিক্ষিত শ্রেণী, যাদের লেখক 'মাঝারি' গরিব বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন, তাদের সাংস্কৃতিক অভিলাষকে শনাক্ত করার প্রচেষ্টা নিয়েছেন।

এবারের অনুস্মৃতি অধ্যায়ে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দীনের সাক্ষাৎকারটি ছাপানো হলো। সাক্ষাৎকারটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পক্ষে ১৯৮৫ সালে গ্রহণ করেছিলেন ড. সালাহউদ্দীন আহমদ ও ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। এখানে আবু জাফর শামসুদ্দীনের সাংবাদিকতা জীবন, দেশভাগ ও তৎকালীন সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে।

বই আলোচনা অংশে এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান ও এস আর মির্জার বই *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর কথোপকথন* আলোচনা করেছেন মুনির-উজ-জামান। আর

ইফতেখার ইকবালের বই *দ্য বেঙ্গল ডেল্টা : ইকোলজি, স্টেট অ্যান্ড সোশ্যাল চেঞ্জ, ১৮৪০-১৯৪৩* নিয়ে আলোচনা করেছেন আজিজুল রাসেল। ইতিহাসের আলোকে বই দুটিকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

২.

ভবিষ্যতের বাংলাদেশের জন্য *প্রতিচিন্তা* একটি ইতিবাচক চিন্তার পাটাতন গড়ে তুলতে আগ্রহী। তাই আমরা মতবিনিময়, তর্ক-বিতর্ক ও ভিন্নপথ খোঁজার মতো পন্থাগুলোকে সব সময় উৎসাহিত করি। এই প্রেক্ষাপটে *প্রতিচিন্তায়* প্রকাশিত কোনো লেখার প্রতিক্রিয়া বা ভিন্নমত ছাপতে আমরা আগ্রহী।

৩.

প্রতিচিন্তার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা দিয়েছেন আমাদের বন্ধু ড. বিনায়ক সেন। তিনি বিগত চারটি সংখ্যায় শ্রম, মেধা ও তাঁর সার্বিক পরিকল্পনা প্রকাশ করে আমাদের কাজটিকে এগিয়ে নিচ্ছিলেন। সাম্প্রতিক কালে তিনি কিছুটা বড় ধরনের অসুস্থতায় পড়েছিলেন। এ ধরনের বড় অসুস্থতার পর তাঁর সার্বিক স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে *প্রতিচিন্তার* নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে তিনি অব্যাহতি চেয়েছেন। স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে তাঁর অব্যাহতির ব্যাপারটি আমরা মেনে নিয়েছি। বিনায়ক সেন আমাদের দীর্ঘদিনের জ্ঞানচর্চার সাথি। *প্রতিচিন্তার* নানা কাজে তাঁর সহযোগিতা আমরা পাব।

সামনের দিনগুলোতে *প্রতিচিন্তা* প্রকাশের জন্য আমাদের সব পাঠক, লেখক ও বন্ধুদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দরকার।

আশা করি, ভবিষ্যতে আপনাদের সবার সার্বিক সমর্থন পাব।

রাজনীতি

গণতন্ত্র, উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রশক্তি ও রাজনৈতিক উন্নয়ন : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

হোসেন জিল্লুর রহমান

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের বিশ্লেষণই এই প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়। এ প্রবন্ধে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রশক্তি, রাজনৈতিক উন্নয়নের অবস্থা পর্যালোচনা, ক্ষমতার যুক্তিসংগত বিন্যাস, রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার নিয়মতান্ত্রিকতা, রাজনৈতিক জগৎ ও সামাজিক জগতের যোগসূত্র বা আন্তসম্পর্কের মান ইত্যাদি মাপকাঠিতে বাংলাদেশের সার্বিক রাজনৈতিক উন্নয়নব্যবস্থার একটি মূল্যায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকের মাপকাঠিতে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়, তার অনুসন্ধানের প্রচেষ্টাটি প্রবন্ধে রয়েছে। সেই সঙ্গে আমাদের গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক উন্নয়নের বিশ্লেষণ কাঠামোর ঘাটতির দিকটিকে প্রবন্ধে গুরুত্ব দিয়ে তুলে আনা হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : রাজনৈতিক উন্নয়ন, ক্ষমতাকাঠামো, বিশ্লেষণী কাঠামো, রাজনৈতিক উন্নয়নের সূচক, স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

সূচনা

বাংলাদেশকে নিয়ে আজ অনেকে চিন্তিত। বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখনো অনেকে চিন্তিত ছিলেন, তবে চিন্তার কারণ ছিল ভিন্ন। স্বাধীনতার প্রাথমিক পর্বে দুশ্চিন্তা ছিল মূলত অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎকে ঘিরে। ৪২ বছরের ব্যবধানে দারিদ্র্যপীড়িত, সংকটাপন্ন ভঙ্গুর অর্থনীতি দৃশ্যমানভাবে অগ্রসর হয়ে এক ভিন্ন সক্ষমতা ও সবলতায় উপনীত হয়েছে। এই অর্জন এক দিনে আসেনি। কারও একক প্রচেষ্টায়ও নয়। তবে সে এক ভিন্ন গাথা। অর্থনীতি এগোলেও রাজনীতি রয়ে গেছে তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর। বিষয়টি আরও মূর্ত হয়ে উঠেছে এই জন্য

যে তিন-তিনবার—১৯৯০, ১৯৯৬ ও ২০০৮—রাজনৈতিক নবযাত্রার সুযোগ পেয়েও দেশ ও রাষ্ট্র আজ এক নতুন এবং সম্ভবত গভীরতর সংকটের সম্মুখীন। আজকের দুশ্চিন্তা তাই রাজনীতি ও রাজনৈতিক গতিধারাকে ঘিরেই।

রাজনৈতিক পরিবর্তনের ডিসকোর্স

বাংলাদেশের এই সংকট রাষ্ট্রবিজ্ঞান ডিসকোর্সের কাছে বিষয় হিসেবে অপরিচিত নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক শাসনের পশ্চাদপসরণের সময় থেকেই অনুন্নত দেশসমূহ তথা তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক বিবর্তন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে অন্যতম একটি আলোচ্য বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পেয়ে আসছে। নানা দৃষ্টিভঙ্গি ও নানা টানাপোড়েনে প্রভাবিত এই ডিসকোর্সের বিকাশ অবশ্য কোনো সরলরেখায় হয়নি। প্রাথমিকভাবে আধুনিকায়ন তত্ত্বের অতি আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য থাকলেও পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জটিল ও অনিশ্চিত সমীকরণই বিতর্ক ও ব্যাখ্যার মুখ্য উপজীব্য হয়ে ওঠে। হান্টিংটনের ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত 'পলিটিক্যাল অর্ডার ইন চেইনজিং সোসাইটিজ', এখানে ডিসকোর্সের অন্যতম পরিবর্তনের বাঁক হিসেবে ভূমিকা রাখে।[১] বিশেষ করে রাজনৈতিক উন্নয়নের (political development) পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষয়িষ্ণুতার (political decay) সম্ভাবনাও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে।

বাস্তবেও উন্নয়নশীল বিশ্বের রাজনৈতিক বিবর্তন কোনো ঐকিক রেখায় অগ্রসর হয়নি। বিশ্বায়ন, মাল্টিপোলার অর্থনৈতিক ও শক্তি কাঠামোর আবির্ভাব, প্রযুক্তি বিপ্লব, প্রাকৃতিক ভূসম্পদ বিশেষ করে তেল-গ্যাসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অসম প্রতিযোগিতাসহ আরও অনেক কাঠামোগত ও গভীর নতুন উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নশীল বিশ্বের রাজনৈতিক বিবর্তনের বিষয়টি হয়ে উঠেছে আরও জটিল ও পূর্বাভাসের (prognosis) দৃষ্টিকোণ থেকে আরও কঠিন। এই জটিলতার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথাগত সীমানা অতিক্রম করে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব (political sociology), কালচার স্টাডিজ ইত্যাদি নতুন নতুন জ্ঞান-ক্ষেত্র (domain) নির্মাণে উদ্যোগী হয়।[২] তবে এ-ও সত্যি যে, অনেক বিশ্লেষক সারগর্ভ ব্যাখ্যার চেয়ে নিছক নতুন নতুন বিশেষণ প্রয়োগেই ঝুঁকে পড়েন, যথা ছদ্ম গণতন্ত্র, নির্বাচনী গণতন্ত্র, অনুদার গণতন্ত্র, নির্বাচনী কর্তৃত্ববাদ ইত্যাদি।[৩] অন্যদিকে ১৯৮৯-এ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর কিছু কিছু অতি উৎসাহী পশ্চিমা তাত্ত্বিক বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় হয়েছে এই সিদ্ধান্ত টেনে রাজনৈতিক বিবর্তনের পুরো বিষয়টি সমাপ্ত বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, যা পরবর্তী সময়ে ভুল প্রমাণিত হয়।[৪] ফুকুয়ামা, যিনি উপরিউক্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, অবশ্য পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক পরিবর্তনবিষয়ক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ নতুন উপাদান সংযোজন করেন।[৫]

রাজনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠিতে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়?

সমকালীন ডিসকোর্সে রাজনৈতিক উন্নয়নের নানা সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ঘুরেফিরে তিনটি মৌলিক সূচক রাজনৈতিক উন্নয়নের ধারণাকে সুনির্দিষ্ট করতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। প্রথমটি হচ্ছে ক্ষমতার যুক্তিসংগত বিন্যাস বা হান্টিংটনের ভাষায় রেশনালাইজেশন অব অথরিটি। এখানে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, ক্ষমতা প্রয়োগের নিয়মতান্ত্রিকতা ও ক্ষমতাকাঠামোর মধ্যে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সূচকটি হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক সবলতা ও বিকাশ বা রাষ্ট্র নির্মাণের প্রক্রিয়া (state building)। এখানে নিছক আমলাতন্ত্রের বিকাশের কথা বোঝানো হচ্ছে না। বরং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার প্রশ্নটিকেই মুখ্য বিবেচ্য বিষয় হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। তৃতীয় সূচকটি হচ্ছে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের (political participation) পরিধির বিস্তার। এখানেও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে শুধু ভোটাধিকারের বিষয়টি একমাত্র বিবেচ্য হিসেবে ধরা হচ্ছে না। বরং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিবিধ ক্ষেত্রে সুযোগ ও প্রবেশাধিকারের প্রশ্নগুলোর দিকেই ইঙ্গিত করা হচ্ছে। উপরিউক্ত তিনটি মৌলিক সূচকের বাইরে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক এখানে বিবেচনার দাবি রাখে। প্রথমত, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার নিয়মতান্ত্রিকতা ও দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক জগৎ ও সামাজিক জগতের যোগসূত্র বা আন্তসম্পর্কের মান।

রাজনৈতিক উন্নয়নের উপরিউক্ত সূচকসমূহের মাপকাঠিতে বাংলাদেশের বাস্তবতা, বিশেষ করে ১৯৯০-পরবর্তী সময়কালের মূল্যায়ন কী হবে? প্রথমেই ধরা যাক রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার সূচকটি। এখানে অবশ্যই রাজনৈতিক উন্নয়নের একটি ন্যূনতম অগ্রগতি লক্ষ করা যায় যে গত ২০ বছরে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল একটি টেকসই দ্বিদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এটি অবশ্যই একধরনের অর্জন, তবে রাজনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠিতে শুধু এই অর্জনই বিবেচনায় রাখলে খুবই একপেশে একটি মূল্যায়ন হবে। এখানে অন্যতম বিবেচ্য বিষয়টি হচ্ছে নির্বাচনী প্রতিযোগিতাসংক্রান্ত নিয়মাবলি তথা রুলস অব দ্য গেম নিয়ে প্রতিযোগীদের মধ্যে মতৈক্য ও এসব নিয়মের সুস্থিততা। এ ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা কী?

১৯৯০ থেকে চার-চারটি জাতীয় নির্বাচনের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও নির্বাচনী রুলস অব দ্য গেম নিয়ে আমরা কোনো সুস্থির অবস্থানে উপনীত হতে পারিনি। প্রতি নির্বাচনের আগে ক্ষমতাসীন দল চেষ্টা করেছে রুলস অব দ্য গেম নিজের মতো করে সাজাতে। এই প্রবণতার ফলে প্রথম ধাক্কা আসে ১৯৯৬ সালে, যার সমাধান হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। ২০০৬-এ কিন্তু এই সমাধানও সংকট রোধ করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত এই সংকটের সমাধান হয় এক-এগারো

খ্যাত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে ২০০৮-এর নির্বাচনের মাধ্যমে। কিন্তু পাঁচ বছরের মাথায় আবারও নির্বাচনী প্রতিযোগিতার রুলস অব দ্য গেম সংক্রান্ত সংকট। এই যে বারবার সংকট তৈরি হচ্ছে, আমরা ঠেকনা দেওয়ার মতো কিছু চটজলদি সমাধান খুঁজে বের করছি, এর থেকেই রাজনৈতিক উন্নয়নের এই অন্যতম সূচকের বেহাল দশা বোঝা যায়।

রাজনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম আরেকটি সূচক হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক সবলতা বৃদ্ধি তথা রাষ্ট্র নির্মাণের প্রক্রিয়া। অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক অবয়ব এবং যেসব কাঠামোর ওপর এই অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে, যেমন: বিচারব্যবস্থা, সংসদ, আমলাতন্ত্র, স্থানীয় সরকার ইত্যাদির ধারাবাহিক মানোন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকারিতা। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক প্রসারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অগ্রগতি রয়েছে।[৬] কিন্তু গত নির্বাচনী গণতন্ত্রের দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতায় রাষ্ট্র নির্মাণের প্রক্রিয়ার এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ সূচকে একটি নেতিবাচক প্রবণতা ধারাবাহিকভাবে গেড়ে বসতে দেখা গেছে, যার ফলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন মৌলিক প্রতিষ্ঠানের মান ক্রমাগতভাবে নিম্নমুখী। এই প্রবণতা হচ্ছে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার কৌশল হিসেবে পক্ষপাতদুষ্ট নিয়োগের প্রবণতা ও তারই সুযোগে নিয়মের ব্যত্যয় ও অযোগ্যদের ব্যাপকভাবে প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বে সুযোগ করে নেওয়া। প্রথমে এটি কিছুটা লুকোছাপা ছিল। এখন কিছুই তোয়াক্কা না করার মানসিকতা এসে গেছে। আগে হয়তো আমলাতন্ত্রের একটি অংশ নিয়ে সমস্যা ছিল। এখন ধাপে ধাপে এই সমস্যা সর্বজনীন হয়েছে। বিচারব্যবস্থাতেও এই রোগ সংক্রমিত হয়েছে। আমলাতন্ত্র, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাঙ্গন, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান—কোনো ক্ষেত্রই যেন এই সর্বনাশা প্রবণতা থেকে মুক্ত নয়। এই সর্বশেষ নির্বাচনী চক্রে (cycle), অর্থাৎ ২০০৯-২০১৩ সালের সময়কালে নিয়োগ-সিদ্ধান্তের মানের ধস এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক সবলতার জন্য এ এক কাঠামোগত বিপর্যয়ের সমান। এই নেতিবাচক প্রবণতার মধ্যেও কিছু কিছু খাত, যেমন ব্যাংকিং, কার্যকারিতার দিক থেকে উন্নতিই লাভ করেছিল। কিন্তু এবার এসব খাতও বিপর্যয় এড়াতে পারেনি। বর্তমান ব্যাংকিং সেক্টরের বেহাল অবস্থা থেকেই বাস্তবতা কোথায় দাঁড়িয়েছে সহজে অনুমান করা যায়।

রাজনৈতিক উন্নয়ন মূল্যায়ন করার জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে ক্ষমতাকাঠামোর মধ্যে যুক্তিসংগত ভারসাম্য ও জবাবদিহির নিশ্চয়তা। এক দিক থেকে বলতে গেলে একটি ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাঠামো বাংলাদেশে বিদ্যমান আছে। নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা বা সংসদ, বিচার বিভাগ ছাড়াও বেশ কয়েকটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি রয়েছে, যথা নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন ইত্যাদি। ভারসাম্য ও জবাবদিহির এই প্রাতিষ্ঠানিক

অবয়বের আনুষ্ঠানিক উপস্থিতি থাকলেও স্বাধীনতা-উত্তর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার একটি অব্যাহত প্রবণতা হয়েছে ক্ষমতার বিন্যাস ও প্রয়োগে নিরন্তর এককেন্দ্রিকতা। এই প্রবণতা সর্বশেষ নব্বই-পরবর্তী গণতান্ত্রিক শাসনামলেও শুধু যে অব্যাহত ছিল তা নয়, এককেন্দ্রিকতা কার্যত রাষ্ট্রের মৌলনীতিতে উপনীত হয়েছে। এই প্রবণতা সর্বোচ্চ রূপ পেয়েছে বর্তমান সরকারের আমলে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী একাধারে নির্বাহী প্রধান, আইনসভা প্রধান (সংসদ নেতা), নিয়োগ ক্ষমতা ও সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন অনুমতির ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়ার সুবাদে বিচার বিভাগের একচ্ছত্র প্রভাবের অধিকারী ও দলীয় প্রধান। এই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার এককেন্দ্রিকতা নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে অসম্ভব ক্ষমতাধর এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে, যার প্রভাবে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিছক আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। ক্ষমতার এই এককেন্দ্রিকতা আরও উৎসাহিত হয়েছে পুরো রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক জগতে এক মনস্তাত্ত্বিক আবহ তৈরি হওয়ার মাধ্যমে, যেখানে তোষামোদি দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠেছে সহজাত প্রবণতা এবং ভিন্নমত প্রদর্শনের সাহসিকতা একেবারে অনুপস্থিত। এর ফলে দেখা যাচ্ছে, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান-প্রধানেরা জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে আজ্ঞাবহ হওয়া ও তার মাধ্যমে পদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চয়তা তৈরিতেই মনোনিবেশ করেছেন।

রাজনৈতিক উন্নয়নের এই সূচকে তাই দেখা যাচ্ছে দুই দশকেরও বেশি সময়কাল ধরে বিদ্যমান সংসদীয় গণতন্ত্রে ভারসাম্যহীন ও চরমভাবে কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতাকাঠামোই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জোরদার হয়েছে এবং তা শুধু রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অভ্যন্তরে নয়, রাজনৈতিক দল পরিচালনার ক্ষেত্রেও। রাজনৈতিক প্রতিযোগীর উপস্থিতি এবং গণমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজে ভিন্নমত প্রকাশের একটি প্রবণতা সচল থাকায় বিদ্যমান রাজনৈতিক শাসনকে চিরায়ত স্বৈরতান্ত্রিক মডেলে রূপান্তরিত হতে হয়তো কিছুটা বাধা দিচ্ছে। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক পরিমণ্ডলে ক্ষমতার বিন্যাস ও প্রয়োগের প্রবণতা দেখলে এটি স্পষ্ট যে বাংলাদেশ রাজনৈতিক উন্নয়নের এই সূচকের ক্ষেত্রে উল্টো পথেই হাঁটছে।

রাজনৈতিক উন্নয়নের সর্বশেষ যে সূচকটি নিয়ে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গতিধারার মূল্যায়ন করা যায়, তা হলো রাজনৈতিক জগতের সঙ্গে সামাজিক জগতের আন্তসম্পর্ক। এই আন্তসম্পর্ক থাকার অর্থ হলো, রাজনীতি একটি সুস্থ সামাজিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু যোগাযোগটা ক্রমেই প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। সমাজ ও রাজনীতির মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক যে তৈরি হচ্ছে না সেটার পেছনেও কাজ করছে প্রথম সমস্যাটা, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার নিয়মগুলো কেউ মানছে না। এখন যেমন তত্ত্বাবধায়ক মানা হচ্ছে না, নিজের সুবিধামতো নিয়ম ঠিক করা হচ্ছে। এতে সুস্থ প্রতিযোগিতা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অথচ প্রতিযোগিতা

তো চলবেই সমাজে। রুলস অব দ্য গেম স্থির না হওয়ার ফলে প্রতিযোগীরা বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী; যেমন : নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী, ধর্মীয় গোষ্ঠী, তরুণ প্রজন্ম; এদের দলে টানার চেষ্টা করছে। ফলে এত দিন ধরে রাজনৈতিক পরিসরে মারামারি-কাটাকাটির পাশে আমাদের যে একটা সান্ত্বনা ছিল, সামাজিক জগৎটা অন্তত শান্ত আছে, সেই সান্ত্বনাটুকুও নষ্ট হচ্ছে। অসুস্থ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার কারণে পেশাজীবী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এখন নানা রকম বিভাজন—একজন এই দলের, তো অন্যজন আরেক দলের। শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি, আমলাদের মধ্যে দলাদলি। এটা আইনজীবী, বিচারপতি এদের মধ্যে আগে ছিল না, এখন আদালত প্রাঙ্গণেও এই সংকীর্ণ দলীয় বিভাজনের সংস্কৃতি গেড়ে বসেছে এবং এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতার অব্যাহত অবনতি ঘটাচ্ছে। এর ফলে সামাজিক জগৎ বাইরে থেকে রাজনীতির ক্ষেত্রটিকে নিয়মতান্ত্রিক হওয়ার যে প্রণোদনাটি দিতে পারত, সেটার ঠিক উল্টোটা ঘটেছে। রাজনীতির ময়দানের অগ্রহণযোগ্য প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি সমাজের মধ্যে ঢুকে গেছে।

বিশ্লেষণী কাঠামোর ঘাটতি

রাজনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠিতে বাংলাদেশের যেসব ঘাটতি ও অবনতি পূর্ববর্তী আলোচনায় ফুটে উঠেছে, তার নানা ব্যাখ্যা বিশ্লেষকেরা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এসব ব্যাখ্যা মূলত এসেছে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি (institutional economics), মার্ক্সীয় শ্রেণী ব্যাখ্যা ও তুলনামূলক রাজনীতির (comparative politics) তাত্ত্বিক ধারা থেকে।[৭] এসব বিশ্লেষণ রাজনৈতিক অনুন্নয়নের যেসব ব্যাখ্যা তুলে ধরছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর অনুপস্থিতি, এলিট সমঝোতার ব্যর্থতা ও সিভিল-মিলিটারি সম্পর্কের টানাপোড়েন ইত্যাদি। এসব ব্যাখ্যা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দুটি বড় ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

প্রথম ঘাটতি শুধু বাংলাদেশ অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ নয়। বরং অন্যান্য অনেক উপনিবেশোত্তর প্রেক্ষাপটেও সমভাবে প্রযোজ্য। পশ্চিমা বিশ্বের জাতি-রাষ্ট্র (nation-state) গঠন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য ছিল আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন (nation-formation) ও রাষ্ট্র নির্মাণের প্রশ্ন (state-formation) মৌলিকভাবে একে অপরের সম্পূরক প্রক্রিয়া হিসেবে কার্যকর ছিল।[৮] এটি সম্ভব ছিল এই কারণে যে, একই রাজনৈতিক শক্তি আত্মপরিচয় নির্মাণের 'রাজনৈতিক' কাজটি ও রাষ্ট্র নির্মাণের 'প্রাতিষ্ঠানিক' কাজটি একটি অভিন্ন জাতি-রাষ্ট্র দর্শনের আওতায় সম্পন্ন করেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের মতো অনেক উপনিবেশোত্তর দেশে জাতি-রাষ্ট্র নির্মাণের এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় একটি মৌলিক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।[৯]

ঔপনিবেশিক শাসনের পশ্চাদপসরণের দীর্ঘ সময়কালে ঔপনিবেশিক শক্তি চাপের মুখে উদীয়মান জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের জন্য রাজনীতির একটি ক্ষেত্র (space) ক্রমাগতভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেও রাষ্ট্র নির্মাণের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রটি, অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক অবয়ব ও এর মৌলিক চরিত্রের প্রশ্নে সমান্তরালভাবে পিছু হটেনি।[১০] এখানে উল্লেখ্য যে ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় নির্মিত রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র ছিল মূলত নিয়ন্ত্রণমূলক। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ছাড় কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক পরিমণ্ডলে নয়, এই দ্বৈত প্রবণতার ফলে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের সুযোগ, আগ্রহ ও পরিশ্রম একতরফাভাবে নিয়োজিত হয় আত্মপরিচয় নির্মাণের রাজনৈতিক কাজটিতে। তুলনামূলকভাবে জাতি-রাষ্ট্র বিকাশের অন্যতম অন্যদিক, অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও মৌলিক চরিত্রের যুগোপযোগী পরিবর্তনের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের আগ্রহ ও নাগালের বাইরে থেকে যায়। কিছু কিছু উপনিবেশোত্তর জাতি-রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পরবর্তী সময়ে এই কৌশলগত দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠে, অর্থাৎ জাতি-পরিচয় নির্মাণ ও রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিকাশ এই দুই মৌলিক প্রক্রিয়াকে সমগুরুত্বে ও সমান্তরালভাবে নিজেদের আয়ত্তে আনতে সফল হয়। এ ধরনের সফল উত্তরণের অন্যতম উদাহরণ মালয়েশিয়া। কিন্তু উপনিবেশোত্তর অনেক জাতি-রাষ্ট্রে এই সফলতা প্রতিষ্ঠা পায়নি।[১১]

জাতি-রাষ্ট্র নির্মাণ-প্রক্রিয়ায় এই বিপরীতমুখী প্রবণতা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অতি-আগ্রহ ও রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় ও বিকশিত করায় নিষ্ক্রিয়তা বা অপারগতা, যে উপনিবেশোত্তর ইতিহাস রচনাকে প্রভাবিত করেছে তাতে দেখতে পাই একদিকে আত্মপরিচয়ের রাজনীতি তথা identity politics কে স্বাধীনতা সুসংহতকরণ ও উন্নয়নের সমার্থক হিসেবে দেখার প্রবণতা ও অন্যদিকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোর মৌলিক চরিত্রের উপনিবেশোত্তর সময়কালেও অক্ষুণ্ন ধারাবাহিকতা। আত্মপরিচয়ের রাজনীতিতে অতি আগ্রহের ফলে উপনিবেশোত্তর সময়কালে রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক উপস্থিতির উন্নতি ও পরিশীলিত করার ধারাবাহিক কাজটি সময়ের পরম্পরায় গৌণই থেকে গিয়েছে। এরই ফলে স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিক উপস্থিতির সময়কাল বাড়তে থাকলেও রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক সবলতা মৌলিকভাবে দুর্বল থেকে গেছে।

রাষ্ট্রের রূপক হিসেবে একটা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধরলে বিষয়টি বোঝাতে সুবিধা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিক্ষা ও এর মান। শিক্ষা ও এর মান বৃদ্ধির এই মৌলিক কাজটির জন্য অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক ও মানবসম্পদ কাঠামোর কার্যকারিতার ধারাবাহিক উন্নতি ও বিকাশ। এখন সেখানে যদি একটি ছাত্রাবাসের নাম কী হবে, সেটাই সর্বোচ্চ সমস্যা ধরে

দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলন চলতে থাকে, তাহলে দেখা যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মূল উদ্দেশ্য—শিক্ষার মান—তার অবস্থা দাঁড়িয়েছে অত্যন্ত করুণ পর্যায়ে। এ রকম সমন্বয়হীন সমাজেই আত্মপরিচয় ইস্যুগুলো নিত্যনতুন অস্থিরতার জন্ম দেয়।

শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় নয়, উপনিবেশোত্তর আফ্রিকাতেও একই প্রবণতা দেখা গেছে। সদ্য স্বাধীন দেশগুলোতে একসময় বড় একটা রাজনৈতিক প্রবণতা দেখা গেল, নতুন নামকরণের মাধ্যমে আত্মপরিচয়ের প্রশ্নকে সমাধানের একটি পথ হিসেবে গ্রহণ করা। কঙ্গো নামের দেশটিকে ওই সময়ে নতুন নাম দেওয়া হয় জাইয়ের। মোবুতু বলে এক চরম দুর্নীতিবাজ শাসক বেশ ঘটা করে আত্মপরিচয়ের রাজনীতির এই নাটক করেছিলেন। দেশের নাম বদলে রাখলেন জাইয়ের, নিজের নামও বদলে করলেন মোবুতু সেসে সেকো। অবশ্য ইতিহাস দেখিয়েছে, এতে দেশের ভাগ্য বদলায়নি। আজ কঙ্গো সম্ভবত আফ্রিকার সবচেয়ে বেশি অস্থিতিশীল দেশের মধ্যে অন্যতম।

আত্মপরিচয়ের এই একপেশে ও অস্থির রাজনৈতিক প্রবণতারই আরেকটি বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে পক্ষপাতদুষ্ট ও অপেশাদারি ইতিহাস-বিতর্ক। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অন্যতম স্পর্শকাতর বিতর্ক তৈরি হয়েছে আমাদের মুসলিম সত্তা ও বাঙালি সত্তা আত্মপরিচয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে সাংঘর্ষিক কি না? এখানে অনেকে ভুলে যান আত্মপরিচয় সব সময় একটি বহুমাত্রিক বিষয় এবং এই বহুমাত্রিকতার জোরপূর্বক সমাধান কোনো সঠিক চিন্তা হতে পারে না।[১২] একটি বক্তব্য আজকাল শোনা যায় যে ১৯৪৭-কে ভুল প্রমাণিত করেছে ১৯৭১। অর্থাৎ ১৯৭১-এ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের ঐতিহাসিক যুক্তি নাকচ করেছে। ইতিহাসের নির্মোহ ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণে এই বক্তব্য কতটুকু সঠিক? সার্বিক বিবেচনায় সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, সাতচল্লিশের ভেতর দিয়েই একাত্তর জন্ম নিয়েছে। ১৯৪৭-এর প্রেক্ষাপটে মুসলিম পরিচয়কে প্রাধান্য দেওয়া রাজনৈতিকভাবে যুক্তিসংগত ছিল, যদিও দেশ বিভাগের যে ভৌগোলিক পরিণতি শেষ অব্দি হলো তা অবশ্যম্ভাবী ছিল না। ১৯৪০-এর অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের অধিবেশনে শেরেবাংলা কর্তৃক উত্থাপিত সুবিখ্যাত লাহোর প্রস্তাবে তৎকালীন বেঙ্গলকেও আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়ার পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৩]

১৯৪৭-এর দেশ বিভাগে মুসলিম পরিচয় প্রাধান্য পেয়েছিল বটে, তবে সেই রাজনৈতিক আন্দোলনের চালিকাশক্তি কারা ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর একটাই, কৃষকসমাজ ও তার ভেতর থেকে জন্ম নেওয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই কৃষকেরা, এই মধ্যবিত্তরা কারা ছিল? এরা ছিল বাংলারই সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। তারা তাদের শ্রেণী অবস্থান থেকে স্বপ্ন দেখেছিল আলাদা একটি রাষ্ট্রসত্তার ভেতর দিয়ে নিজেদের ভাগ্য বদলানোর। তখনকার প্রেক্ষাপটে মুসলিম সত্তাই তাদের আত্মপরিচয়ের অবস্থানটি তুলে ধরতে সহায়ক ছিল। কিন্তু মুসলিম সত্তা সামনে

থাকলেও পেছনের শ্রেণী বাস্তবতা ক্রিয়াশীল ছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোতে যখন পাঞ্জাবি এলিটদের নিয়ন্ত্রণ আমাদের প্রাদেশিক ও সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষা অস্বীকার করতে চাইল ও এই এলিট নিয়ন্ত্রকের সুবিধাভোগী তাত্ত্বিকেরা জোর করে একমাত্রিক আত্মপরিচয় চাপিয়ে দিতে চাইল, তখন সেই একই কৃষক/মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও তার বংশধরেরা নিজেদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালি সত্তাকে সামনে নিয়ে এসেছিল। বহুমাত্রিক আত্মপরিচয়ের একেক দিক একেক সময় নিয়ামক হয়ে ওঠে, তখন অন্য দিকগুলো অবৈধ হয়ে গেল তা কিন্তু নয়। এখানেই পক্ষপাতদুষ্ট ও একপেশে আত্মপরিচয় বিতর্কের সমস্যা। এ ধরনের বিতর্ক ও রাজনীতি যখন মুখ্য হয়ে ওঠে, তখন রাজনৈতিক ম্যানিপুলেশনের সুযোগগুলোও অনেক বেড়ে যায়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অনুন্নয়নের প্রচলিত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় আরও একটি ঘাটতি প্রতীয়মান, যেটিও আলোচনার দাবি রাখে। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন সুদীর্ঘ সময়কাল ধরে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তার অন্যতম এবং মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল রাষ্ট্রক্ষমতার বিন্যাসে প্রশাসনিক ও পুলিশি কর্তৃত্বের বিপরীতে বিচার বিভাগের তুলনামূলক দুর্বলতর অবস্থান।[১৪] প্রশাসনিক-পুলিশ কর্তৃত্বের এই আধিপত্য গড়ে উঠেছিল যে চারটি উপাদানের ভিত্তিতে সেগুলো হলো: ক. বিচার বিভাগীয় উপস্থিতির তুলনায় কাঠামোগতভাবে পুলিশের গভীরতর উপস্থিতি, খ. ফৌজদারি বিচার এবং প্রশাসনিক কার্যের সম্মিলন, গ. ফৌজদারি আইনের ব্যাপক প্রয়োগের সুযোগ এবং ঘ. ১৮৫৯ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে জেলায় দেওয়ানি-বিচার ছাড়া আর সব কার্যক্ষমতা একটি মাত্র নির্বাহী প্রধান অর্থাৎ সর্বব্যাপী জেলা কর্মকর্তার হাতে কেন্দ্রীভবন।

ওপরে বর্ণিত রাষ্ট্রক্ষমতার গতিধারা সম্পর্কে যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা থেকে আইন দ্বারা পবিত্রকৃত এক 'প্রশাসনিক স্বৈরতন্ত্রের' চিত্রই ফুটে ওঠে। ঔপনিবেশিক সময়কালে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সূচনালগ্ন থেকে সুনির্দিষ্ট দাবি ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ জেলা প্রশাসনের কাঠামোর পরিবর্তন। প্রথমত, প্রশাসনিক ও ফৌজদারি বিচার বিভাগের পৃথক্করণ এবং দ্বিতীয়ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর প্রসার। কিন্তু বাস্তবে এই দাবি পূরণ হয়নি। এই দাবির সপক্ষে যুক্তি ছিল যে প্রশাসন এবং ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার সম্মিলনের কার্যত অর্থ হলো, 'পুলিশের তদন্ত, ম্যাজিস্ট্রেটের জিজ্ঞাসা এবং আদালতের বিচার বাস্তবে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এবং প্রায়ই এক ব্যক্তির মধ্যে সমন্বিত হয়।[১৫] অভিশংসক বা আদালতে অভিযুক্তকারী এবং বিচারকের কার্যের এই আইনগত সম্মিলনের মধ্যে ছিল শাস্তিদাতা শক্তি যাকে আমরা প্রশাসনিক স্বৈরতন্ত্র হিসেবে অভিহিত করেছি এবং এটা বোধগম্য যেকোনো জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের মধ্যে এই ক্ষমতাকে পৃথক করার দাবি ওঠা উচিত। ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই দাবি

পূরণ করা হয়নি। তার পরিবর্তে চাপের মুখে ঔপনিবেশিক শাসকেরা এমনভাবে পদক্ষেপ দিল এবং কর্মনীতি উদ্ভাবন করল যার ফলে নির্বাচিত আইনসভার জন্য সীমিত রাজনৈতিক সুযোগ দেওয়া হলো কিন্তু জেলার বিচার এবং বিভিন্ন কার্যসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের ওপর জেলা প্রশাসন এবং প্রশাসনিক-পুলিশি কর্তৃপক্ষের শাস্তিদানমূলক আধিপত্য বহাল রাখা হলো। এই অবস্থা ১৯৪৭-এ ক্ষমতার 'শান্তিপূর্ণ' হস্তান্তরের দিন পর্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তিত থাকল।[১৬] কম-বেশি এই একই অবস্থা ১৯৭১-এ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরও অপরিবর্তিত রইল।

রাষ্ট্রক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসে এই 'প্রশাসনিক স্বৈরতন্ত্রের' বাস্তবতার বিপরীতে স্থানীয় সরকারগুলো একটি শাসনক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষাকারী (counter vailing) কাঠামো হিসেবে গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনামলে তো নয়ই, উপনিবেশোত্তর শাসনামলেও এমনকি নির্বাচনী গণতন্ত্রের আমলেও রাজনৈতিক নেতৃত্বের পছন্দ রয়ে গেল ভারসাম্য রক্ষাকারী স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় নয়, বরং সেই প্রশাসনিক স্বৈরতন্ত্র ব্যবস্থাপনায় যেখানে পুলিশি ও ফৌজদারি ক্ষমতা কার্যকরভাবে নির্বাহী নেতৃত্বের আওতাভুক্ত ও যেখানে পুলিশি ক্ষমতার অপব্যবহারের ওপর বিচার বিভাগের অর্থবহ নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত সীমিত।

রাজনৈতিক অনুন্নয়নের বিশ্লেষণের প্রশ্নে উপরিউক্ত প্রশাসনিক স্বৈরতন্ত্রের এই বিষয়টি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য এই অর্থে যে এই 'প্রশাসনিক স্বৈরতান্ত্রিক' ক্ষমতা আজ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার অন্যতম লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। নির্বাচনী জয়ের পর প্রশাসনিক স্বৈরতন্ত্রের বাস্তবতার বিপরীতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে জয়ী দলের সহজাত প্রবণতা হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক প্রতিযোগীকে ঘায়েলের জন্য 'প্রশাসনিক স্বৈরতন্ত্র' কাঠামোর ক্রমাগতভাবে যথেচ্ছ ব্যবহার, এমনকি এ ধরনের ক্ষমতাকাঠামোর আরও বিপজ্জনক বিস্তার। মিথ্যা মামলা, পুলিশি হয়রানি, পক্ষপাতদুষ্ট ফৌজদারি বিচার, পুলিশি ক্ষমতার পরিধি বিস্তার—এগুলো হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক শাসনের অন্যতম পরিচায়ক এবং তা এই গণতান্ত্রিক শাসনামলেই। প্রতিটি নির্বাচনী চক্রে আমরা এই প্রবণতার অবনতি দেখছি, যা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে অনেকটা কাঠামোগতভাবে অমোঘ করে তুলেছে।

উপসংহার : বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ মূল্যায়ন সহজ ব্যাপার নয়। ৪২ বছরে বাংলাদেশের ঝুলিতে বেশ কিছু শক্তির দিক সঞ্চিত হয়েছে। অর্থনীতির একটি ভিত্তি তৈরি হয়েছে, যা বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে এবং নিজেদের আয়নাতেও দারিদ্র্যপীড়িত আশাহীন একটি দেশের পরিবর্তে অগ্রসরমান দেশ (a country on the move), এই ভাবমূর্তিতে অধিষ্ঠিত করতে সহায়ক হয়েছে। একই সঙ্গে ১৯৭১-এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবে বাংলাদেশে একধরনের আকাঙ্ক্ষার বিপ্লব চলমান হয়েছে,

যা ধাপে ধাপে সমাজের দরিদ্রতম অংশকেও প্রত্যয়ী (assertive) করে তুলেছে।

এসব আশাব্যঞ্জক প্রবণতার বিপরীতে রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নে একধরনের কাঠামোগত অস্থিতিশীলতা দীর্ঘমেয়াদি রূপ নিয়েছে। ১৯৯১-এ নির্বাচনী গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তনের পর এই বাস্তবতায় তেমন পরিবর্তন হয়নি, বরং কিছু কিছু দিক থেকে গভীরতর অস্থিতিশীলতার জন্ম দিয়েছে। তিনটি প্রবণতা এখানে বিশেষভাবে বিবেচ্য। প্রথমত, নির্বাচিত নেতৃত্বের দেশ পরিচালনক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণ তথা একনায়কতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা থেকেই হচ্ছে। অন্যদিকে মাঠ-বাস্তবতা বলছে, এখানে একনায়কতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা চিরস্থায়ী করার সক্ষমতা শেষ বিচারে কোনো পক্ষেরই নেই। বাংলাদেশের ক্ষমতাকাঠামোর মধ্যে চারটি প্রধান গোষ্ঠীর কথা চিন্তা করা যায়: দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ ও সেনাবাহিনী। বাংলাদেশের মাঠ-বাস্তবতা হচ্ছে, এদের মধ্যে কোনো একটি গোষ্ঠীর পক্ষে অন্য তিনটি গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে ক্ষমতা দীর্ঘমেয়াদি করার কোনো সম্ভাবনা নেই, নিছক রাজনৈতিক শক্তির (brute force) দৃষ্টিকোণ থেকে এত সক্ষমতা একক কোনো পক্ষের নেই।

বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার অনেক উপাদান, যেমন: ধর্মীয় উত্তেজনা, আঞ্চলিক বিরোধ ইত্যাদি থাকলেও অনগ্রসরতা ও অস্থিতিশীলতার প্রশ্নে সবচেয়ে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে নির্বাচনী প্রতিযোগীদের নির্বাচনোত্তর একনায়কতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা ও এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থে উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রশক্তির জনকল্যাণমুখী পরিবর্তন না ঘটিয়ে সেই নিয়ন্ত্রণমূলক রাষ্ট্রকাঠামোকে আরও নিপীড়নমূলক পথে নিয়ে যাওয়ার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। পরিহাসের বিষয় এই যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির সূচক এটুকুতেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে, যেখানে একনায়কতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা চিরায়ত করার প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত টেকসই হচ্ছে না এবং প্রতি নির্বাচনী সাইকেলে বিরোধী দল পরের বার ক্ষমতাসীন দলে আবির্ভূত হচ্ছে।

এই 'মন্দের ভালো'ই কি বাংলাদেশের নিয়তি? ফিলিপাইনের মতো একসময়ের সম্ভাবনাময় দেশ এই ধরনের 'মন্দের ভালো' নিয়তিতেই দীর্ঘকাল আটকে পড়ে আছে। এর একটি পরিণতি হচ্ছে অর্থনীতি থেমে না থাকলেও মৌলিকভাবে উন্নততর স্তরে পৌঁছানোর সম্ভাবনা ক্রমাগত নাগালের বাইরে থেকে যায়।

'মন্দের ভালো' নিয়তি বাংলাদেশের জন্য অবশ্যম্ভাবী নয়। তবে এখানে গুণগত উত্তরণের পথ খোঁজা যতটা জরুরি, ততটা জরুরি গুণগত উত্তরণের প্রয়োজনীয়তার বিশ্লেষণাত্মক উপলব্ধি। রাজনৈতিক ও সামাজিক উভয় মহলেই এই উপলব্ধির আলোচনার বিস্তার ঘটানো জরুরি। তবে শেষ বিচারে 'মন্দের ভালো' নিয়তি থেকে উত্তরণের নিশ্চয়তা আসবে সুচিন্তিত রাজনৈতিক উদ্যোগ থেকেই। সেই উদ্যোগ রাজনৈতিক মহল থেকেই হোক অথবা বিভিন্ন শক্তির কোনো বৃহত্তর কোয়ালিশন থেকেই হোক।

তথ্যসূত্র :

১. Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, (Yale University Press, 1968).

২. Kate Nash and Alan Scott, *The Blackwell Companion to Political Sociology*, (Blackwell Publishing, 2001).

৩. এই সমালোচনার জন্য দেখুন আলী রীয়াজ, 'বাংলাদেশে গণতন্ত্র, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও ভবিষ্যত,' *প্রতিচিন্তা*, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর সংখ্যা, ২০১২, পৃষ্ঠা ৫৩।

৪. Francis Fukuyama, *End of History and the Last Man*, (Free Press, 1992).

৫. Francis Fukuyama, *Origins of Political Order*, (London: Profile Books, 2011). বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে ফুকুইয়ামার তাত্ত্বিক কাঠামো নিয়ে বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, মির্জা হাসান, 'বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়ন কেন ঘটে না?' *প্রতিচিন্তা*, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ২০১৩।

৬. The World Bank, 'Bangladesh Government that Works : Reforming the Public Sector,' Report
No- 15182, Country Development 1- South Asia Region, 1996.

৭. Mushtaq Khan, 'Markets, States and Democracy: Patron-Client Networks and the Case for Democracy in Developing Countries,' *Democratization* 12(5), 2005; William B. Milam, *Bangladesh and Pakistan: Flirting with Failure in South Asia*, (Dhaka: UPL, 2010); মির্জা হাসান, 'বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়ন কেন ঘটে না?' *প্রতিচিন্তা*, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

৮. Charles Tilly (Ed.), *The Formation of Nation-States in Western Europe*, University Press, 1975.

৯. Anthony D. Smith, *State and Nation in the Third World*, (UK: Wheat sheaf Books, 1983).

১০. Hossain Zillur Rahman, 'Landed Power and the Dynamic of Instability: Bengal State Formation under Colonial Rule and its Contemporary Significance,' Manchester University, UK, Ph.D Thesis, Department of Sociology, 1986.

১১. Ayesha Jalal, *Democracy and Authoritarianism in South Asia: A comparative and Historical Perspective*, (Cambridge University Press, 1995).

১২. Benedict Anderson, *Imagined Communities*, (UK: Verso, 1983).

১৩. Muhammad Aslam Malik, *The Making of the Lahore Resolution*, (New Delhi: Oxford University Press, 2001).

১৪. হোসেন জিল্লুর রহমান, 'বাংলার ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সমাজতত্ত্ব,' *মিরান্দা*, ৩য় বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ যুগ্ম সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯১।

১৫. B.B. Misra, 'The Administrative History of India 1834-1947,' (New Delhi: Oxford University Press, 1970).

১৬. হোসেন জিল্লুর রহমান, ১৯৯১।

প্রতি রাজনীতি চিন্তা

রাজনৈতিক দলীয় অর্থায়ন : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

আল মাসুদ হাসানউজ্জামান

সারসংক্ষেপ

বর্তমানে রাজনীতিতে অর্থের প্রভাব ব্যাপক হওয়ায় রাজনৈতিক দলীয় অর্থায়ন বিশ্বের সর্বত্র গুরুত্বপূর্ণ। দলীয় স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে দলীয় সুশাসন, জবাবদিহি এবং গণতন্ত্র বিনির্মাণের ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে, যা প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলোতে দৃশ্যমান। বাংলাদেশে গণতন্ত্র চালু থাকলেও সুষ্ঠু দলীয় কোনো অর্থায়ন ব্যবস্থা অনুসরণ করা হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট বিধিবিধানের প্রকৃত অনুসরণ নেই এবং যথাযথ তদারকের অভাব রয়েছে। এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক অর্থায়ন, দলীয় অর্থায়নের পর্যালোচনা ও প্রকাশিত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ যুক্ত করা হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : রাজনৈতিক অর্থায়ন, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন, গণপ্রতিনিধিত্বশীল আদেশ/ আরপিও, তহবিল সংগ্রহ, মনোনয়ন-বাণিজ্য, কাঠামোগত সংস্কার।

ভূমিকা

বিশ্বজুড়ে দলীয় রাজনীতি এবং নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক অর্থায়ন এক বহুল আলোচিত বিষয়। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ-নির্বিশেষে সব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক অর্থায়নের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। গণতন্ত্র ও সুশাসনের স্বার্থে রাজনৈতিক অর্থায়নের প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, অবাধ এবং যথার্থ তদারকির আওতায় আনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বস্তুত, রাজনীতিতে অর্থের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। তাই এ ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করে এবং

রাজনীতিবিদদের কর্মকাণ্ড প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর জনগণের আস্থা কমিয়ে দেয়।

প্রতিষ্ঠিত উদারনৈতিক পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশগুলোর দলীয় ব্যবস্থায় মনোনয়ন-প্রক্রিয়া, প্রচারণা ও আর্থিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ লক্ষণীয়। যেমন নিবন্ধীকরণ, যথাযথ নির্বাচনী বিধিমালা ও পাবলিক অর্থায়ন। গত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশক থেকে ওই দেশগুলোর রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রচারণাসহ দৈনন্দিন ব্যয়ে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা চালু হওয়ার পর ইতিবাচক ফলাফলের দৃষ্টান্ত প্রণিধানযোগ্য। যার মধ্যে রয়েছে দলীয় সাংগঠনিক সবলতা প্রতিষ্ঠা, আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, রাজনৈতিক সুবিধাবাদ কমানো, দলীয় মনোনয়ন-প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রায়ণ ঘটানো ইত্যাদি। বৈধ সূত্রে অর্থায়নের শর্তাবলির মধ্যে থাকে বিশেষত সম্পদের হিসাব দাখিল এবং আয়-ব্যয় নিরীক্ষণ, দলীয় মনোনয়ন-প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক করা ইত্যাদি।

সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর তহবিল ও অর্থ সংগ্রহে কোনো নিয়ন্ত্রণ লক্ষ করা যায়নি বা ছিল না। এসব দলের আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কে জনগণ অন্ধকারে থেকে যায়। কারণ, দলীয় আয়ের উৎস, আয়-ব্যয় ও হিসাব বিবরণী সম্পর্কে আলোচনা বা উন্মুক্ত নিরীক্ষা করা হয়নি। স্বচ্ছ দলীয় অর্থায়নের অভাবে যেকোনো উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে যায়। এভাবে অযৌক্তিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হতে থাকে এবং অর্থ ও পেশিশক্তির রাজনীতিতে নির্বাচনী ব্যয়ের নির্ধারিত সীমা প্রায়ই লঙ্ঘিত হয়। ১৯৯১-পরবর্তী সংসদীয় নির্বাচনগুলোতে মনোনয়ন-প্রক্রিয়া 'মনোনয়ন-বাণিজ্যে' পরিণত হয় এবং দলীয় তহবিলে অর্থের জোগান দিয়ে প্রার্থিতা লাভের প্রতিযোগিতা লক্ষ করা যায়। এভাবে দলীয় রাজনীতিতে অর্থের প্রভাব ক্রমাগতভাবে শক্তিশালী হতে থাকে।

ওই সময়ে নির্বাচনী ব্যবস্থায় আস্থার অভাব ও আন্দোলনের ফলে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে কয়েকটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও তা প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর সংঘাত নিরসনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখেনি। রাজনীতি ও নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় পারস্পরিক সহিংসতা, অবৈধ অর্থ ও পেশিশক্তির ব্যবহার অব্যাহত থেকে যায়। মতাদর্শের সংঘাত তাই অস্ত্রের সংঘাতে রূপ নেয় এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডল হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

২০০৭ সালের এক-এগারোর তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে বিভিন্নমুখী রাজনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি গৃহীত হয়। এভাবে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ তথা আরপিওতে সংশোধনী এনে রাজনৈতিক দলগুলোকে সাংগঠনিক ও আর্থিকভাবে দায়িত্বশীল রাখার বিধি চালু হয়। রাজনৈতিক দলের জন্য বাধ্যতামূলক

নিবন্ধীকরণ ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার বিধান দলীয় রাজনীতি ও নির্বাচনে নতুন মাত্রা যোগ করে এবং সচেতন মহলে প্রশংসিত হয়।

বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশে দলীয় অর্থায়নের প্রসঙ্গে রাজনৈতিক অর্থায়নের গুরুত্ব, প্রচলিত বিধিবিধান, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর চর্চা, তথ্য প্রদান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

রাজনৈতিক অর্থায়নের গুরুত্ব

রাজনৈতিক অর্থায়ন নির্বাচনী ও অনির্বাচনী খাতে রাজনৈতিক দলকে সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে নির্মিত। আমরা জানি, রাজনৈতিক দলের সুষ্ঠু পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা সাধারণ ব্যাপার নয়। একটি দলের বহুমুখী ব্যয় রয়েছে, যেমন: দৈনন্দিন পরিচালনা ব্যয় থেকে শুরু করে অফিস রক্ষণাবেক্ষণ, লজিস্টিক খরচ, বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ এবং সর্বোপরি নির্বাচনী ও প্রচারণা ব্যয়। এসব অত্যাবশ্যক খরচ রাজনৈতিক দলের ওপর প্রচণ্ড আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে। বহুমাত্রিক গভর্ন্যান্স-প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা পালন, বিশেষত রাজনৈতিক ব্যবস্থার ইনপুট ও আউটপুট কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দলের জনবল এবং আর্থিক সংগতির ওপর। এর প্রভাব পড়ে দলের কার্যকারিতা, গতিশীলতা ও প্রাতিষ্ঠানিকায়নে। বর্তমানের গণতন্ত্রচর্চায় রাজনৈতিক দলগুলো একক বা যৌথভাবে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে চায়। এ জন্য দলগুলোর জন্য জরুরি হলো প্রয়োজনীয় সম্পদ ও অর্থপ্রাপ্তি। নির্বাচনী খরচ মেটাতে দল ও দলীয় প্রার্থীরা বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ লাভ করেন বা লাভের প্রচেষ্টা চালান। বলা বাহুল্য, এখনকার নির্বাচন ও প্রচারণা ব্যয়বহুল হওয়ায় রাজনৈতিক অর্থায়ন বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে নির্বাচনী প্রচারণায় রাজনৈতিক দলগুলোই প্রধান ও সিংহভাগ ভূমিকা রাখে, তবে নির্বাচনী খরচ এবং নিত্যকার খরচের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কঠিন হওয়ায় দলীয় অর্থায়ন রাজনৈতিক অর্থায়ন হিসেবে বিবেচিত হয়। এ অর্থায়ন গণতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চায় এবং রাজনৈতিক দলের ব্যবস্থাপনাসহ প্রচারণা, মনোনয়ন, ভোটার আকর্ষণ ও সংশ্লিষ্ট কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। এটি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে তাই সমভাবে প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে বিবেচ্য। বস্তুত, জনমত গঠন, নির্বাচকমণ্ডলী ও মিডিয়াকে প্রভাবিতকরণে দলগুলো সচেষ্ট হয় এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের প্রকাশ ঘটায়। এ জন্য আলোচনা, সম্মেলন অনুষ্ঠান, সভা, র‍্যালি ও অন্যান্য কর্মসূচি নিয়ে তারা তৎপরতা চালিয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে রাজনীতি ও অর্থ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যার অর্থ হলো,

রাজনীতি-চর্চা অর্থের নিত্য জোগান ছাড়া কঠিন হয় এবং সংগঠন ও নির্বাচনে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও পাবলিক উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ অবশ্যম্ভাবী হয়। তবে রাজনৈতিক অর্থায়ন অসাধুতা, জালিয়াতিসহ অন্যান্য দোষে দুষ্ট হতে পারে।

তাত্ত্বিক আলোচনা

রাজনৈতিক অর্থায়নকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যেসব তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়, তার মধ্যে বহুত্ববাদী এবং বিনিয়োগ বা ইনভেস্টমেন্ট ধারণা দুটি অন্যতম। বহুত্ববাদী বক্তব্য হলো, parties are entrepreneurs in a profit seeking system who make the best use of maximizing votes for accomplishing targets. এভাবে গণতান্ত্রিক কাঠামোয় ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলো ইকোনমিক মার্কেটে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন লাভের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। রাজনৈতিক দলের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার কর্মসূচি বিবেচনায় রেখে আগ্রহী নির্বাচকমণ্ডলী, গোষ্ঠী ও ব্যক্তি তাদের পছন্দসই দলকে সমর্থন ও সম্পদ জোগায় এবং সংশ্লিষ্ট দল ও প্রার্থীরা অর্জিত অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহারে সচেষ্ট হয়। এখানে বাস্তবতা হলো, প্রচলিত ইকোনমিক মার্কেটে ক্ষমতা ও অর্থ অসমভাবে বিন্যস্ত থাকে এবং এই অনুকল্প অনুসরণ করে বহুত্ববাদীরা বলেন, রাজনৈতিক অর্থায়ন-সংক্রান্ত আইন দলগুলোর আর্থিক অসমতা ও অসম দলীয় সাংগঠনিক অবস্থান সামনে রেখে প্রণীত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অধিকার, সাংবিধানিক স্বাধীনতা এবং সম-সুযোগ লাভের ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার সমস্যা তৈরি হতে পারে। সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রপঞ্চটি নির্বাচন ও প্রচারণার ক্ষেত্রে কোনো রকম ব্যয়-সীমা না রাখার পক্ষে এবং এতে একটি দল বা প্রার্থী নিজের ইচ্ছামতো খরচ করার সুযোগ পায়। অন্যদিকে রাজনৈতিক সমতার বিষয়টি বিভিন্ন দলের সম-সুযোগ লাভের এবং বৈষম্যহীন প্রচারণার পক্ষে অবস্থান নেয়।

বিনিয়োগ বা ইনভেস্টমেন্ট তত্ত্ব অনুসারে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে নির্বাচনে বিজয়ী হতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রাপ্তির জন্য সব প্রতিযোগী বিপুল পরিমাণ সম্পদ ও নির্বাচনী অর্থের ব্যবহার করেন, যাকে 'স্বর্ণ সুযোগ' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধারণা অনুযায়ী বলা যায়, যতক্ষণ পুরো নির্বাচনী প্রচারণা ও কর্মকাণ্ড কিছুসংখ্যক নির্দিষ্ট দাতার করায়ত্ত ও প্রভাবাধীন থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচকমণ্ডলী বা ভোটাররা এ প্রক্রিয়াকে সামান্যই প্রভাবিত করতে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক কাঠামো তখনই বিকশিত হয়, যখন সব প্রতিযোগী দলের রাজনৈতিক অর্থায়নে ও নির্বাচনী তহবিল গঠনে সম-প্রবেশাধিকার থাকে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, রাজনৈতিক দলের অর্থ সংগ্রহ এবং রাষ্ট্রীয় সহায়তা বিশ্বে, বিশেষত পশ্চিমা দেশগুলোতে এক বহুল কথিত বিষয়। এসব রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্র নির্মাণে এবং সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে রাজনৈতিক দলের অধিকতর ভূমিকা পালন দলের জন্য অর্থ সরবরাহ প্রয়োজনীয় করে তোলে। এভাবে দলের নিজস্ব উৎস থেকে, বিশেষ করে সদস্যতা চাঁদা ও পাবলিক ডোনেশনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের পুরোনো ধারণাটি বদলে যেতে থাকে। দলীয় কর্মকাণ্ড নাগরিকের গণতান্ত্রিক জীবনের সব বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকায় রাজনৈতিক দলের জবাবদিহি ও দায়িত্বশীল আচরণ সম্পর্কে জনসচেতনতা জাগ্রত হতে থাকে। এর ফলে জনগণ এবং নিজ নির্বাচনী এলাকার কাছে দলীয় দায়িত্ব পালন, জবাবদিহি ও জনচাহিদার প্রতি প্রয়োজনীয় সাড়াদান লক্ষণীয় হয়। এ প্রক্রিয়ায় দলের ভেতরে গণতন্ত্রচর্চা, অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা পায়। প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের এ জবাবদিহি গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকায়নের প্রক্রিয়ায় স্থিতি লাভ করে। এ সঙ্গে রাজনীতির নিয়ম সম্পর্কে সাধারণ মতৈক্য, যথাযথ সংসদীয় কার্যক্রম ও বিধি প্রণয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

যুক্তি রয়েছে যে, রাজনৈতিক দলগুলোর গঠন বা কার্যক্রমকে কোনো বৈধ ব্যবস্থাধীনে বা আইনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত নয়। কারণ, এতে সংগঠন করার মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারটি ক্ষুণ্ন হতে পারে। এর বিপক্ষ মতটি হলো, দায়িত্বশীলতা বা জবাবদিহিকেন্দ্রিক এবং এর ঝোঁকটি নির্দেশ করে দলীয় কাঠামোর জবাবদিহি ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়াসংবলিত কর্মকাণ্ড। প্রকৃতপক্ষে উন্নত ও উন্নয়নশীল অনেক গণতন্ত্রেই ওই দ্বিতীয় মতটি প্রাধান্য পেয়েছে এবং এসব ব্যবস্থায় দলীয় সংগঠন পরিচালনায় সুস্পষ্ট বিধি ও নীতিমালা রয়েছে, যার লক্ষ্য থাকে রাজনৈতিক ও আর্থিক দুর্নীতিমুক্ত দলীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। এসব বিধিবিধান গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার বা দলীয় প্রাতিষ্ঠানিকায়নের পরিপন্থী নয়, যার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক দেশগুলোর দলীয় সাংগঠনিক স্থিতিশীলতায়, নেতৃত্বের পরিবর্তনে ও বিকাশে এবং দলীয় গণতন্ত্রচর্চায়।

রাজনৈতিক দল এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের জন্য রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে। এর বিপক্ষে যে যুক্তি দাঁড় করা হয়, তা হলো রাজনৈতিক অর্থায়ন দলীয় নেতৃত্ব, প্রার্থী এবং অনুসারী ও নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। দল ও প্রার্থীদের অর্থের বিভিন্ন উৎসের ওপর নির্ভরতা আর্থিক অসমতাসহ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভারসাম্যহীনতা প্রতিষ্ঠার কারণ হয়। এভাবে প্রার্থীদের নিজ নিজ দল ও নেতৃত্বের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা হ্রাসপ্রাপ্ত হলে দ্বিমুখী যোগাযোগ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সিদ্ধান্ত-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ সীমিত হয়ে পড়ে।

উপরন্তু রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন, বিশেষত বড় দলগুলো এবং চলমান ক্ষমতার কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করে। এর ফলে নতুন এবং ছোট রাজনৈতিক দলের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং জাতীয় প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানে যথাযথভাবে তারা প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হয়। বস্তুত রাষ্ট্রীয় অর্থ হচ্ছে করদাতাদের প্রদত্ত অর্থ, যাদের এ ব্যাপারে পছন্দের কোনো সুযোগ নেই এবং গ্রহীতা দল ও প্রার্থীদের প্রতি তাদের সমর্থন না-ও থাকতে পারে। অধিকন্তু এ অর্থায়নের ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় রাখে না, যা মানবকল্যাণ ও অবকাঠামোর জন্য অধিক বা প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পরিমাণকে সীমিত করতে পারে। আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের নিজস্ব স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করতে পারে এবং সুশীল সমাজ ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সংযোগের মাত্রা হ্রাস করে সুষ্ঠু প্রতিষ্ঠান গঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে।

উপরিউক্ত নেতিবাচক যুক্তি থাকা সত্ত্বেও ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয় যে, রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন এক প্রয়োজনীয় ব্যয় এবং গণতান্ত্রিক উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন নয়। এ ব্যবস্থার সঙ্গে এক স্বচ্ছতার প্রক্রিয়া নির্মাণ করা হয়, যেখানে দলীয় সংগঠনগুলো তাদের অর্থের প্রয়োজনীয়তা মেটায় এবং পার্টির গভর্ন্যান্স সুষ্ঠু হয়। এ অর্থায়ন নির্বাচনী রাজনীতিতে অর্থ ও পেশিশক্তিকে দুর্বল করে এবং আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। এভাবে দল ও প্রার্থী অর্থদাতাদের নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য চাপমুক্ত থেকে তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে ও পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতি এবং প্রভু-অধস্তন সম্পর্কের কুপ্রভাব দূর হয়। এর ইতিবাচক প্রভাব সংসদে ও সংসদীয় রাজনীতিতে লক্ষণীয় হয় এবং কাঠামোগত সংস্কার সাধন সম্ভবপর হয়। নিয়মিত দলীয় আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব দাখিল এবং এতে জনপ্রবেশাধিকার থাকলে সংশ্লিষ্ট সবার দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন সুনিশ্চিত হয়। কাজেই কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন অধিক গ্রহণযোগ্য এবং উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে এ জন্য রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে দৃশ্যমান হয়।

উন্নত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দল ও প্রার্থীরা নিজস্ব উৎস ছাড়াও ব্যক্তি, সদস্যতা ফি, অর্থদাতা এবং রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন লাভ করে থাকে। ব্রিটেনে ঐতিহ্যিকভাবে রক্ষণশীল দল অর্থ সংগ্রহে তার নিজ নির্বাচনী এলাকাসহ ব্যক্তি এবং করপোরেট ডোনেশনের ওপর নির্ভর করে। এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন এ দলের আয়ের প্রায় ৩০ শতাংশ পূরণ করে। শ্রমিক দলের ডোনেশন আয় প্রায় ৬৫ শতাংশ, যা ট্রেড ইউনিয়ন ইনকাম ও দাতাদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য যেসব সুবিধা সরবরাহ করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে বিনা মূল্যে

ডাক-সুবিধা ও বিভিন্ন সভাকক্ষের ফ্রি ব্যবহার, ইনহেরিট্যান্স ট্যাক্স রিলিফ, মিডিয়া, গণযোগাযোগের সুবিধা ইত্যাদি। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পাবলিক ফান্ডিং তথা রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের বিধান রয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীরা প্রাইমারি ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রচারণার জন্য ফেডারেল সরকারের কাছ থেকে লাভ করেন। জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের জাতীয় মনোনয়ন কনভেনশনের জন্য ফেডারেল অর্থ পেয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ইলেকটোরাল কমিশনের বিধি মোতাবেক একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ৫ শতাংশ ভোট পেয়ে থাকলে ফেডারেল সরকারের আর্থিক সহায়তা লাভ করবেন। এ ছাড়া প্রাইমারি ইলেকশনের জন্য ম্যাচিং ফান্ডের ব্যবস্থাও সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রচারণা অর্থায়নের এক অন্যতম উৎস হচ্ছে প্রাইভেট পর্যায়ের আর্থিক সহায়তা। জার্মানিতে রাজনৈতিক দলগুলো ৫০ শতাংশ আর্থিক ব্যয় রাষ্ট্রীয় ফান্ড থেকে গ্রহণ করে। ফ্রান্সে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীরা ৫ শতাংশ ভোট লাভকারী হলে নির্বাচনী আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় অর্থপ্রাপ্ত হন। কানাডাতেও যেসব দল ৫০ জন প্রার্থী মনোনয়ন দেয় এবং ১৫ শতাংশ ভোট লাভ করে, তারা রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের সুযোগ লাভ করে।

উন্নত গণতান্ত্রিক বিশ্বে যেভাবে রাজনৈতিক দলীয় অর্থায়ন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তা বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে লক্ষ করা যায় না। এসব অনেক দেশেই রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আর্থিক ব্যয়ের প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক দলগুলোর তালিকাভুক্ত সদস্যতার সংখ্যাসহ হিসাব যথাযথভাবে রেকর্ড করা হয় না। প্রতিবেদন দাখিলের নিয়ম অনুসরণ করা হয় না বা অনুপস্থিত থাকে এবং এ ক্ষেত্রে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষেরও গাফিলতি রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয়-প্রক্রিয়ায় গোপনীয়তা থাকে, যা সাধারণ দলীয় নেতৃত্বের করায়ত্ত থাকে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোকে নৈতিকতাহীনভাবে ভোট কিনতে এবং ভোটারদের প্রভাবিত করতে দেখা যায়। তা ছাড়া নির্বাচনী রাজনীতিতে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা, বিশেষ করে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সংশ্লিষ্ট হতে দেখা যায়, যাঁরা রাজনৈতিক দলের কাঠামোতে এবং সাংসদ পদে নির্বাচিত হতে পারেন এবং জাতীয় সিদ্ধান্ত-প্রক্রিয়াতে প্রভাব বিস্তার করে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন রকমের সুবিধা হাসিল করেন। বর্তমান সংসদে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর সংখ্যা ৫৬ শতাংশ (হাসানউজ্জামান ও আলম, ২০১০)। বিজনেস ম্যাগনেট ও ধনাঢ্য শ্রেণী দলে তাদের আর্থিক অবদানের বিনিময়ে জাতীয় নির্বাচনে নিজের ও পছন্দসই ব্যক্তির প্রার্থিতা আদায় করে এবং এ কারণে প্রায়ই নির্বাচনে নির্ধারিত ব্যয়ের মাত্রা অতিক্রম করে যায় ও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতার ফলে দল ও প্রকৃত রাজনীতিবিদেরা তাঁদের সাংগঠনিক স্বাধীনতা ও ক্রিয়াশীলতা হারিয়ে ফেলেন।

বাংলাদেশের চিত্র

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও নির্বাচনী প্রচারণার জন্য সদস্যতা ফি, অনুদান ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের ওপর নির্ভর করে থাকে। সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত দলীয় অর্থায়নের ক্ষেত্রে পরিষ্কার কোনো নিয়মনীতির অনুপস্থিতিতে দলগুলো উপরিউক্ত উৎস ছাড়াও অনৈতিক ও অবর্ণিত উপায়ে অর্থ ও তহবিল সংগ্রহ করেছে। সংঘাতময় রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার কারণে প্রায়ই নিয়মনীতির তোয়াক্কা করা হয়নি। প্রতিযোগীকে পরাস্ত করার প্রাণান্ত প্রয়াসে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নির্বাচনী ব্যয় করা হয়েছে। এসব সম্ভব হয়েছে মূলত দ্বন্দ্বময় রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, পারস্পরিক অবিশ্বাস, সহিংস আচরণ, সন্ত্রাসের প্রশ্রয়দান ইত্যাদি নেতিবাচক উপাদানের উপস্থিতির কারণে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে গণপ্রতিনিধিত্বশীল আদেশের সংস্কার এবং সেই অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক নিবন্ধীকরণ চালু হয়। কোনো কোনো দেশের সংবিধানে দল গঠন সম্পর্কে বিধি থাকলেও বাংলাদেশের সংবিধান দল গঠন বা পরিচালন সম্পর্কে নীরব। কাজেই এ ক্ষেত্রে আরপিওতে সংযুক্ত নববিধানকে যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলা চলে। এ বিধানমতে, নিবন্ধিত দলের কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সব পর্যায়ের কমিটিকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হতে হবে, যাতে দলের ভেতরে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাসহ অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রচর্চার নিশ্চয়তা থাকবে। এ ক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হচ্ছে দলের মনোনয়ন-প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রায়ণ ঘটানো, যাতে দলগুলো প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার জন্য তৃণমূল পর্যায়ের কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্যানেল থেকে প্রার্থী বাছাই করবে।[১] এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট এলাকার যোগ্যতাসম্পন্ন সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ প্রার্থীরা যেন মনোনয়ন লাভের সুযোগ লাভ করেন এবং এ প্রক্রিয়া নির্বাচনী রাজনীতিতে ও প্রতিযোগিতায় অর্থের প্রভাব দূর করতে সহায়ক হবে। তবে ওই নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটে, যার উদাহরণ বৃহৎ দলগুলোর ক্ষেত্রে দেখা গেছে। অতীতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সর্বোচ্চ পর্যায়েই মনোনয়ন চূড়ান্ত হয়েছে, ফলে স্থানীয় কমিটির সুপারিশ উপেক্ষিত থেকেছে। জানা যায়, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আরপিও বিধিটি যথাযথভাবে আওয়ামী লীগে অনুসারিত হয়েছে। পার্লামেন্টারি বোর্ডের কাছে পাঠানো নির্বাচনী এলাকার প্রার্থী তালিকা প্রেরণ করা হলেও ওই তালিকা থেকে মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে শীর্ষ নেতৃত্ব নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অপর দিকে বিএনপিতে তৃণমূল কমিটির মনোনয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা-সংক্রান্ত ওই বিধি অনুসরণ লক্ষণীয় হয়নি, বরং শীর্ষ নেতৃত্বই মূল ভূমিকা রাখে।

১৯৯১-পরবর্তী সময়ের নির্বাচনগুলোতে বাংলাদেশের প্রধান দলগুলোর প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়াকে 'মনোনয়ন-বাণিজ্য' হিসেবে মন্তব্য করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় 'অর্থ যার মনোনয়ন তার' বিষয়টি যেন অগ্রাধিকার পেয়েছে। ফলে অর্থের এ প্রতিযোগিতায় বিত্ত-বৈভবহীন প্রকৃত বেশ কিছুসংখ্যক রাজনীতিক টিকে থাকতে পারেননি।

বাংলাদেশের নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সংবিধানে দলীয় অর্থায়নের উৎস সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে ৪৭ ধারার (ক) থেকে (ঞ) অংশে বর্ণিত এ দলের তহবিলের উৎস নিম্নরূপ: প্রত্যেক কাউন্সিলরের ১০০ টাকা হারে চাঁদা; কার্যনির্বাহী সংসদের সব কর্মকর্তা ও সদস্যের নির্দিষ্ট হারে মাসিক চাঁদা, আওয়ামী লীগের বর্তমান সংসদ সদস্যদের প্রত্যেকের মাসিক ৫০০ টাকা হারে চাঁদা, প্রত্যেক জেলার মঞ্জুরি ফি বাবদ ১০০ টাকা, এ দলের প্রচারপত্র, পত্রপত্রিকা, পুস্তিকা, বুলেটিন ও বিভিন্ন প্রকাশনার বিক্রয়লব্ধ অর্থ, এককালীন দান-অনুদান, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ এবং প্রাথমিক সদস্য ও নবায়নের জন্য ত্রিবার্ষিক চাঁদা। এভাবে ৪৭(২), (৩), (৪) এবং ৪৮ ধারায় আওয়ামী লীগের জেলা ও মহানগর, উপজেলা, ইউনিয়ন, পৌর, ওয়ার্ড ও সংসদীয় দলের তহবিল এবং তহবিল পরিচালনার প্রসঙ্গে গঠনতন্ত্রে উল্লেখ রয়েছে। ওই সংগৃহীত অর্থ যেকোনো তফসিলি ব্যাংকে জমাকরণ এবং সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে ওঠানোসহ দলের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলে নিরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করার বাধ্যবাধকতা আছে (গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২৪ জুলাই ২০০৯-এ অনুষ্ঠিত জাতীয় কাউন্সিল কর্তৃক সংশোধিত ও অনুমোদিত, পৃষ্ঠা-২৭-২৯)।

৮ ডিসেম্বর ২০০৯-এ সংশোধিত বিএনপির গঠনতন্ত্রের ১০ নম্বর ধারায় দলের কোষাধ্যক্ষের ফান্ড সংগ্রহ ও পরিচালনা সম্পর্কে বলা হয়েছে, সংগঠনের হিসাব যেকোনো কমার্শিয়াল ব্যাংকে জমা ও উত্তোলনে কোষাধ্যক্ষ, দলীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরের প্রয়োজন। এই দলের হিসাব প্রতিবছর নিরীক্ষণসহ অর্থবছরের শেষ ছয় মাসের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ আবশ্যক। তহবিল সংগ্রহে সদস্যদের চাঁদা, চার্জ, অনুদান ও মনোনয়নপত্র বিক্রি হবে প্রধান মাধ্যম।

উপরিউক্ত প্রধান দুটি দলের তহবিল সংগ্রহে সমরূপতা লক্ষণীয়। উভয় দলের কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনা, ইউটিলিটি সার্ভিস, বিভিন্ন চার্জ, বিজ্ঞাপন ও প্রচারণার জন্য বর্ণিত উৎসসহ দেশ-বিদেশে দলের শুভানুধ্যায়ী, মন্ত্রী ও সাংসদেরা, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের দেয় ডোনেশন ও দান উল্লেখযোগ্য। ধারণা করা হয়, দল দুটি ও তাদের অঙ্গসংগঠনগুলোর সভা ও সমিতির সম্মেলন, সেমিনার, র‍্যালি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বর্তমান ও প্রয়াত নেতাদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন, রাজপথে

আন্দোলন ও হরতাল কর্মসূচিতে বাৎসরিকভাবে শতকোটি টাকা বা তার বেশি পরিমাণ খরচ হয়ে থাকে। দল দুটি ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় উন্নয়ন প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অর্থও ব্যবহার করেছে। দলীয় অর্থায়নে ডোনেশন অন্যতম এক উৎস হলেও এর পরিমাণ যথাযথভাবে কখনোই প্রকাশ করা হয়নি। সদস্যতা চাঁদা অপ্রতুল ও অনিয়মিত বলে জানা যায়। দলের ধনী দাতাদের দেয় বড় বড় ডোনেশন অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের অঘোষিত অর্থ বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। দলীয় নেতা-কর্মী এবং প্রতিযোগী প্রার্থীরা বিভিন্ন উপায়ে যে অর্থ সংগ্রহ করেন, তার ব্যাপক ব্যবহার হয় প্রধানত মনোনয়ন লাভে ও প্রচারণার কাজে। সাম্প্রতিক কালের তথ্য অনুসারে, প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের অর্থায়নের বেশির ভাগ অর্জিত হয় করপোরেট ব্যবসাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বা ধনিক শ্রেণীর কাছ থেকে। তবে এ ক্ষেত্রে কোনো রকম 'প্রাপ্তি রিসিট' প্রদানের খবর জানা যায়নি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে, বিশেষত নির্বাচনী রাজনীতিতে, অর্থের ব্যাপক সমাগম ও প্রতিযোগিতা এ ক্ষেত্রটির বাণিজ্যিকীকরণ করতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এভাবে পেশিশক্তির ব্যবহার এবং প্রতিযোগীদের ভোট ক্রয়ের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে।

১৯৯১-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে একধরনের দ্বিদলীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যেখানে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতৃত্বে রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছে। মাঝারি ও ছোট দলগুলো এ দল দুটির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে বড় দলের ছত্রছায়ায় নিজ নিজ ও জোটের তৎপরতা চালায়। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ও নির্বাচনী মাঠে বড় দল দুটি নিজস্ব প্রাধান্য বজায় রাখতে মরিয়া হয়ে ওঠে এবং দলীয় ফান্ডে বিশাল/ বড় ধরনের আর্থিক অবদানের বিনিময়ে অরাজনীতিক শক্তির অনুপ্রবেশ দলীয় কাঠামোতে লক্ষ করা যায়। মূলত এ কারণে নির্বাচনী কার্যক্রমে বিধি মোতাবেক নির্ধারিত আর্থিক খরচের সীমারেখা লঙ্ঘিত হয়েছে। রাজনীতি তাই ক্ষমতাপ্রাপ্তি এবং বিত্তবান শ্রেণীর দলীয় কাঠামোতে অবস্থান করে রাষ্ট্রীয় পেট্রোনেজ লাভের হাতিয়ারে পরিণত হয়। রাজনৈতিক সুযোগসন্ধানী এবং নব্য রাজনীতিক ধনী গোষ্ঠী এ ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ব্যবহার কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে। এ সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধনী অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক আমলারা। নব্বই-পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রার্থীকে ওই গোষ্ঠীগুলো থেকে মনোনয়ন দিতে দেখা যায় এবং পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম জাতীয় সংসদে নব্য ধনিক শ্রেণী তথা Nouveau riche একক বড় গোষ্ঠী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমান নবম সংসদে নির্বাচিত সাংসদদের মধ্যে ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ১৬৯। রাজনৈতিক দলগুলোর এ গোষ্ঠীর সঙ্গে আঁতাতের মূল কারণ হলো আর্থিক ডোনেশন, যা নির্বাচনী রাজনীতি ও প্রতিযোগিতার প্রধানতম উপাদান।

সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচনগুলোতে আরপিও যথাযথভাবে অনুসরণ না করায় বড় দলগুলোর প্রশ্নবিদ্ধ অর্থ সংগ্রহে কোনো দ্বিধা থাকে না, যার প্রভাব 'মনোনয়ন-বাণিজ্যে' প্রত্যক্ষ করা যায়। দুই দশক ধরে বাংলাদেশের নাগরিকেরা জাতীয় সংসদে বর্ণিত গোষ্ঠীর প্রাধান্য বিস্তার লক্ষ করছে, যা প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে গুণগত বা ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে তিরোহিত করেছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থায়ন বা তার পরিমাণ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যে ঘাটতি লক্ষণীয়। ধারণা করা যায়, এই কর্মকাণ্ডে অস্বচ্ছতা রয়েছে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ দলের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কাঠামোর মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। এ ছাড়া সাংসদ, দলীয় শুভানুধ্যায়ী, দলের বিত্তবান নেতা-কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দলীয় প্রধানের কাছে তাঁদের দেয় অর্থ পেশ করে থাকেন। দলীয় অর্থায়নের এ 'মোডাস অপারেন্ডি' কম-বেশি আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টিতে লক্ষ করা যায়। মন্তব্য করা হয়েছে, এ দেশে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নের অস্বচ্ছ প্রক্রিয়া বিদ্যমান। আর্থিক প্রতিবেদন ও নিরীক্ষিত ব্যালান্সশিটের যথার্থতা নেই এবং নির্বাচন কমিশনে প্রদত্ত তথ্য অপর্যাপ্ত। দাখিল করা প্রতিবেদন সার্বিক নয় এবং অগভীর। এ জন্য দল ও প্রার্থীর দেয় হিসাব বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করে না। আরপিওতে নির্দেশিত দণ্ডের ব্যবস্থা কদাচিৎ অনুসারিত হয়েছে। রাষ্ট্রসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষ, সিভিল সমাজ, মিডিয়া ও সংশ্লিষ্টজনের তদারকি অদ্যাবধি গঠনমূলক হতে পারেনি। দলীয় অর্থায়ন, বিশেষত নির্বাচনী প্রচারণার বাণিজ্যিকীকরণ এমন এক পরিবেশ তৈরি করেছে, যেখানে দলীয় কাঠামোর সম্পর্ক ও মনোনয়ন-প্রক্রিয়ায় অর্থনির্ভর বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। এ প্রক্রিয়ার ঝোঁক অর্থ ও সম্পদমুখী হওয়ায় নব্য রাজনীতিক ও বহিরাগত ব্যক্তিদের রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখার প্রেক্ষাপট রচনা করে। ক্রয়-বিক্রয়ের এ বাস্তবতায় সম্ভাব্য প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় ব্যাপক অর্থ ব্যয়সহ দলের প্রত্যয়ন ও দলের পক্ষে অবশেষে মনোনয়ন লাভ সম্ভবপর হয়। প্রচারণার এই বাণিজ্যিকীকরণের মূল কারণ নিহিত রয়েছে দলীয় সিদ্ধান্ত-প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীকরণ ও দলীয় কাঠামোতে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রচর্চার অভাব।

বিদ্যমান কাঠামোগত দুর্নীতি, সংসদীয় কার্যকারিতার অপ্রতুলতা এবং আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে ফারাক বাংলাদেশে দলীয় অর্থায়নে দায়িত্বশীলতার অভাব নির্দেশ করে। দলের অভ্যন্তরে ভারসাম্যের অনুপস্থিতি আর্থিক স্বচ্ছতা নির্মাণে বাধা সৃষ্টি করে, যেখানে আর্থিক কর্মসম্পাদনে এবং ডোনেশনসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নেতৃত্ব দায়িত্বশীলতার ঊর্ধ্বে থাকে। দলীয় অর্থায়নের প্রসঙ্গটি স্পর্শকাতর বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয় এবং দলীয় নেতারা অর্থ বা তহবিলের উৎস সম্পর্কে নীরবতা

অবলম্বন করে যান। দলীয় ক্ষমতাকে তাই অর্থ সংগ্রহ ও সমর্থকগোষ্ঠীকে পুরস্কৃত করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর রাজনৈতিক অর্থায়ন এখনো প্রকাশ্য বিষয় হতে পারেনি। দলের অভ্যন্তরে অর্থসংক্রান্ত তথ্য প্রদানের উদাহরণ বিরল।

রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক চর্চার ক্ষেত্রে অর্থায়ন বা তহবিল উন্মুক্তকরণ এবং রিপোর্টিং এ দেশে এক নতুন বিষয়। অতীতে আয়-ব্যয়ের যথার্থ নথিকরণ লক্ষণীয় ছিল না। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর প্রায় ৯৫ শতাংশ সাংসদ তাঁদের ব্যক্তিগত খরচের বিবরণ প্রদান করেননি। একইভাবে ২০০১ সালের নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে কোনো দলই নির্বাচনী খরচ সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিল করেনি। ২০০৮ সালে আরপিও অনুসারে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে নিবন্ধিত হয় এবং তাদের বাৎসরিক হিসাব/ প্রতিবেদন দাখিল করতে বাধ্য থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে বিধি অনুসরণে ঘাটতি ও শিথিলতা লক্ষ করা গেছে। ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বেশির ভাগ প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী হিসাবের প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনে পেশ করে বলে জানা যায়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিধি মেনে চলা এবং প্রতিবেদনের জন্য নির্ধারিত নির্দেশনা পালনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক অর্থায়ন : তথ্য প্রকাশের মাত্রা

উল্লেখ্য, সুশাসন ও গণতন্ত্র নির্মাণের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সব পাবলিক কর্মকাণ্ড এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা আনা। একইভাবে দলীয় ক্ষেত্রে, বিশেষ করে দলীয় অর্থায়নের বিষয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্বচ্ছতা ও দায়িত্ববোধ নিশ্চিতকরণ খুবই জরুরি। এটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন-আস্থা নির্মাণ করার জন্য মুখ্য, যেখানে অর্থ ও রাজনীতির মধ্যে এক পারস্পরিক বন্ধনজনিত সম্পর্ক বিদ্যমান। বস্তুত, আর্থিক বিষয়ে কোনো গোপনীয়তা অবলম্বন এবং অনির্দেশিত অর্থ পুরো অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে এবং বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে। বলা হয়, গোপন অর্থ ও দুর্নীতি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে আঘাত করে এবং সেই সঙ্গে রাজনীতিকদের আচরণকে নীতিহীন করে উন্নয়নকে শ্লথ করতে ভূমিকা রাখে, আর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি জনবিশ্বাসের অভাবসহ জনবিচ্ছিন্নতা ঘটায়।

বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র সুষ্ঠু রাজনৈতিক অর্থায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার লক্ষ্যে তাদের নিজস্ব সিস্টেমিক রাজনৈতিক পরিবেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংগতি রেখে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তা ছাড়া জাতিসংঘ, দ্য কাউন্সিল অব ইউরোপ এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের মতো সংস্থাগুলো এ লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট

বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী। উদাহরণ হিসেবে জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানে প্রার্থীদের অর্থায়নে অধিক স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠাকরণ, রাজনৈতিক দলের অর্থায়নে নিয়ন্ত্রণ আরোপ এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনামা জারির সুপারিশ করেছে। দ্য কাউন্সিল অব ইউরোপ রাজনৈতিক অর্থায়নের প্রাইভেট ও পাবলিক উৎসের মধ্যে সুষ্ঠু ভারসাম্য রাখার জন্য আইন প্রণয়ন এবং ডোনেশনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বা গোপন ডোনেশন বন্ধ করার পরামর্শ দেয়, যাতে রাজনৈতিক দলের সংগঠনের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত দূর হয়ে দলীয় স্বাধীনতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। দুর্নীতি প্রতিরোধে আফ্রিকান ইউনিয়ন কনভেনশনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রাজনৈতিক দলের তহবিল গঠনে অনিয়ন্ত্রিত প্রাইভেট অর্থ সীমিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে, যার ভিত্তি হবে স্বচ্ছতা। কারণ, প্রাইভেট-অর্থায়ন দুর্নীতির সহায়ক এবং গণতন্ত্রের জন্য প্রতিবন্ধক হতে পারে।

উপরিউক্ত পদক্ষেপ ছাড়াও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনসহ বিশ্বব্যাংক ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল রাজনৈতিক অর্থায়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে দল ও প্রার্থীদের আয়, ব্যয় ও সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশকরণ; নির্বাচনী প্রচারণার জন্য সময় ও খরচ নির্দিষ্টকরণ; প্রাইভেট ডোনেশনে নিয়ন্ত্রণ আরোপ; জনজীবনে নৈতিকতার মান নিশ্চিতকরণে কৌশল নির্ধারণ এবং স্বাধীন তদারকি সংস্থাগুলোর তৎপরতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। রাজনৈতিক অর্থ নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে বলা হয়েছে, আর্থিকভাবে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলগুলোর তুলনামূলক সুবিধা সীমিতকরণে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দলের জন্য পাবলিক ফান্ডের সরবরাহ করা দরকার। আর্থিক দুষ্টচক্রের প্রভাব মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রাইভেট ডোনেশন, করপোরেট ডোনেশন এবং বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন উৎসের ওপর খবরদারিকরণসহ রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা এনে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্বশীলতা বাড়ানো প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে যে জিনিসটি বিচার্য, তা হলো দলীয় অর্থায়ন নিজেই কোনো লক্ষ্য নয় বরং গণতন্ত্রের গুণগত মান উন্নয়নের বড় লক্ষ্য অর্জনের একটি অন্যতম মাধ্যম। বর্তমানের গণতন্ত্রে উদ্বেগের অন্যতম এক উপাদান হচ্ছে দলীয় অর্থায়নের ক্ষেত্রে দুর্নীতি আর এ দুর্নীতি প্রতিরোধে দলীয় আচরণে, বিশেষত এর আর্থিক বিষয়সংক্রান্ত তথ্য উন্মুক্তকরণে, নিয়ন্ত্রণকারী আইনি পদক্ষেপ জরুরি। কারণ, এ ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশ আবশ্যকীয় না হলে যেকোনো অর্থ যেকোনো পরিমাণে গ্রহণ করা যাবে। দুর্নীতি প্রতিরোধ ছাড়াও তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা গণতন্ত্রের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক তথ্য প্রকাশ সার্বিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা আনয়নে ভূমিকা

রাখে এবং ভোটারদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ সৃষ্টি করে, যাতে তাঁরা তাঁদের সচেতন সিদ্ধান্তটি ভোটের মাধ্যমে পেশ করতে পারেন। তথ্য প্রকাশের আবশ্যকতায় দল ও প্রার্থীরা তহবিল গঠনে এবং নিজস্ব সম্পদের ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে নৈতিক হতে পারে, যা ভোটারদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এবং রাজনৈতিক কেলেঙ্কারিমুক্ত থাকে। অধিকন্তু, এ প্রক্রিয়া নীতি বাস্তবায়নকারী সংস্থাসহ সিভিল সমাজ, মিডিয়া ও সংশ্লিষ্টদের প্রদত্ত তথ্য যাচাই করার সুযোগ এনে দেয়।

কিছুকাল আগে ইউএস এইডের এক গবেষণায় লক্ষ করা যায়, পৃথিবীর ১১৮ দেশের মধ্যে ২৮টির তথ্য প্রকাশের কোনো আইন ছিল না এবং এর মধ্যে শুধু ১৫টিতে দল ও প্রার্থীদের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও তাদের দাতাদের পরিচয় প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল। তবে উল্লেখ্য, দলীয় অর্থায়ন বা খরচের তথ্য প্রকাশের নমুনা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে ভিন্নতর হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র, নিউজিল্যান্ড ও জার্মানিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্যদান এবং পাবলিক ডিসক্লোজার-সংক্রান্ত বিধি প্রয়োগ করা হয়। কানাডায় এ ক্ষেত্রে তদারকি সংস্থার কাছে গোপন প্রতিবেদন দাখিল এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্টিংয়ের বিধি চালু আছে। ২০০৮-০৯ সালে অস্ট্রেলিয়ায় তথ্য প্রকাশ ১০ হাজার ডলারের অতিরিক্ত পরিমাণের জন্য নির্ধারিত থাকে। এভাবে রাজনৈতিক দলের বার্ষিক রিটার্ন দাখিলে প্রাপ্ত অর্থের সর্বমোট অঙ্কও পরিশোধের পরিমাণ উল্লিখিত হয়। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন ও অন্যান্য সংস্থা থেকে উল্লিখিত পরিমাণের চেয়ে বেশি অর্থ, লোন, উপহারসামগ্রী ইত্যাদি দানকারীর নাম ও ঠিকানা প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থাকে; যা নথিভুক্ত করা হয় এবং নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষণের জন্য পেশ করা হয়।

প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে অর্থায়ন বিধিবিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগে কার্যকরী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। যুক্তরাজ্যে নির্বাচন কমিশনের রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের দলিল, আয়-ব্যয়ের নথি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সম্পর্কে খবরদারি করার এখতিয়ার রয়েছে এবং কথিত তথ্যদানের ব্যর্থতাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে পারে। তা ছাড়া এ কমিশন বিচারিক প্রত্যয়ন ছাড়াই রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যালয়ে প্রবেশ এবং বইপত্র, নথি ও দলিলাদি পর্যবেক্ষণ করতে পারে। জার্মানিতে সংসদ, বুনডেসটাগের স্পিকার রাজনৈতিক অর্থায়নের বিধি ও আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল থাকেন এবং নিজেই এ জন্য ফেডারেল অডিট কোর্টের তদারকির অন্তর্ভুক্ত হন। ওই কোর্ট এভাবে নিশ্চিত করতে প্রয়াসী হন যে জন-অর্থায়ন বিতরণের আইন যেন কোনোভাবে লঙ্ঘিত না হয় এবং স্পিকার নিজস্ব দলকে এ ব্যাপারে যেন পক্ষপাতিত্ব করতে না পারেন। অন্যান্য কিছু দেশে নির্বাচন কমিশন, সংসদের রাষ্ট্রীয় হিসাব কমিটি, দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশন,

এজেন্সি ও সরকারের অডিট কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন এবং তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তদারকি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কর্মরত থাকে। এবং এ-সংক্রান্ত তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার ও পর্যালোচনার অধিকার নিশ্চিত করা হয়, যাতে জন-আস্থার ও রাজনৈতিক বৈধতার প্রকাশ ঘটে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থায়ন ও সংশ্লিষ্ট হিসাব সম্পর্কে সাংবিধানিক তদারকি সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনবিধি, ২০০৮ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) ২০০৮-এ রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থ, আয়-ব্যয়ের তথ্য প্রকাশ এবং তদারকি সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। নির্বাচনী প্রচারণার খরচ সম্পর্কে আরপিও (সংশোধিত) আইন, ২০০৯-এ উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিটি মনোনয়নপত্রে আবশ্যিকভাবে বিবরণ দিতে হবে প্রার্থীর পেশা, আয়ের উৎস, সম্পত্তির বর্ণনা, তার নিজের বা পোষ্যদের ঋণের পরিমাণ, যেকোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নিজের নামে বা যৌথ নামে অথবা নিজ পোষ্যদের নামে গৃহীত ঋণ বা লোনের পরিমাণ ও বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ।

ওই বিবরণীর সঙ্গে নির্ধারিত ফরমে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের সম্পদ/সম্পত্তি ও দেনা এবং বাৎসরিক আয়-ব্যয় এবং করদাতা হয়ে থাকলে বাৎসরিক কর রিটার্নের বিবরণ দিতে হবে। এ বিবরণীর একটি কপি যথারীতি নির্বাচন কমিশন ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে পেশ করা আবশ্যক। জনপ্রতিনিধিত্বশীল আদেশে প্রতিযোগী প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যা ১৫ লাখ টাকার অধিক হবে না। রাজনৈতিক দলগুলোর যেখানে নিজেদের প্রার্থীসংখ্যা দুই শতাধিক, সেখানে নির্ধারিত খরচের পরিমাণ হবে চার কোটি ৫০ লাখ টাকা; প্রার্থীসংখ্যা শতাধিক কিন্তু দুই শ নয়, সেখানে তিন কোটি টাকা; প্রার্থীসংখ্যা শতাধিক নয়, সেখানে এক কোটি ৭৫ লাখ টাকা এবং প্রার্থীসংখ্যা পঞ্চাশের অধিক কিন্তু এক শ নয়; সেখানে খরচ করা যাবে এক কোটি ৫০ লাখ টাকা।

আরপিও অনুসারে প্রার্থী মনোনয়নদানকারী প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত নিজস্ব আয়-ব্যয়ের যথার্থ হিসাব রাখতে হবে। এ হিসাবে পরিষ্কারভাবে প্রাপ্ত পাঁচ হাজার টাকার অতিরিক্ত ডোনেশন এবং দেয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের নাম, ঠিকানা ও ডোনেশনের পরিমাণ এবং রিসিটের উল্লেখ থাকতে হবে। এ রকম প্রতিটি দলের অর্থ যেকোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা ও পরিচালনা করতে হবে। কোনো রাজনৈতিক দলই ২০ হাজার টাকার অধিক ডোনেশন গ্রহণ করতে পারবে না, যদি না তা চেকের মাধ্যমে দেওয়া হয়।

একটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল বছরে যেকোনো ব্যক্তি, কোম্পানি বা

এনজিওর কাছ থেকে ডোনেশন লাভ করতে পারবে। তবে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ডোনেশনের পরিমাণ পাঁচ লাখ টাকা, সম্পদ বা সেবার অধিক হবে না এবং কোম্পানি বা সংগঠনের ক্ষেত্রে এটি ২৫ লাখ টাকার অধিক হবে না। কোনো নিবন্ধিত দলকেই অন্যান্য দেশ, বিদেশি দাতার সহায়তাপ্রাপ্ত এনজিও অথবা জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক নন এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে কোনো রকম উপহার, দান, ডোনেশন বা অর্থ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নদানকারী প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে সব নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৯০ দিনের মধ্যে বর্ণিত সময়ে ব্যয়কৃত সব খরচের বিস্তারিত বিবরণী নির্বাচন কমিশনের পরীক্ষণের জন্য পেশ করতে হবে। ওই খরচের মধ্যে নিজ প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় এবং পৃথকভাবে দলীয় মেনিফেস্টো, নীতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রচারণার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আরপিওতে বিধি অমান্যকারী দল ও প্রার্থীদের বিরুদ্ধে শাস্তিদানের বিধান রয়েছে। এভাবে যদি কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ওই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে নিজ ব্যয়ের হিসাব দাখিলে ব্যর্থ হয়, তবে কমিশন ওই দলকে ৩০ দিনের মধ্যে বিবরণী দাখিল অথবা ১০ লাখ টাকা জরিমানা করতে পারে। ওই ডেডলাইন ১৫ দিন বাড়ানোর পর দল পুনরায় ব্যর্থ হলে নির্বাচন কমিশন দলের নিবন্ধন বাতিল করে দিতে পারে।

বর্ণিত বিধানে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোর বিবরণী, রিটার্ন ও দলিলাদি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব ওয়েবসাইটে তা প্রকাশের উল্লেখ রয়েছে।

নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী খরচের হিসাব নিম্নের সারণি থেকে লক্ষ করা যাবে।

সারণি-১: ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী খরচের বিবরণী

ক্রমিক নম্বর	দলের নাম	সর্বমোট খরচ (টাকার অঙ্কে) ২০০৮ সালে
১.	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এমএল)	৫,৩৭,০০০
২.	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	১১,৯৮,২৬৬
৩.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩,৬০,২৬,৯৪৭

৪.	বিএনপি	৪,৪৯,৫০,০০০
৫.	গণতন্ত্রী পার্টি	৯৯,০০০
৬.	বাংলাদেশ ন্যাপ	১১,৭০০
৭.	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	১২,৩৫,০০০
৮.	বিকল্পধারা বাংলাদেশ	১৭,৮৪,০০০
৯.	জাতীয় পার্টি	১৩,৬৭,০০০
১০.	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	৭৪,৭২,৪০৮
১১.	জাকের পার্টি	৪,৫০,০০০
১২.	বিএসডি	১,৬১,০০০
১৩.	বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	১৭,২৯,০০০
১৪.	বাংলাদেশ খিলাফত আন্দোলন	৩,৮০,০০০
১৫.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	১৬,০০০
১৬.	ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	৩,০৩,০০০
১৭.	গণফোরাম	৯,৯৫,০০০
১৮.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	৫,০০০
১৯.	বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	১৫,৪৭০
২০.	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	৩,৩৬,৯৬০
২১.	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	২,৪,৮০,১৪২
২২.	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	১,৬৬,৩৮৫
২৩.	বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	৬৪,৩০০

উৎস : নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ, ২০১০।

ওই বিবরণীতে যেসব খাত দেখানো হয়, তার মধ্যে রয়েছে প্রার্থীকে দেয় এককালীন অর্থ, প্রচারণার জন্য ব্যয়, যাতায়াত খরচ, পাবলিক বা জনসভা অনুষ্ঠান, কর্মচারী-সংক্রান্ত খরচ, বাসস্থান ও প্রশাসনিক খরচ এবং বিবিধ খরচ।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রগুলোতে সর্বদাই লিখিত নিয়মকানুন এবং নিয়মের প্রকৃত চর্চার ক্ষেত্রে গ্যাপ থেকে যায়। এ পার্থক্য একইভাবে নির্বাচনী চর্চার জন্য জনপ্রতিনিধিত্বশীল আদেশের বিধিবিধান এবং রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের নির্বাচনী আচার, আচরণ, তথ্য প্রকাশ ও হিসাব দাখিলের বেলায়ও প্রযোজ্য। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ও নির্বাচন-

পরবর্তী সময়ে লক্ষ করা যায়, আরপিও অনুসারে রাজনৈতিক দলগুলো যথারীতি নিবন্ধিত হয় এবং দল ও প্রার্থীরা তাঁদের নির্বাচনী খরচের বিবরণ এবং হিসাবের প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনে পেশ করেন। তবে সচেতন গোষ্ঠী ও বহিঃস্থ তদারকি মহল বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্যদান এবং হিসাবের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সামগ্রিকতা নিয়ে প্রশ্ন রেখেছেন। দলীয় সাংগঠনিক পর্যায়ে যথাযথভাবে তাদের হিসাবের নথিভুক্তকরণে এবং আর্থিক বিবরণীর যথার্থ নিরীক্ষণে ঘাটতি ছিল বলে মন্তব্য করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলকে তাদের সমগ্র আর্থিক প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও নিয়মমাফিক করার আরপিও বিধিবিধানের প্রকৃত অনুসারী হতে লক্ষ করা যায়নি। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনও ওই ক্ষেত্রে তার নির্ধারিত তদারকিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনে প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সবলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

রাজনৈতিক দল প্রার্থীদের তথ্যদানের জন্য যে নিয়ম রয়েছে, তা দায়িত্বশীলতা অর্জনে সহায়ক হলেও পূর্ণাঙ্গ নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের 'ফরম-২০' ও 'ফরম-২১'[২]-এ প্রদত্ত তথ্য যাচাই করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টতা নেই।

প্রার্থীর নিজস্ব সঞ্চয় এবং কীভাবে তা সঞ্চয় করা হলো তা বা দায়দেনা এবং ব্যক্তিগত আবশ্যকীয় আটটি তথ্যের সঙ্গে সংযুক্ত কাগজপত্র ও অসত্য তথ্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট যাচাই-সংক্রান্ত আইনি সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনের তদারকি সম্পর্কে সাম্প্রতিক সময়ের এক সেমিনারে সাবেক একজন নির্বাচন কমিশনার মন্তব্য করেন, ভোট গ্রহণের দিন ভোটারদের ভোট ক্রয় বা প্রভাবিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগী প্রার্থীদের মুঠোফোনে ফ্লেক্সিলোডের মাধ্যমে টাকাদান এবং বিভিন্ন খাদ্যের মধ্যে, যেমন শিঙাড়ার ভেতরে টাকা গুঁজে পরিবেশনের উল্লেখ করেন, যা নির্ণয় করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা কঠিন এবং এ রকম সংস্কৃতিতে সাধুতা প্রদর্শন ভ্রান্তিসংকুল।

২০০৮ সালের আরপিও নির্দেশনা মোতাবেক সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রতিবছরের জুলাই মাসের শেষে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টিং ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষিত নিজ নিজ বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনে জমাদান বাধ্যতামূলক। এ প্রতিবেদনের সঙ্গে দলীয় আয়, ব্যয়, বিল, ভাউচারসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র জমা দেওয়ার বিধান বর্তমানে রয়েছে। নির্বাচন কমিশন মারফত জানা যায়, ৩১ জুলাই ২০১৩ তারিখের মধ্যে দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ ১৯টি দল তাদের ২০১২ সালের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন যথারীতি কমিশনে জমা দেয়। তবে কয়েকটি নিবন্ধিত দলকে প্রতিবেদন দাখিলে নিয়মনিষ্ঠ হতে দেখা যায়নি। এভাবে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (ইনু), ওয়ার্কার্স পার্টি, সাম্যবাদী দল, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মুসলিম লীগসহ অন্য কয়েকটি

দলের প্রতিবেদন দাখিলে সময় বৃদ্ধির আবেদন লক্ষণীয়। দলীয় প্রতিবেদন পেশ করা হলেও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বর্ণিত আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ অদ্যাবধি সব সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়নি বা হচ্ছে না। যা-ই হোক, বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের বরাত অনুযায়ী বার্ষিক আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে শাসক দল আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি ও প্রধান বিরোধী দল বিএনপি যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে অবস্থান করছে। ২০১২ সালের জন্য আওয়ামী লীগ প্রদর্শিত আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১০.১ কোটি টাকা ও ৯.২ কোটি টাকা, জামায়াতের আয় ৬ কোটি ৪ লাখ এবং ব্যয় ৭ কোটি ৪৩ লাখ টাকা, জাতীয় পার্টির আয় ৪.৮১ কোটি ও ব্যয় ২.২৬ কোটি টাকা এবং বিএনপির আয় ১.৭৯ কোটি এবং ব্যয় ২.২৬ কোটি টাকা। আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে বড় দল হিসেবে আওয়ামী লীগের উদ্বৃত্ত আয় বিএনপিসহ জামায়াত ও জাতীয় পার্টির ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এসব দলের আয়ের ক্ষেত্রে বর্ণিত উৎসের মধ্যে রয়েছে সদস্যতা চাঁদা, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ফি, ডোনেশন, কুপন, বুকলেটসহ বিভিন্ন পুস্তক, সাময়িকী, বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও ব্যয়ের খাতে দলীয় প্রশাসনিক খরচ, ইউটিলিটি চার্জ, বিল, মিছিল, র‍্যালি, শোভাযাত্রা, সভা অনুষ্ঠানসহ দৈনন্দিন খরচের উল্লেখ আছে। শাসক দল আওয়ামী লীগের প্রধানতম খরচের মধ্যে রয়েছে নিজস্ব দলীয় কার্যালয়ের জন্য ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে পাঁচ কোটি টাকা মূল্যের জমি ক্রয়।

নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত দলগুলোর বার্ষিক আয়-ব্যয়ের গৎবাঁধা যে বিবরণের কথা জানা যায়, তা বর্তমানের নিরিখে বাস্তবসম্মত নয় বলে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ, প্রদর্শিত তথ্যের সঙ্গে প্রকৃত চিত্র অসামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টান্ত হিসেবে সারা বছরে প্রধান দলগুলোর দৈনন্দিন, ইউটিলিটি ও প্রশাসনিক খরচ বাদে রাজধানী ঢাকাসহ দেশব্যাপী যেসব আড়ম্বরপূর্ণ কর্মসূচি, সভা, সম্মেলন, র‍্যালি, শোভাযাত্রা, হরতাল, মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার প্রকৃত খরচ প্রদর্শিত খরচের তুলনায় অনেক বেশি বলে ধারণা করা হয় (নিবন্ধ, *প্রথম আলো*, ৫ আগস্ট, ২০১৩)।

উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরে রাজনৈতিক দলসমূহের আয়-ব্যয়ের মাত্রা যাচাইকরণ নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত। তবে এখন পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে যাচাই বা তদারকি তৎপরতা দৃশ্যমান হচ্ছে না। কমিশনে পেশকৃত দলীয় বিস্তারিত আয়-ব্যয়ের বিবরণীকে অপ্রকাশিত রাখায় এ তথ্যে জনপ্রবেশাধিকার নেই। ফলে, অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে রাজনৈতিক দলসমূহের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ সুদূরপরাহত থেকে যায়।

উপসংহার

রাজনৈতিক দলগুলোর দৈনন্দিন বিষয়াদি পরিচালনা, সাংগঠনিক কার্যাবলি, দলীয় কার্যক্রম ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন, নির্বাচনী রাজনীতির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ও প্রচারণা কর্মকাণ্ডের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সংগতি, সম্পদ এবং সার্ভিস প্রাপ্তির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এসব কার্যক্রমকে অর্থবহ, কার্যকর ও সুষ্ঠু করার জন্য স্বচ্ছ দলীয় আর্থিক ব্যবস্থার বিশেষ আবশ্যকতা রয়েছে বা এর কোনো বিকল্প বর্তমানের গণতন্ত্রে নেই।

বস্তুত, যথার্থ রাজনৈতিক অর্থায়নের সংস্কৃতি গড়ে তোলা যেকোনো ধরনের গণতন্ত্রের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলোতে গত শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় থেকে রাজনৈতিক দলীয় অর্থায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের মাধ্যমে দলীয় সংগঠনগুলোর দায়িত্বশীল আচরণ ও দায়িত্বশীলতার দাবিতে বিভিন্ন কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে সংসদে যথাযথ আইন প্রণয়ন এবং তথ্য প্রকাশের জন্য বিধিবিধান জারি। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন উন্নয়নশীল গণতন্ত্রেও এ ব্যাপারে সংসদীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তদারকি কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে অর্থায়ন ও ব্যয়ের প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা, নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয়ের সীমা নির্ধারণ, তথ্য প্রকাশ, খরচ ও আর্থিক প্রতিবেদন এবং হিসাব নিরীক্ষণ ও হিসাব দাখিলের বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি। তবে এসব আইনি ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এসব রাষ্ট্রের চলমান বাস্তবতা ইতিবাচক অর্জনের চিত্র উপস্থাপন করে না।

বাংলাদেশে সুশাসন ও গণতন্ত্র সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক অর্থায়ন ব্যবস্থার বিনির্মাণ বিশেষভাবে জরুরি। এ জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে।

প্রথমত, চলমান প্রশ্নবোধক তহবিল গঠন এবং প্রচারণার অর্থ সংগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে এখন সময় হয়েছে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা, যাতে সংশ্লিষ্ট দল ও প্রার্থীদের জন্য সমসুযোগ সৃষ্টি হয়। এসব দলের জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থানুকূল্য তাদের নিত্যনৈমিত্তিক খরচ ছাড়াও নির্বাচনী ব্যয় মেটাতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন রাজনৈতিক দলগুলোকে দায়িত্বশীল করে, যা দলীয় সাংগঠনিক দক্ষতা আনয়নে অবদান রাখে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে ফারাক দূর করে, দলীয় মনোনয়ন-প্রক্রিয়ার গণতন্ত্রায়ণ ঘটায়, রাজনৈতিক সুবিধাবাদ দূর করে এবং আর্থিক ও অর্থায়ন পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের ব্যাপারে সুপারিশ রয়েছে, জাতীয় বাজেট থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ রাজনৈতিক দলীয় অর্থায়নের জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে।

এ প্রক্রিয়ায় সংসদীয় কাঠামোকে সংশ্লিষ্ট করা যায় এবং সংসদের রাষ্ট্রীয় হিসাব নিরীক্ষা কমিটিকে কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের সহায়তাক্রমে রাজনৈতিক দলগুলোর নিরীক্ষিত হিসাব পরীক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত করা সম্ভব। যেহেতু আয়ের বৈধ উৎস ও রাষ্ট্রীয় সহায়তা দলের ভেতর ব্যক্তিগত ও কায়েমি স্বার্থ প্রতিরোধ করে, সেহেতু অর্থায়নকে যত দূর সম্ভব স্বচ্ছ রাখা দরকার।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন সেসব দলের জন্য ক্রিয়াশীল হতে পারে, যেসব দল সাধারণ/ সংসদীয় নির্বাচনে সুনির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট লাভ করে বা সংসদীয় আসনে বিজয়ী হয়। যেসব দল রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে, তাদের জন্য কর সুবিধাদান এবং মিডিয়া-সহায়তা সহজলভ্য করা যেতে পারে। নির্বাচনী কর্মকাণ্ডের জন্য প্রকৃত রিসিট প্রদান সাপেক্ষে দান/ অনুদান ও ডোনেশনের ব্যবস্থা চালু থাকবে। দলের জন্য কারণিক সুবিধাদান এবং লজিস্টিক সহায়তা প্রদানও বিবেচ্য হবে। ব্রিটেনের অনুকরণে পরোক্ষ অর্থায়নের ব্যবস্থা, যেমন: দলীয় প্রার্থীদের জন্য বিনা মূল্যে ডাক-সুবিধা, মিলনায়তন ব্যবহার ও রেডিও-টেলিভিশনে সম্প্রচারের সুযোগ চালু করা যায়। রাজনৈতিক দলগুলোর কনভেনশন অনুষ্ঠান ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনেও প্রয়োজনীয় সহায়তা দান আবশ্যক।

চতুর্থত, নির্বাচন কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের জন্য জনপ্রতিনিধিত্বশীল আদেশ লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আরপিও-এর ৯১-ই ধারা সংরক্ষণসহ যথাযথভাবে কর্তৃত্বপূর্ণকরণ একান্তভাবে জরুরি। অপ্রদর্শিত বা অবৈধ অর্থের ব্যবহার বন্ধে এবং দলীয় আয়-ব্যয়ের যথার্থতা যাচাইয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরিপূর্ণভাবে ক্ষমতায়িত করা দরকার।

রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামোকেও নিজস্ব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নজরদারির ব্যাপারে শক্তিশালী করা উচিত, যাতে আর্থিক ভ্রান্তি পরিহার করে বিধান অনুযায়ী নথি সংরক্ষণে, হিসাব নিরীক্ষণে ও প্রতিবেদন দাখিলে পেশাদারি বিধি অবলম্বন করা যায়।

পঞ্চমত, অন্য যেসব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, তা হচ্ছে দলীয় অর্থায়নে বহিঃস্থ তদারকির ব্যবস্থা, ব্যক্তি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে উন্মুক্তভাবে ডোনেশন গ্রহণ, নিরীক্ষাকৃত হিসাব ও প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ, ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্যপ্রবাহ সম্প্রসারণ ইত্যাদি।

সিভিল সমাজ, সিভিক গ্রুপ এবং সংগঠিত আন্দোলনের ধারায় সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রয়োজনীয় চাপের মধ্যে রাখা, যাতে জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশের অনুসরণ ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। এই সামাজিক শক্তি একইভাবে রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক সংস্কার আনয়নে বাইরে থেকে অনুপ্রেরণা ও সমর্থন জোগাতে পারে। রাজনৈতিক দলীয় কাঠামো চর্চার ক্ষেত্রে

গণতন্ত্রসম্মত না হলে এবং আর্থিকভাবে দায়িত্বশীলতা প্রমাণ না করলে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সম্ভব হবে না। রাজনৈতিক দলীয় অর্থায়নে কাঠামোগত সংস্কারসহ দলীয় বিষয়াদির ওপর নিয়মিত গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞানের বিস্তার আবশ্যক। কঠোর শাস্তির ব্যবস্থাসহ নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যালোচনা ও বহিঃস্থ স্টেকহোল্ডাররা (সিভিক গোষ্ঠী, মিডিয়া ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী) নিয়মিত তদারকি দলের অবৈধ অর্থায়নের বিরুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। দলীয় অর্থায়নে নৈতিকতার মানদণ্ড অনুসরণ একান্তভাবে প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে কার্যকর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ বিশেষভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত। প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলো, বিশেষ করে জাতীয় সংসদ ও এর স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং বিচারিক কাঠামোর যথাযথ ভূমিকা পালন রাজনৈতিক অর্থায়নে দুর্নীতি প্রতিরোধে এবং দলে ও দেশের অরাজনৈতিক তস্কর শ্রেণীর অনুপ্রবেশ বন্ধে যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত রাখতে পারে।

টীকা

১. ২০০৯ সালে আরপিওতে তৃণমূল পর্যায়ে (ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, থানা/উপজেলা বা জেলা কমিটি পর্যায়) প্রস্তুতকৃত প্যানেল থেকে প্রার্থী বাছাইয়ের বাধ্যতামূলক অংশটি বাতিল করা হয়।

২. ফরম-২০ : [বিধি ২৯(১)]-এ নির্বাচনী ব্যয় নির্ধারণের জন্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী উল্লেখ করা আবশ্যক। এ ফরমের ছয়টি অংশে প্রার্থীর নিজস্ব আয়, আত্মীয়স্বজন থেকে ধার-কর্জ ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান, আত্মীয়স্বজন ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি থেকে ধার-কর্জ বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান এবং এসব উৎস থেকে সম্ভাব্য অর্থপ্রাপ্তি-সংক্রান্ত তথ্যদানের বিষয় রয়েছে।

ফরম-২১ : [বিধি ২৯(২)]-এ প্রার্থীর সম্পদ ও দায় এবং বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী চাওয়া হয়। এ ফরম গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি, গৃহসম্পত্তি, অন্যান্য সম্পদ, দায়সমূহের প্রকৃতি ও পরিমাণ এবং মোট আনুমানিক বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান আবশ্যক।

তথ্যসূত্র

Bangladesh Country Report, December 2004, pp. 7-8.

Corruption and Funding of UK Political Parties, The Coalition Against Corruption, TI, UK, October 2006.

Federal Election Commission of the USA, Washington DC.

'Funding and Disclosure Guide for Political Parties,' Australian Election Commission, Australia, Version-1, July 2009, p. 3.

Gene Ward, 'Overview of Disclosure and Transparency in Political

Funding in Latin America,' Vancouver, Canada, 5-6 December 2002.

Hasanuzzaman and Alam, *Political Management in Bangladesh*, (Dhaka: AH Development Publishing House, 2010).

Marcin Walecki, 'Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Political Finance', in Challenging the Norms and Standards of Election Administration (IFES, 2007), pp. 75-93.

ibid, p. 1.

Menachem Hofnung, 'Public Financing, Party Membership and Internal Party Competition,' *European Journal of Political Research*, Jan. 2006.

Money and Politics: The Case of Party Nomination in Kenya (mimeo), pp. 1-3. http://www.ndi.org/files1880_ke_cgdnominations.pdf

Muzaffer Ahmad, 'Political Party Finance', *The Daily Star*, Dhaka, 02 Feb. 2010.

National Democratic Institute Paper, 2001.

Oonagh Gay, Richard Kelly and Isobel White, 'The Funding of Political Parties,' Research Paper 07/34, 10 April, 2007, London, pp. 23-24.

Shari Bryan and Denise Baer, eds., 'Money in Politics: A Study of Party Financing Practices in 22 Countries,' National Democratic Institute, 2005, pp. 1-10.

Steve Gibbs, 'Bangladesh Political Party Assessment,' International Republican Institute, May, 2008, pp. 4-7.

Sunday Opinion: New Thoughts on Political Parties' Funding (mimeo).

Transparency International, 'Working Paper Number-10,' 2008, p. 1.

Transparency International Bangladesh, 'Transparency in Political Party Finance in Bangladesh,' October 2009, pp. 15-16.

Transparency International Policy Brief, Number-1/2005, p.1.

জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) অধ্যায় ৩ A, ইলেকশন এক্সপেনসেস, ৪৪ এএ, ৪৪ বিবি, ৪৪ সিসি।

ব্যক্তিগত আলাপচারিতার মাধ্যমে গৃহীত তথ্য রিজিওনাল স্টাডিজ ভলিউম XXX নম্বর-১, ২০১১-১২, পৃ. ৮৯-১১৬।

গণজাগরণ মঞ্চ : আত্মপরিচয়ের পুনঃ অনুসন্ধান

সাঈদ ইফতেখার আহমেদ

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলন, গুণগত এক নতুন প্রপঞ্চ যোগ করেছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা এ আন্দোলনেও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, রাজনৈতিক ও সিভিল—উভয় সমাজই ঐক্যবদ্ধভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে একটি প্ল্যাটফর্মে অবস্থান করতে ব্যর্থ হয়েছে। এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো এ ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করা। প্রবন্ধে ব্যর্থতার কারণ হিসেবে মূলত চিহ্নিত করা হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী এলিটদের ন্যূনতম জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্স প্রতিষ্ঠা করতে না পারা, যার পরিণতিতে একই জাতি-রাষ্ট্রের মধ্যে দুটো সমান্তরাল জাতিসত্তা ও জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে জাতীয় মৌলিক ইস্যুতে ন্যূনতম ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সংলাপ পরিচালনার তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: গণজাগরণ মঞ্চ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, দ্বিজাতিতত্ত্ব, সেক্যুলার মূল্যবোধ ও ন্যূনতম জাতীয় ঐক্য।

ভূমিকা

বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুণগতভাবে একটি নতুন প্রপঞ্চ (phenomenon) হলো শাহবাগকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলন, যা কিনা শাহবাগ ছাড়িয়ে সারা দেশে এবং দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনের পর গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলন হলো এ ধরনের দ্বিতীয় আন্দোলন, যা কিনা প্রচলিত নেতৃত্বের বাইরে, কিছুদিন আগেও যাঁরা অপরিচিত ছিলেন, এমন কিছু তরুণের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে—যাঁদের লক্ষ্য শুধু একাত্তরের ঘাতকদের বিচারই নয়, এর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের যে স্বপ্ন ছিল

অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ, সেটি গড়ে তোলা।[১] অর্থাৎ, এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ৪২ বছর অতিক্রান্ত হলেও বাংলাদেশে বসবাসরত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে যে আত্মপরিচয়ের সংকট রয়ে গেছে, সেই সংকটের উৎস চিহ্নিত করা এবং যে জাতীয়তার পরিচয় ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, সেই পরিচয় ফিরিয়ে আনার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছে।

আত্মপরিচয়ের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের পর ৪২ বছর অতিক্রান্ত হলেও রাজনৈতিক নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের পাশাপাশি গণমানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতার সমতা (Equitable capability) অর্জিত না হওয়ায় এ দেশের সিভিল সমাজের যে অংশ মনে করে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলে শুধু বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতার সমতা প্রতিষ্ঠিত করবে তা নয়, বরং ক্রমান্বয়ে এটি লিঙ্গীয় ও আন্তশ্রেণীর সক্ষমতার সমতা (gender and inter-class equitability) প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করবে, সিভিল সমাজের সে অংশের বর্তমান প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফল হলো আজকের গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলন।[২] কিন্তু পাশাপাশি যে বিষয়টি গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আবারও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেটি হলো জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনের সময় যেমন, বর্তমানেও তেমনি সিভিল ও রাজনৈতিক সমাজের যে অংশটি মনে করে রাষ্ট্রকাঠামোয় ধর্ম বা আরও স্পষ্ট করে বললে ইসলাম ধর্মের ন্যূনতম হলেও ভূমিকা পালন করা উচিত—তারা সযত্নে নিজেদের গণজাগরণ মঞ্চ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, যেমনটি রেখেছিল জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনের সময়ও।

বর্তমান নিবন্ধের লক্ষ্য গণজাগরণ মঞ্চের সম্ভাবনা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা নয়, অথবা রাজনৈতিক নেতৃত্বের কী কী ব্যর্থতার কারণে সিভিল সমাজের অসাম্প্রদায়িক অংশকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সক্রিয় হতে হয়েছে তরুণদের নেতৃত্বে, সেটি নিয়েও বিচার-বিশ্লেষণ করা নয়। এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো, স্বাধীনতার পর ৪২ বছর অতিক্রান্ত হলেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নে রাজনৈতিক ও সিভিল সমাজ কেন ঐক্যবদ্ধভাবে একটি প্ল্যাটফর্মে আসতে পারছে না তার উৎসমূল অনুসন্ধান করা। উৎসমূলের কারণ হিসেবে জাতীয় পরিচয় নির্ধারণ (National identity) করার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজনৈতিক এলিটদের (National political elites) সমগ্র জাতির পক্ষ নিয়ে ভূমিকা (Speak for the nation) পালন করার ব্যর্থতাকে বর্তমান নিবন্ধে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ব্যর্থতার নির্ণায়ক কারণগুলো অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে ১৯৪৭ সালের দিকে, যে সময় থেকে আমাদের জাতিসত্তার নির্মাণ

(Construction), পুনর্নির্মাণ (Reconstruction) ও বিনির্মাণের (Deconstruction) প্রক্রিয়াটি শুরু হয়, যার অনিবার্য পরিণতি হলো বাংলাদেশ নামের একটি ইউনিক জাতি-রাষ্ট্রের (Nation-state) উদ্ভব, যেখানে বিশ্বের অন্য জাতি-রাষ্ট্রগুলোর বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করে একটি রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে দুটি সমান্তরাল জাতিসত্তা ও জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছে যথাক্রমে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও ভাষাকে কেন্দ্র করে, অপর দিকে ভূমি (Territory) ও ইসলামি আলংকারিক ভাষাকে ধারণ করে। এ দ্বৈত সমান্তরাল জাতীয়তার প্রভাব মোটা দাগে দুটি সমান্তরাল সিভিল ও রাজনৈতিক সমাজের জন্ম দিয়েছে। এ দুটি সমাজের চিন্তা, চেতনা, মনন, মানসিকতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের মধ্যে যে ফারাক ঐতিহাসিকভাবে গড়ে উঠেছে, তার ফল হচ্ছে রাজনৈতিক ও সিভিল সমাজের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিতে পারার ব্যর্থতা। এরই ধারাবাহিকতার প্রতিফলন হলো যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতেও সমন্বিত অবস্থান বা পদক্ষেপ নিতে পারার ব্যর্থতা। এ সম্পর্কে আলোচনার আগে চোখ ফেরানো যাক ১৯৪৭ সালের দিকে।

পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ ও 'দ্বিজাতি'তত্ত্ব

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, যাকে তালুকদার মনিরুজ্জামান 'বাংলাদেশ বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন, সেই বিপ্লব বা স্বাধীনতাযুদ্ধকে ডান ও বাম উভয় শিবির থেকে রচিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে (Historiograph) অসাম্প্রদায়িক (Secular) এলিট জাতীয়তাবাদী প্রকল্প হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।[৩] অর্থাৎ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল জাতীয়তাবাদী এলিট শ্রেণীর নেতৃত্বে, যাঁরা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাস করতেন এবং এ রূপকল্পের ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।[৪] পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী এলিটদের সঙ্গে উদীয়মান বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক এলিটদের মূল দ্বন্দ্বের জায়গাটা ছিল রাষ্ট্রকাঠামোর চরিত্র নিয়ে, অর্থাৎ সেটি অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের হবে, নাকি ধর্ম সেই রাষ্ট্রকাঠামোয় এবং জাতীয় পরিচয় নির্ধারণে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাতীয়তাবাদী পাকিস্তানি এলিটরা অবিভক্ত ঔপনিবেশিক ভারতে বসবাসকারী সব মুসলিম জাতিগোষ্ঠীকে এক জাতি হিসেবে কল্পনা (Imagined as a nation) করেন; তাঁদের ভিন্ন ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জাতিসত্তা এবং ভিন্ন ইতিহাস হওয়া সত্ত্বেও।[৫] তাঁদের এই কল্পিত জাতি গঠনের প্রক্রিয়ায় ব্রিটিশ ভারতে বসবাসরত সনাতন ধর্মের অনুসারী (হিন্দু) সব জাতিগোষ্ঠীকে একটি ভিন্ন, একক জাতি হিসেবে কল্পনা করে নেন, যাঁরা কিনা মুসলিম 'জাতিসত্তা' থেকে ভিন্ন (Other) এবং তাঁদের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে দ্বান্দ্বিক (Antagonistic) সম্পর্ক বিরাজ করার কারণে এ দুই

ধর্মের অনুসারী জনগণের পক্ষে একই রাষ্ট্রে বসবাস করা সম্ভব নয় বলে মনে করেন। এই বোধ থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্রকাঠামো তৈরি করার কথা ভাবা হয়। যা হোক, মুসলিম জাতীয়তাবাদ ক্রমান্বয়ে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদে পরিণত হয় এবং মুসলিম রাজনৈতিক এলিটরা ক্রমান্বয়ে নিজেদের পরিচয় রূপান্তর করে পাকিস্তানি এলিট হিসেবে পরিচয় দিতে থাকেন।

তৎকালীন পূর্ববঙ্গের মুসলিম এলিট সমাজ পাকিস্তানি বা মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী এলিটদের সঙ্গে মানসিক সংহতি বোধ করার কারণে ঔপনিবেশিক ভারতে বসবাসকারী সব মুসলিম জনগোষ্ঠীকে একক জাতি হিসেবে কল্পনা করে নেন এবং সনাতন ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী এবং আদিবাসীদের (Indigenous people) জাতি গঠন রূপকল্পের বাইরের, অপর জনগোষ্ঠী হিসেবে ভাবেন, যাঁদের পক্ষে তাঁদের ভিন্ন ধর্মীয় পরিচয়ের জন্য তাঁদের কল্পিত জাতি পরিচয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে মুসলিম প্রাকৃত জনগণ নিজেদের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বাধীন রাজনৈতিক কার্যক্ষেত্র (Autonomous political domain) গড়ে তুলতে পারার ব্যর্থতার কারণে মুসলিম এলিট সমাজের জাতীয়তার রূপকল্পকে নিজেদের রূপকল্প হিসেবে ভেবে নেন এবং তাঁদের ধর্মভিত্তিক জাতীয় পরিচয়কেই নিজেদের জাতীয় পরিচয় হিসেবে ভেবে নেন, যদিও জাতি-সংক্রান্ত এই ভাবনার জন্ম হয়েছে এমন একটি কার্যক্ষেত্রে (Domain), যেটি তাঁদের নিজস্ব নয় বা যেখানে তাঁদের প্রবেশাধিকার বা বিচরণের অধিকার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।[৬] অন্য কার্যক্ষেত্রে গড়ে ওঠা রূপকল্পকে নিজেদের কল্পনা বা রূপকল্প হিসেবে মনে করা Gayatri Spivak-এর প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর মানসকাঠামো সম্পর্কে যে ধারণা, সেটিকে প্রমাণিত করে। Spivak-এর ভাষায়, '(the) subaltern conscience (was) subject to the cathexis of the elites,' আর এই নির্ভরশীলতার ফলেই বঙ্গীয় প্রাকৃতজনের পক্ষে, এলিট সমাজের কার্যক্ষেত্র থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে জাতি, জাতীয়তাবাদ ও আত্মপরিচয়ের রূপকল্প গড়ে তুলতে পারা সম্ভব হয়নি।[৭]

পাকিস্তান তৈরির অল্প কিছুদিন পরই দ্বিজাতিতত্ত্ব পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয়তা হারায়। পাকিস্তানি জাতীয় এলিটরা পূর্ব পাকিস্তানের সিভিল সমাজে এ তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হন, যেটি পরিণামে রণজিৎ গুহ যেমনটি বলেছেন, 'dominance without hegemony', সেটি প্রতিষ্ঠা করে।[৮] যেসব সম্ভাব্য মূল কারণে তাঁরা হেজিমনি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হন, তার অন্যতম কয়েকটি হলো গণতান্ত্রিক আদর্শ ও চর্চার অভাব, যার ফল হলো দীর্ঘমেয়াদি সামরিক শাসন, পূর্ব পাকিস্তানের এলিট ও প্রাকৃত জনগোষ্ঠী উভয়ের জনমানসে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃস্থানীয় শ্রেণী কর্তৃক অর্থনৈতিক শোষণের ধারণা এবং পূর্ব

ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের ভিন্নতম সংস্কৃতির প্রথা। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান জাতীয় রাজনৈতিক এলিটরা, যাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কাল্পনিক সংহতি অনুভব করেছিলেন, পাকিস্তান তৈরি হওয়ার পর অল্প দিন পরে তাঁরাই অনুভব করতে লাগলেন যে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানের এলিটদের কাছে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন, যা তাঁদের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে প্রান্তীয় অবস্থানে ঠেলে দিয়েছে, যেখান থেকে পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামো বজায় রেখে তাঁদের পক্ষে উত্তরণ সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতার ধারণা তাঁদের পাকিস্তানি রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা করার জন্য দ্বিজাতিতত্ত্বকে মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয়তা সামনে হাজির করে, যার অনিবার্য ফল হলো নতুন একটি রাজনৈতিক আদর্শ (Counter political ideology) নির্মাণ করা। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ মোকাবিলা করার এই প্রয়োজনীয়তাই পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক এলিটদের একটি বড় অংশকে মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে এসে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে অনুপ্রাণিত করে, যা পরে আওয়ামী লীগ হিসেবে পরিচিত হয়। এই নতুন বাস্তবতায় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এলিটরা তাঁদের সাংস্কৃতিক কার্যক্ষেত্রে (Cultural domain) ও ভাবজগতে পূর্ব বাংলায় বসবাসরত সব জনগোষ্ঠীকে তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় পরিচয় সত্ত্বেও একটি জাতি হিসেবে পুনরায় কল্পনা (Reimagined as a nation) করেন। এই কল্পনার বহিঃপ্রকাশ হলো পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় পরিচয়ে পরিচিত সব জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয়তাবাদের ধারণার নতুন রূপকল্প উপস্থাপন করা, যেটি বাঙালি জাতীয়তাবাদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ভাষাভিত্তিক, নৃতাত্ত্বিক, অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণা পূর্ব পাকিস্তানের প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর মধ্যে (In subaltern domain) খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদী এলিটরা খুব সহজেই অর্থনৈতিকভাবে শোষিত এবং রাজনৈতিকভাবে নিপীড়িত প্রাকৃত জনগোষ্ঠীকে এটা বোঝাতে সমর্থ হন, তাঁদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতার সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন দেশের জন্ম দিতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজন মুক্তিসংগ্রাম সংঘটিত করা।

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকতার (Internal colony) বিরুদ্ধে সচেতন প্রতিরোধ গড়ে তুললেও গ্রামসি যেমনটি বলেছেন সচেতন নেতৃত্ব গড়ে তুলতে (multiple elements of concious leadership) পারার ব্যর্থতা, ফলে প্রাকৃত জনগোষ্ঠী স্বাধীনভাবে তাদের রাজনৈতিক কার্যক্ষেত্র গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়, যার

ফলে জাতীয়তাবাদী এলিটদের জাতিসংক্রান্ত ভাবনাকে নিজেদের বলে ধরে নেয়।[৯] জাতি, জাতীয়তাবাদ-সংক্রান্ত ধারণার ব্যাপারে এলিট মনস্তত্ত্বের ওপর মানসিক নির্ভরতা থাকা সত্ত্বেও ভাষা এবং নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাভিত্তিক যে নতুন রাষ্ট্রকাঠামোর ধারণা জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক এলিটরা উপস্থাপন করেন, সেই রাষ্ট্র নির্মাণে এলিট ও প্রাকৃত জনগোষ্ঠী সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন লক্ষ্য সামনে নিয়ে নির্মাণ করতে উদ্যত হয়। প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর লক্ষ্য বা স্বপ্ন যেখানে ছিল এমন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে তাদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সক্ষমতার তুলনামূলক সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানে এলিট শ্রেণীর মূল লক্ষ্য ছিল তাদের নিজ শ্রেণীস্বার্থ নিশ্চিত করা। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এলিট ও প্রাকৃত জনগোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে দুটি বিপরীত ও দ্বান্দ্বিক আকাঙ্ক্ষা সামনে নিয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধে শামিল হয়েছিল, যদিও এ দুই গোষ্ঠীরই একটি সাধারণ লক্ষ্য ছিল ভাষাভিত্তিক, নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

ওপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশ বিপ্লব একটি ঐক্যবদ্ধ একক স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রকল্প ছিল না। এলিট ও প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর ভিন্ন শ্রেণী-অবস্থানের কারণে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতার সমতা অর্জনের ধারণার প্রশ্নে ভিন্ন স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশ বিপ্লবে অংশ নিয়েছিল। পাশাপাশি Emile Durkheim যেমনটি বলেছেন, সামষ্টিক চেতনা (Collective consciouness), কোনো শ্রেণীবর্গে অবস্থিত মানুষ সামষ্টিক চেতনার পাশাপাশি নিজস্ব ব্যক্তিচেতনা (Subjective consciouness) দ্বারাও পরিচালিত হয়।[১০] এই ব্যক্তিচেতনা দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ক্ষমতা ও আকাঙ্ক্ষা মার্ক্সবাদী তত্ত্বের যে সারকথা, একটি শ্রেণীবর্গে অবস্থিত মানুষ তার নিজ শ্রেণীচেতনা ধারণ করে সামষ্টিক চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হয়, এ ধারণাকে নাকচ করে দেয়। মার্ক্সীয় তত্ত্ব যে বিষয়টিকে উপেক্ষা করে, তা হলো একটি শ্রেণী-কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বের দিকটি (Intra-class contradiction), আর এই দ্বন্দ্বের কারণেই একই শ্রেণী-কাঠামোতে অবস্থান করেও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা করেন বা ভিন্ন রাজনৈতিক লক্ষ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নে কাজ করেন। তাই ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোয় ধর্মের ভূমিকা কী হবে—সমাজতন্ত্র না পুঁজিবাদ, কোন পথে রাষ্ট্রকে গড়ে তোলা হবে—এসব প্রশ্নে এলিট ও প্রাকৃতজনদের যাঁরা স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন, তাঁদের নিজেদের মধ্যেও মতদ্বৈধতা দেখা যায়। এলিট ও প্রাকৃতজনদের একটি বড় অংশ চেয়েছিল রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণ বিয়োজিত করে একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে। এই অংশটি গত শতাব্দীর ষাটের দশকের সোভিয়েত বা চৈনিক মডেলের না হলেও অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দর্শনের মূল নীতিমালার আলোকে এমনভাবে রাষ্ট্রকাঠামো

গড়ে তুলতে চেয়েছিল, যা সমাজতান্ত্রিক নীতিমালাকে সমর্থন করবে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যাঁরা আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিলেন, তাঁরা প্রাথমিকভাবে অসাম্প্রদায়িক চেতনার ভিত্তিতে একটি নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যেখানে পুঁজিবাদ হবে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। যদিও পরবর্তী সময়ে তাঁরা দলের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ বামপন্থীদের প্রভাবে সমাজতান্ত্রিক দর্শনকে দলের অন্যতম মূলনীতি ও চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অপর দিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যাঁরা বামপন্থী হিসেবে পরিচিত ছিলেন, 'মস্কোপন্থী' বা 'পিকিংপন্থী' উভয়েই সমাজতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভাসানী ন্যাপের মতো সে সময়কার অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল মনে করত, ইসলামকে অন্তর্ভুক্ত করেই বাঙালির নতুন জাতিসত্তা গঠন করা উচিত এবং এই জাতিসত্তার ওপর গড়ে ওঠা ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রকাঠামোতে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা উচিত। অবশ্য এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবহার ভাসানী ন্যাপ শুধু জিন্নাহর মুসলিম লীগের মতো ভাষার আলংকারিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল। ধর্মভিত্তিক ইসলামপন্থী দলগুলোর মতো যাঁরা মনে করতেন শরিয়া আইন হওয়া উচিত পাকিস্তানি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলমন্ত্র, এ ধরনের কোনো শরিয়া আইন বা ব্যবস্থা ভাসানী ন্যাপ চায়নি। অপর দিকে, ইসলামপন্থী সব রাজনৈতিক দল পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। কেননা, তারা মনে করত যে অসাম্প্রদায়িক মতবাদের ওপর গড়ে ওঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণা ধর্মীয় বা ইসলামি জাতীয়তাবাদের ধারণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক, আর এ কারণে এ ধরনের আদর্শ ইসলামবিরোধী।

বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সিভিল সমাজে ধর্মভিত্তিক পরিচয় (Religion-based identity) ও রাজনীতি অনেকটা প্রান্তীয় অবস্থানে চলে এলেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। ইসলামপন্থী রাজনৈতিক এলিটরা মনে করতেন, যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা লালন ও চর্চা করেন, সেটি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও চর্চার সঙ্গে যুক্ত। ইসলামপন্থী রাজনৈতিক এলিটরা এবং তাঁদের অনুসারী প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর একটি অংশ বাংলাদেশ রূপকল্পকে মনে করত ভারতীয় ষড়যন্ত্র, যার মূল লক্ষ্য হলো ভারতীয় স্ট্র্যাটেজিক সুবিধার জন্য পাকিস্তানকে বিভক্ত করা। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, হিন্দু ও কমিউনিস্টরা এই ষড়যন্ত্র তত্ত্ব বাস্তবায়নে সবচেয়ে অগ্রগামী সৈনিক। এ ধরনের ভাষ্যতে বিশ্বাস স্থাপন করার ফল হলো, ১৯৭১ সালে সব ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল ও তাদের অনুসারীদের পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে অবস্থান নেওয়া এবং পাকিস্তানি জাতীয় পরিচয়কে মুসলিম আত্মপরিচয়ের সমার্থক

করে ফেলা। সার্বিকভাবে ইসলামপন্থীদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা পাকিস্তান সার্বক্ষণিক হুমকির মধ্যে আছে এবং সেক্যুলার ভারত হলো এই হুমকির মূল কারণ। তারা আরও মনে করে, অসাম্প্রদায়িক আদর্শের ওপর নতুন রাষ্ট্র গড়ে উঠলে নতুন মুসলিম জনগোষ্ঠীর পক্ষে ইসলামি আত্মপরিচয় বজায় রাখা কঠিন হবে। ফলে ধর্মভিত্তিক দলগুলো যেটা মনে করত, তা হলো ইসলামি আত্মপরিচয় বজায় রাখতে হলে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখতে হবে। এ ধারণার ফলে তাদের মধ্যে মাওলানা মওদুদীর ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষা সমার্থক—এ ধারণা ব্যাপ্তি লাভ করে।[১১]

ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মীদের মধ্যে উপরিউক্ত ধারণা ব্যাপ্তি লাভ করার ফলে আমরা দেখি, ১৯৭১ সালে সব ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলই অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়ায় এবং সামরিক জান্তার গণহত্যা ও নারী নির্যাতনকে ইসলাম ও পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার নামে সমর্থন জানায়। তবে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম দমনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সঙ্গে গণহত্যা ও নারী নির্যাতনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। তাদের সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ভাষাভিত্তিক, নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের জন্ম হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয় ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর আদর্শগত ভিত্তিকে সম্পূর্ণ চূর্ণ করে দেয়। এটা তাদের কল্পনার অতীত ছিল যে ভাষাভিত্তিক, নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদ ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে। ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোয় যেখানে তাদের তাত্ত্বিক ধারণা ও রাজনীতি সব সময়ই কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করত, নতুন রাষ্ট্রকাঠামোর অভ্যুদয় সাময়িকভাবে হলেও তাদের রাজনীতি ও রাজনৈতিক ধারণাকে প্রান্তে নিক্ষেপ করে, যা নতুন বাস্তবতায় কী করে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী রাজনীতি অগ্রসর করে নেওয়া যাবে, এই প্রশ্নে তাদের বিচলিত করে তোলে।

বাংলাদেশ : এক রাষ্ট্র, দুই জাতীয়তাবাদ

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় অসাম্প্রদায়িক এলিটদের সামনে অসাম্প্রদায়িক চেতনার ভিত্তিতে জাতিকে পুনর্গঠনের ক্ষেত্র তৈরি করে। গ্রামসি ও অন্য চিন্তাবিদেরা যেমনটি দেখিয়েছেন যে যেকোনো আধিপত্যবাদী চেতনাকে চ্যালেঞ্জ করে সব সময় একটি বিপরীত চেতনার জন্ম হয়, তেমনি বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা তাঁদের চেতনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শুরুতেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। এ ক্ষেত্রে প্রথম চ্যালেঞ্জটি আসে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী ও আদিবাসীদের কাছ

থেকে, যারা বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর আত্ম-অপরিচয়কে স্বাধীন দেশের শুরু থেকেই নিজেদের আত্ম-অপরিচয় বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে। পাশাপাশি বিভিন্ন ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলের পরাজিত কর্মী ও হতাশ সমর্থকেরা জাতি পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় ধর্মীয় পরিচয় যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়, সে ব্যাপারে তাঁদের প্রান্তীয় অবস্থান থেকেই সোচ্চার হন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁরা দ্বিজাতিতত্ত্বকে নতুন করে বিনির্মাণ করেন জাতি গঠনের প্রক্রিয়ায় ধর্মীয় পরিচয়কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য।[১২]

নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রাথমিকভাবে চরম কোণঠাসা অবস্থানে থাকার কারণে ইসলামপন্থীদের পক্ষে বিনির্মিত ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ধারণাকে সামনে এগিয়ে নেওয়া দুরূহ ছিল। এ পরিস্থিতিতে ন্যাপ (ভাসানী) সামনে এগিয়ে আসে তাদের অতল সংকট থেকে উদ্ধার করার জন্য। ন্যাপ (ভাসানী) নতুন জাতি-রাষ্ট্রের নাম মুসলিম বাংলা রাখার দাবি জানায়। আদর্শগত পার্থক্য-নির্বিশেষে সব ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল এই দাবিকে সমর্থন জানায়। স্বাধীন বাংলাদেশে এটি ছিল অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতি প্রথম গুরুতর চ্যালেঞ্জ (Counter hegemonic challenge) এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী চেতনার ভ্রূণ, যা বাংলাদেশি বিপ্লবের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ট্র্যাজিক হত্যাকাণ্ডের অল্প কিছুদিন পর পূর্ণতা লাভ করে। সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের হাত ধরে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ধারণা এলিট ও প্রাকৃত উভয় কার্যক্ষেত্রে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে, বিশেষত তাঁদের মধ্যে, যাঁরা মনে করতেন নতুন জাতি গঠনের প্রক্রিয়ায় ধর্মীয় পরিচয়কে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়।

বাঙালি শাসক জাতীয়তাবাদী এলিটরা ব্যাপক দুর্নীতি, দুর্ভিক্ষ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি কারণে সিভিল সমাজের ওপর তাঁদের আধিপত্য ধরে রাখতে ব্যর্থ হন। পাশাপাশি বিভিন্ন 'চীনপন্থী' রাজনৈতিক দল ও জাসদ শাসনব্যবস্থার প্রতি একধরনের সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এ ছাড়া অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিরুদ্ধে আদর্শগত চ্যালেঞ্জ তাদের মোকাবিলা করতে হয় বিভিন্ন ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল, ভাসানী ন্যাপ ও বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে; যদিও বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জাতি ও জাতীয়তাবাদী ধারণাটি ইসলামপন্থীদের থেকে ভিন্ন ছিল এবং তাঁদের এ-সংক্রান্ত ধারণায় ধর্ম বা ধর্মীয় আত্মপরিচয় অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদী এলিটরা পাকিস্তানি মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের মতো ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য একই ধরনের নিপীড়নমূলক পন্থা অবলম্বন করেন, যে নিপীড়নমূলক পন্থার বিরুদ্ধে তাঁরা

অখণ্ড পাকিস্তানের পুরো সময়টা আন্দোলন করেছেন। গণতান্ত্রিক পন্থায় নতুন জাতি-রাষ্ট্রের সিভিল সমাজের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়ে তাঁদের শাসনক্ষমতা বজায় রাখার জন্য বাঙালি জাতীয়তাবাদী এলিটরা একদলীয় একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন, যা পরিণতিতে সেই একই আধিপত্যবিহীন কর্তৃত্ব অবস্থার জন্ম দেয়, যে অবস্থার সম্মুখীন পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী এলিটরা হয়েছিলেন।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবে সংসদে অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে একদলীয় শাসনব্যবস্থার প্রস্তাব পাস করে এবং দলের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) রাখে। এই প্রস্তাবের ফলে বাকশাল ছাড়া সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়ে যায় এবং 'মস্কোপন্থী' হিসেবে পরিচিত সিপিবি ও ন্যাপ (মুজাফ্‌ফর) তাদের দল বিলুপ্ত করে বাকশালে যোগ দেয়। প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল না হয়ে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও নিপীড়নমূলক পন্থার ওপর নির্ভর করে ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রচেষ্টার কারণে বাঙালি জাতীয়তাবাদী এলিটরা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, যা তাঁদের জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্সের বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়াকে জটিল করে তোলে এবং অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী এলিটদের সম্পর্ক আরও দ্বান্দ্বিক অবস্থানের দিকে নিয়ে যায়। প্রাকৃত জনগোষ্ঠী নিজেদের রাজনৈতিক কার্যক্ষেত্রকে এলিট রাজনৈতিক নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের অনুকরণে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ—এই দুই ভাগে ভাগ করে ফেলে।

প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর ওপর নির্ভর না করে অসাম্প্রদায়িক এলিটরা সম্পূর্ণভাবে বেসামরিক-সামরিক আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভর করতে শুরু করেন তাঁদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য। কিন্তু যে বিষয়টি তাঁরা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন, তা হলো এই আমলাতন্ত্র গড়ে উঠেছে পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামো ও ভাবধারার মধ্যে, যাঁরা নিজেরা পাশ্চাত্য জীবনধারায় অভ্যস্ত এবং পশ্চিমা গণতন্ত্রের প্রতি ইতিবাচক ধারণা পোষণ করলেও একই সঙ্গে পাকিস্তানের জন্য এ ধরনের গণতন্ত্র উপযুক্ত নয় বলে মনে করতেন। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহর মতো তাঁদের বেশির ভাগই মনে করতেন, জাতীয় আত্মপরিচয় নির্মাণ ইসলামকে ভিত্তি করে হওয়া উচিত। যদিও সামরিক-বেসামরিক আমলাদের অনেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শুধু ভাষাভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তান ভেঙে একটি নতুন জাতি-রাষ্ট্র গঠনের বিরোধী ছিল। এই অংশটি পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সঙ্গে বাংলাদেশি মুক্তিসংগ্রামকে দমনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুজিব সরকার তাঁদের অতীত

বিবেচনা না করে সবাইকে প্রশাসন এবং সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে। এর ফলে আমরা যেটা প্রত্যক্ষ করি, তা হলো এলিট ও প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর মতো সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের জাতীয়তাবাদ এবং নতুন জাতির আত্মপরিচয় প্রশ্নে বিভাজিত হয়ে পড়া। আমলাতান্ত্রিক কাঠামো ও শৃঙ্খলার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও নতুন জাতি পুনর্গঠনের প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিভাজন জাতির সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সেনা আমলাতন্ত্রের মধ্যে এই আদর্শগত দ্বন্দ্ব রক্তক্ষয়ী রূপ লাভ করে, যখন একদল জুনিয়র ইসলামপন্থী অফিসার বলপূর্বক অসাম্প্রদায়িক এলিটদের ক্ষমতাচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেন, যার করুণ পরিণতি হলো শেখ মুজিব, তাঁর পরিবারের সব সদস্যসহ অন্য অনেককে নৃশংসভাবে হত্যা করা। এই ক্যু ও পাল্টা ক্যুর ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান ইসলামপন্থী সামরিক অফিসারদের মুখপাত্র হিসেবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতাসীন হয়ে তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনা, জাতীয় আত্মপরিচয় ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারাকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং ইসলামপন্থীদের বিনির্মিত দ্বিজাতিতত্ত্বকে রাষ্ট্রকাঠামোতে প্রয়োগ করেন নিজের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকে বৈধতা দেওয়ার প্রচেষ্টা হিসেবে। পাশাপাশি তিনি নিজেকে সেই অংশটির মুখপাত্র হিসেবে উপস্থাপন করেন, যারা মনে করত নতুন জাতীয় আত্মপরিচয় নির্মাণের ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের কেন্দ্রীয় ভূমিকা থাকা উচিত। জেনারেল জিয়ার জাতীয় আত্মপরিচয় পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলী রীয়াজ লিখছেন: 'it involved both the manipulation/modification of constitutional procedure and the construction of a new ideology that would undermine the ideology of the former regime and justify its takeover.'[১৩]

অসাম্প্রদায়িক, ভাষাভিত্তিক নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদকে মোকাবিলা করার জন্য জিয়া দ্বিজাতিতত্ত্বের বিনির্মিত রূপ হিসেবে ভূখণ্ডভিত্তিক জাতীয়তাবাদী তত্ত্বকে সামনে নিয়ে আসেন, যেখানে ইসলামি মূল্যবোধ জাতীয় পরিচয় নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যাকে তিনি বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ হিসেবে অভিহিত করেন। তৎকালীন সরকারের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হিসেবে এই জাতীয়তাবাদে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী, আদিবাসী এবং বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তাকে এই প্রকল্পের বাইরের সত্তা হিসেবে মনে করা হয়। ফলে বিনির্মিত দ্বিজাতিতত্ত্ব থেকে উৎসারিত জাতি পুনর্নির্মাণ এবং রাষ্ট্র ও সিভিল সমাজের ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ায় তাদের যুক্ত করা সম্ভব নয় বলে মনে করা হয়। জিয়ার বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ধারণা অফিশিয়ালি এলিট ও প্রাকৃতজনদের কার্যক্ষেত্রকে অসাম্প্রদায়িক ও ইসলামপন্থী এই দুই ভাগে ভাগ করে ফেলে এবং তখন থেকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী বাঙালি ও ইসলামপন্থীরা নিজেদের বাংলাদেশি

হিসেবে পরিচয় দিতে শুরু করে। মূলত আওয়ামী লীগ এবং বিভিন্ন ঘরানার বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণভাবে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি হিসেবে পরিচয় দেয়। অপর দিকে বিভিন্ন ইসলামপন্থী দল এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি, যে দলটি জিয়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর ক্ষমতা দখলকে বৈধতা দেওয়ার জন্য এবং একই সঙ্গে ইসলামি আত্মপরিচয়কে অন্তর্ভুক্ত করে জাতি পুনর্গঠনের রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য, নিজেদের সাধারণভাবে বাংলাদেশি পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

জিয়াউর রহমান তাঁর জাতি পুনর্গঠনের প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং নিজের ক্ষমতা দখলের বৈধতা অনুসন্ধানের পাশাপাশি পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পূরক উন্নয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। এ ছাড়া নিজের ক্ষমতা সংহত করার জন্য সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে যেসব সেনা অফিসার বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতেন, তাঁদের বড় একটি অংশকে হত্যা করেন। জিয়ার শাসনামলে আওয়ামী লীগ ও জাসদের বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী নিপীড়নের শিকার হন। এর পাশাপাশি জিয়া কমিউনিস্ট পার্টিকে (সিপিবি) নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, নেতাদের গ্রেপ্তার করেন এবং তাঁর জাতীয়তাবাদী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য রফিউদ্দিন আহমেদের ভাষায়, 'overtly pro-Islamic stance' গ্রহণ করেন, যার ফল হলো মুজিবের আমলে নিষিদ্ধ জামায়াতে ইসলামীকে পুনরায় রাজনীতি করার অনুমতি প্রদান এবং দলটির সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন।[১৪] বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বি মাইলাম তাঁর সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে জিয়ার গণতান্ত্রিক ছদ্মাবরণের সময়কালের ইসলামি ভাবধারাকে অন্তর্ভুক্ত করে জাতি পুনর্গঠনের এই প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেছেন সেক্যুলার মূল্যবোধ থেকে ইসলাম পন্থার দিকে অগ্রযাত্রা হিসেবে।[১৫]

যা-ই হোক, বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় রাজনৈতিক দলই তাদের জাতীয়তাবাদী প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রধান প্রতিবন্ধক মনে করেছে অপর রাজনৈতিক দলকে এবং বাংলাদেশে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর কিছু অংশকে দুটি জাতীয়তাবাদী প্রকল্পই এর বাইরে রেখেছে। এ দুটি রাজনৈতিক দলের একটি যখন ক্ষমতায় থেকেছে, তখন অপর রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছে, যা দুই দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহের মাত্রাকে আরও সম্প্রসারিত করেছে। জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দুই দল যৌথভাবে গণ-আন্দোলন গড়ে তুললেও তা পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যকার পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ দূরীকরণে ভূমিকা রাখতে পারেনি। এরশাদের সামরিক শাসনের অবসানের পর দুই বছর বাদ দিয়ে বাকি সময় এ দুটি দলই বাংলাদেশ

শাসন করে এলেও, তাদের জাতীয়তাবাদী সর্বাত্মক প্রকল্প (Totalizing claim of nationalism) বাস্তবায়নের প্রচেষ্টার ফলে অপর পক্ষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। দুই পক্ষই মূলত তাদের দলীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যুক্তিবাদের ওপর সংঘাতকে প্রাধান্য দিয়েছে। তাদের এই সাংঘর্ষিক সম্পর্ক শুধু গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেনি, পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় বাধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাতীয়তাবাদ বিতর্কটি শুরু হয়েছিল এলিট কার্যক্ষেত্রে এবং জাতীয়তাবাদী এলিটদের পুরো জাতির পক্ষে কথা বলতে পারার ব্যর্থতা বাংলাদেশে বসবাসরত জাতিগোষ্ঠীকে তাদের আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে বিভক্ত করে ফেলে। রাজনৈতিক এলিটদের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ন্যূনতম আদর্শিক মতৈক্যে পৌঁছাতে পারার ব্যর্থতা এই বিভাজনকে আরও গভীর করেছে। আর এই বিভাজনের প্রতিফলন আমরা দেখি সিভিল সমাজের কিছু তরুণ যখন যুদ্ধাপরাধের বিচার, জামায়াত নিষিদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনায় ফিরে যাওয়ার দাবি জানান গণজাগরণ মঞ্চ থেকে, তখন দেশে-বিদেশে বিপুল সাড়া সত্ত্বেও জনগোষ্ঠীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ, যারা নিজেদের বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী বলে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, তারা এই আন্দোলন থেকে দূরে থেকেছে। তাহলে যে প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে, তা হলো জনগোষ্ঠীর, বিশেষত প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে আন্দোলনের বাইরে রেখে আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য কতটুকু অর্জন করা সম্ভব হবে বা অর্জিত হলেও সেটি স্থায়ী হবে কি না। এ কথা মনে করার কারণ নেই যে, প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর যে অংশটি জাতীয় আত্মপরিচয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধর্মের অন্তর্ভুক্তি চায়, তারা সবাই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায় না। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক কার্যক্ষেত্র বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী এলিটদের কার্যক্ষেত্রের ওপর নির্ভর করার ফলে তাদের পক্ষে যুদ্ধাপরাধী ও জামায়াতের প্রশ্নে স্বাধীন অবস্থান নেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু যেটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, একটি শ্রেণীবর্গে অবস্থান করেও একজন ব্যক্তিমানুষের পক্ষে স্বাধীন ও স্বকীয় অবস্থান নেওয়া সম্ভব। এ ক্ষেত্রে গণজাগরণ মঞ্চের সামনে যে কর্তব্যটি হাজির করে, তা হলো আরও ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে এর লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য আন্দোলনের পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদি সংলাপের আয়োজন করা।

তৃণমূল সংলাপ : ন্যূনতম জাতীয় মতৈক্যের সন্ধানে

তৃণমূল সংলাপ এই লক্ষ্য নিয়ে হওয়া উচিত, কী করে এলিট কার্যক্ষেত্রের প্রভাবমুক্ত হয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে প্রাকৃত জনগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে ন্যূনতম জাতীয় মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তৃণমূল সংলাপের কথা এ প্রবন্ধে বলা হচ্ছে; কেননা, জাতীয় মৌলিক বিষয়গুলোতে

মতৈক্যে পৌঁছানোর মতো কোনো অবস্থানে পৌঁছাতে জাতীয় এলিটরা ব্যর্থ হয়েছেন। ৪২ বছরেও ন্যূনতম মৌলিক বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছাতে পারার ব্যর্থতা এটি নির্দেশ করে যে, তাদের বিভাজিত শ্রেণীস্বার্থ এলিট নেতাদের মৌলিক বিষয়ে মতৈক্যে আসতে দিচ্ছে না বা তাদের সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থের কারণে পুরো জাতির পক্ষে তারা কথা বলতে অক্ষম। তাদের এই অক্ষমতা বিভিন্ন প্রান্তীয় (ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, জেন্ডার ও জাতিগতভাবে প্রান্তীয়) প্রাকৃত জনগোষ্ঠীকে এলিট কার্যক্ষেত্রের প্রভাবমুক্ত হয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। গণজাগরণ মঞ্চের জাগরণ এ ধরনের একটি উদাহরণ—কীভাবে এলিট কার্যক্ষেত্র থেকে মুক্ত হয়ে প্রাকৃত জনগোষ্ঠী নিজস্ব নেতৃত্বে আন্দোলন করতে পারে, নিজেদের কণ্ঠস্বর (Voice) শোনাতে পারে, এলিট নেতাদের তাঁদের বক্তব্যকে বিবেচনায় নেওয়ার অবস্থা তৈরি করতে পারে (সমর্থন বা বিরোধিতা যে অর্থেই হোক)। সুতরাং, বিষয়টিকে মাথায় রেখে গণজাগরণ মঞ্চ, স্থানীয় সিভিল সমাজ ও নারী গ্রুপসমূহের মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক আদর্শ বাস্তবায়ন এবং সব যুদ্ধাপরাধীকে বিচারের আওতায় আনা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ গণদাবিতে ন্যূনতম মৌলিক মতৈক্যে পৌঁছানোর জন্য তৃণমূল পর্যায়ে, যথা গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রান্তীয়, প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সংলাপ পরিচালনা করা উচিত।[১৬] এ ধরনের সংলাপ বিপরীতমুখী দ্বান্দ্বিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীকে মৌলিক জাতীয় আদর্শসমূহ পুনর্মূল্যায়নের জন্য ক্ষেত্র তৈরি করে দেবে। এই সংলাপের দূরবর্তী লক্ষ্য হওয়া উচিত ন্যূনতম মৌলিক জাতীয় ইস্যুতে এলিট কার্যক্ষেত্রের বাইরে প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর নিজস্ব কার্যক্ষেত্রে মতৈক্য গড়ে তোলা।

এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদি সংলাপ চালানোর সময় এটা মনে রাখা দরকার যে কোনো মতবাদ, চর্চা, উদাহরণ ও ব্যবস্থা স্থায়ী নয়; সবকিছু নিয়েই আলোচনা, সমালোচনা, বিতর্ক চলতে পারে; এসব বিষয়ই চলমান বা গতিশীল এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর সবকিছুই পরিবর্তিত হয়। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, খোলা মন নিয়ে সংলাপের ক্ষেত্র তৈরি করা, যেখানে মোহাম্মদ কাসিম জামানের ভাষায়, 'creative engagement with a rival' সম্ভব হবে।[১৭] প্রান্তীয় প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি এ ধরনের সংলাপে তৃণমূল পর্যায়ের আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং অন্যান্য দলের নেতা-কর্মীদেরও যুক্ত করা যেতে পারে, যেখানে তাঁরা তাঁদের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা, বিতর্ক করতে পারবেন। এ ধরনের চর্চা যেমন তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্রের ধারণাকে ব্যাপ্তি দেবে, তেমনি রাজনৈতিক কর্মীদের পাশাপাশি প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী (Politically empowered) করে তুলবে। তৃণমূল সংলাপ এলিট কার্যক্ষেত্রের বাইরে তাদের

নিজস্ব কার্যক্ষেত্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি—এ দুটি দলের অভ্যন্তরেই গণতন্ত্রচর্চার অনুপস্থিতির কারণে দল দুটির অভ্যন্তরে কর্মীদের অবস্থান একেবারে প্রান্তে, যার কারণে কোনো দলীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য। ফলে দলের অভ্যন্তরে এলিট নেতাদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক হলো 'মিয়া-মক্কেল' সম্পর্ক (Patron-client relation); যেখানে দলীয় কর্মীদের ভূমিকা হলো মক্কেলের, যা David Crocker-এর ভাষায় তাঁদের রাজনৈতিকভাবে দরিদ্র (Politically poor) করে রেখেছে।[১৮] কর্মীদের এই ভূমিকা এ দুটি দলের অভ্যন্তরে তাঁদের দলীয় নেতৃত্বের আজ্ঞাবাহী সেবকে পরিণত করেছে, যাঁরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার পরিবর্তে দলীয় নেতৃত্বের হুকুম তামিলের মধ্যে তাঁদের ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন। তৃণমূল পর্যায়ে প্রান্তীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণে এ ধরনের সংলাপ প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি রাজনৈতিক দলের কর্মীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে (Political capabilities of individuals) সাহায্য করবে এবং এলিট কার্যক্ষেত্রের ওপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে স্বাধীন রাজনৈতিক কার্যক্ষেত্র প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্ম নেবে। প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্ষেত্র তৈরি হলেই জাতীয়তাবাদ বিতর্কের অবসান হবে সেটি নয়; কিন্তু এ ধরনের কার্যক্ষেত্র যেটি করবে, তা হলো প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে এলিট কার্যক্ষেত্রের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করবে। প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন (Political empowerment) যুদ্ধাপরাধ ও জামায়াতের ইস্যুতে হয়তো তৃণমূল পর্যায়ে ন্যূনতম মতৈক্যের সম্ভাবনা তৈরি করবে। তৃণমূল পর্যায়ে কিছু মৌলিক ইস্যুতে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হলে জাতি, জাতীয়তাবাদ, জাতীয় পরিচয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতেও সংলাপ শুরু করার ক্ষেত্র তৈরি হবে। প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং তৃণমূলে ন্যূনতম ঐক্য এলিট কার্যক্ষেত্রকে প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর কার্যক্ষেত্রের ওপর নির্ভরশীল না করলেও তাকে অন্তত প্রভাবিত করার আবহ তৈরি করবে।

উপসংহার

এলিট ও প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারসহ অন্যান্য মৌলিক ইস্যুতে মতদ্বৈধতার মূল কারণ হলো এলিট কার্যক্ষেত্রে জাতি, জাতীয়তাবাদ, জাতীয় আত্মপরিচয় প্রশ্নে ভিন্ন চেতনার লালন, যা কিনা প্রাকৃত জনগোষ্ঠীকে একইভাবে প্রভাবিত করেছে, তাদের নিজস্ব স্বাধীন রাজনৈতিক কার্যক্ষেত্র গড়ে তুলতে পারার ব্যর্থতার কারণে। ফলে একই জাতি-রাষ্ট্রের ভেতরে দুটি সমান্তরাল 'জাতিসত্তার' উদ্ভব হয়েছে, যা কিনা জাতি-রাষ্ট্রের মধ্যে ধর্মের ভূমিকা কী হবে,

এই মৌলিক প্রশ্নে পুরো দেশবাসীকে দুটি শিবিরে বিভক্ত করে ফেলছে। এ অবস্থায় যে কর্তব্য গণজাগরণ মঞ্চসহ এলিট কার্যক্ষেত্রের বাইরে সিভিল সমাজে যেসব সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নারীবাদী গ্রুপ রয়েছে, তাদের সামনে হাজির করেছে, তা হলো এলিট কার্যক্ষেত্রের প্রভাবমুক্ত হয়ে তৃণমূল পর্যায়ে প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আন্দোলনের পাশাপাশি মৌলিক ইস্যুগুলো নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি সংলাপ পরিচালনা করা। এলিট কার্যক্ষেত্রের প্রভাবমুক্ত হয়ে দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলন ও সংলাপ একসঙ্গে চালাতে পারলে হয়তো প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক কার্যক্ষেত্রে বেশির ভাগ জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় মৌলিক ইস্যুতে ন্যূনতম ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র তৈরি করবে। আর এ ধরনের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারলেই গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলন সফল হবে এবং জাতি, জাতীয়তাবাদ, জাতীয় আত্মপরিচয় নিয়ে যে বিতর্ক, তাকে একটি নতুন মাত্রায় নিয়ে যাওয়া যাবে।

তথ্যসূত্র

১. এখানে সম্প্রদায় বলতে ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে, যদিও শুধু ধর্মকে কেন্দ্র করে একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠতে পারে কি না, সে বিতর্ক থেকে যাচ্ছে। সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ—এ দুটি শব্দকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কেননা, যাঁরা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাস করেন না, তাঁরা সব সময় উল্লিখিত শব্দ দুটিকে ধর্মহীনতার সমার্থক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট থেকেছেন। যদিও পার্শ্ববর্তী ভারতসহ যেসব দেশে মুসলিম জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘিষ্ঠ, সেসব দেশ সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন না করলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সেসব দেশে কীভাবে রক্ষিত হবে, সে প্রশ্নে তাঁরা নীরব থেকেছেন।

২. সক্ষমতার ধারণাটি অমর্ত্য সেন যে অর্থে ব্যবহার করেছেন, সেই আলোকে ব্যবহার করা হয়েছে। এ-সংক্রান্ত ধারণার জন্য দেখুন, Amartya Sen, 'Human Rights and Capabilities,' *Journal of Human Development*, 6 (2005): pp.151-166; আরও দেখুন, Amartya Sen, *Commodities and Capabilities*, (India: Oxford University Press, 1999)। সেন সক্ষমতার ধারণাকে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলার বিরোধী। কারণ, তাঁর মতে, এতে মানুষের সক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। অপর দিকে Martha Nussbaum মনে করেন, সামাজিক ন্যায়বিচার (Social justice) ও নৈতিক বিচার (Ethical judgement) নিশ্চিত করার জন্য সক্ষমতার ধারণার বিষয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট (Concrete) অবস্থান নেওয়া উচিত। কেননা, তিনি মনে করেন, শুধু সক্ষমতার বিমূর্ত (Abstract) ধারণার ওপর নির্ভর করলে এর প্রায়োগিক বিষয়টি উপেক্ষিত থাকবে, ফলে এটি ব্যক্তিস্বাধীনতাকে নিশ্চিত করবে না। সক্ষমতার প্রায়োগিক বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তিনি ১০ ধরনের সক্ষমতার উল্লেখ করেছেন, যাকে তিনি 'Central Human Functional Capabilities' বলেছেন। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, M, Nussbaum, *Women and Human Development: The Capabilities Approach*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2000), pp. 78-80.

সিভিল সমাজের ব্যাপ্তি কতটুকু হবে বা কোন সংগঠনসমূহ সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হবে,

তা নিয়ে যাঁরা বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করেন, তাঁদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে সরকারি সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন সংগঠন এবং স্বাধীনভাবে ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিদের সিভিল সমাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে এটি উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে Antonio Gramsci যেমনটি বলেছেন, রাজনৈতিক সমাজের সঙ্গে সিভিল সমাজের পার্থক্যের জায়গাটি ধারণাগত এবং দুটি বাস্তব ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে প্রায়ই 'Overlap' করে। সিভিল সমাজসংক্রান্ত ধারণার জন্য দেখুন, Anthony Gramsci, in Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (Eds.), *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*, (New York: International Publishers, 2011), p. 160. সিভিল শব্দটির বাংলা 'সুশীল' ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কেননা, বাংলাদেশের সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা সুশীল শব্দটির প্রতি একধরনের নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন।

৩. T, Maniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath*. (Dhaka: University Press, 1980).

৪. এলিট বলতে ক্ষমতাবান (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক) গ্রুপ, শ্রেণী ও ব্যক্তিদের বোঝানো হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পুঁজিপতি, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা, আইনজীবী, চিকিৎসক, আমলা, টেকনোক্র্যাট—এঁদের সাধারণভাবে এলিট বলা হয়।

৫. Benedict Anderson জাতিকে কাল্পনিক সম্প্রদায় (Imagined Community) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। দেখুন, B Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. (London: Verso, 1991).

৬. এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃত জনগোষ্ঠী বলতে বিভিন্ন প্রান্তীয় গ্রুপ ও শ্রেণীবর্গ, শ্রমজীবী, দিনমজুর, মাঝারি ও ছোট কৃষক, গ্রামীণ সর্বহারা, নারী, আদিবাসী ও বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তা এবং ধর্মীয়ভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহকে সাধারণভাবে বোঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য, ধারণাগতভাবে প্রাকৃতজন প্রত্যয়টি আপেক্ষিক এবং সম্পর্কযুক্ত, অর্থাৎ কোনো বিশেষ স্থান, অঞ্চল বা প্রেক্ষাপটের যাঁরা প্রাকৃতজন, তাঁরা ভিন্ন স্থান, অঞ্চল বা প্রেক্ষাপটে এলিট হিসেবে বা এলিটদের পক্ষে ভূমিকা পালন করতে পারেন। ধারণাগতভাবে এলিট প্রত্যয়টিও আপেক্ষিক এবং সম্পর্কযুক্ত; অর্থাৎ কোনো এক স্থান, অঞ্চল বা প্রেক্ষাপটে যাঁরা এলিট, তাঁরা ভিন্ন অঞ্চল স্থান বা প্রেক্ষাপটে প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর ভূমিকা পালন করতে পারেন।

৭. G. C. Spivak, 'Subaltern Studies: Deconstructing Historiography,' in R. Guha & G. C. Spivak (Eds.), *Selected Subaltern Studies*. (New York: Oxford University Press, 1988), p. 11.

৮. R. Guha, *Dominance without Hegemony: History and Power in Colonial India*. (Cambridge: Harvard University Press, 1998).

৯. A. Gramsci, 'The Modern Prince,' in Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (Eds.), *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*, (New York: International Publishers, 2011), p. 196. অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকতা-সংক্রান্ত ধারণা সম্পর্কে জানতে দেখুন, P. Gonzalez-Casanova, 'Internal Colonialism and National Development,' *Studies in Comparative International Development*, 1 (1965): pp. 27-37.

১০. Durkheim সামষ্টিক চেতনাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন, 'The totality of beliefs and sentiments common to average members of the same society... it is an entirely different thing from particular consciences, although it can only be realized through them.' E. Durkheim, *The Division of Labor in Society*. (New York: Free Press, 1997), pp. 38-39.

১১. H. Haqqani, *Pakistan: Between Mosque and Military*. (Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2005), p. 24.

১২. Rupert Emerson-এর জাতি গঠনের ধারণাকে এই প্রবন্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, R. Emerson, *From Empire to Nation: The Rise of Self-Assertion of Asian and African People*. (Cambridge: Harvard University Press, 1960).

১৩. A. Riaz, *God Willing: The Politics of Islamism in Bangladesh*, (Lanham: Rowman and Littlefield, 2004), p. 25.

১৪. R. Ahmed, 'Redefining Muslim Identity in South Asia: The Transformation of the Jama'at-I Islami,' in M. E. Marty & R. S. Appleby (Eds.), *Accounting for Fundamentalisms: The Dynamic Character of Movements*, pp. 669-705. (Chicago: University of Chicago Press, 1994), p. 692.

১৫. W. B. Milam, *Bangladesh and Pakistan: Flirting with Failure in South Asia*, (New York: Columbia University Press, 2009), p. 11.

১৬. মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক আদর্শের কথা বলা হচ্ছে এ কারণে যে, কিছু আদর্শ যেমন সমাজতান্ত্রিক ধারণার বাস্তবায়ন আজকের বাস্তবতায় অনেকটা ইউরোপীয় চিন্তার মতো এবং এ কারণে বর্তমান পরিস্থিতিতে বাস্তবায়নযোগ্য নয়।

১৭. M.Q. Zaman, *The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change*, (New Jersey: Princeton University Press, 2002), p. 5.

১৮. D. Crocker, 'The Capability Approach and Deliberative Democracy,' *Maitreyee* 4, February, (2006), p. 6.

বাঙালি পল্টন ও তৎকালীন নারীসমাজ

মুহাম্মদ লুৎফুল হক

সারসংক্ষেপ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামে নারীদের অবস্থা কী ছিল? বর্তমান প্রবন্ধে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের একটি ঘটনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যখন বাঙালি নারীকে বলা হতো অবরোধবাসিনী, সেই সময়কার বাঙালি গুটি কয়েক নারী বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে গঠন করেছিলেন বাঙালি মহিলা সমিতি। এই সমিতির মাধ্যমে তাঁরা সহযোগিতা করেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদল, বাঙালি পল্টনকে। বাঙালি পল্টন গঠন, নারীসমাজের গঠন ও কর্মকাণ্ড, মহিলা সমিতি সম্পর্কে তৎকালীন পত্রপত্রিকা ও স্মৃতিকথায় যে মূল্যায়ন করা হয়েছিল, তা এ প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : মহিলা সমিতি, বাঙালি পল্টন, ঢাকার মহিলা সমিতি, বেঙ্গলি রেজিমেন্ট কমফোর্ট ফান্ড, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলাদেবী চৌধুরাণী।

ভূমিকা

উনিশ শতকে সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায় আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিরামহীন সামাজিক আন্দোলনের ফলে সতীদাহ প্রথা রদ ও বিধবা বিবাহ আইন হয়েছে। কিন্তু বিশ শতকে এসেও কি বাঙালি নারী খুব একটা বের হতে পেরেছিলেন অন্তঃপুর থেকে, পুরুষতন্ত্রের জাঁতাকল থেকে? বিশ শতকে এসে যখন সারা ভারতীয় উপমহাদেশ আন্দোলিত হয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামে, তখন নারীদের কী অবস্থা ছিল? নারী প্রশ্নটি কীভাবে মোকাবিলা করেছিল উপমহাদেশের সমাজ? পুরুষের তুলনায় নারী যে খুব একটা বহির্মুখী ছিলেন না, তা লক্ষ করা যায় বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাঁদের অংশগ্রহণের সংখ্যা থেকে। তবে এটা ঠিক, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কয়েকটি

আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়। তার পরও বলা যায়, নারীরা তখনো অনেকটা ছিলেন অন্তঃপুরের বাসিন্দাই। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারী প্রশ্ন কী রকম ছিল, তা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক এখনো চলছে। তনিকা সরকারের মতে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদে নারীদের স্থান ছিল 'কালচারাল আর্টিফ্যাক্ট' হিসেবে।[১] তবে সুগত বোস একমত হননি তনিকা সরকারের মতের সঙ্গে। তাঁর মতে, ভারত মাতা 'কালচারাল আর্টিফ্যাক্ট' ছিল না। এটা এসেছে সুদীর্ঘ হিন্দু ঐতিহ্য থেকে, যেখানে মাতাকে দেখা হয় পৃথিবী হিসেবে।[২] পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন, ভারতীয় উপমহাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীরা ছিলেন 'ইনার' ও 'স্পিরিচুয়াল' স্পিরিট। আর এভাবেই নারীরা অন্তঃপুরে থাকলেও তাঁরা অন্তঃপুরে থেকেই পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।[৩] ইতিহাসবিদ ভিলেম ফান সেন্ডেলের মতে, যেসব পণ্ডিত বাংলাদেশের নারীদের পুরুষতন্ত্রের অসহায় বলি হিসেবে দেখাতে চান, তাঁরা একটা বড় ভুল করছেন। তাঁর মতে, এ অঞ্চলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। সুযোগ রয়েছে যেকোনো বিরাজমান লিঙ্গ-ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ জানানোরও।[৪] অন্তঃপুর থেকে বের হয়ে পুরুষের পাশাপাশি বাঙালি নারীরাও যে ইতিহাসের কোনো কোনো সময় অবদান রাখতে চেষ্টা করেননি, এমনটা নয়।

আমার বর্তমান প্রবন্ধে আমি আলোকপাত করব বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের একটি ঘটনা, যখন বাঙালি নারীকে বলা হতো অবরোধবাসিনী, সেই সময় বাঙালি নারীরা বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে গঠন করেছিলেন বাঙালি মহিলা সমিতি। প্রবন্ধটিতে দেখানো হবে, তাঁরা কীভাবে সংগঠিত হয়েছিলেন, কর্মকাণ্ড চালিয়েছিলেন এবং কীভাবে তাঁদের কর্মকাণ্ড সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল বাঙালি পল্টনের সফলতায়। প্রবন্ধের প্রথম অংশে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হবে বাঙালি পল্টন গঠন সম্পর্কে এবং মহিলা সমাজের গঠন ও কর্মকাণ্ড। প্রবন্ধের শেষ অংশে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য নারী সংগঠক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া মহিলা সমিতি সম্পর্কে তৎকালীন পত্রপত্রিকা ও স্মৃতিকথায় যে মূল্যায়ন করা হয়েছিল, তা তুলে ধরা হয়েছে।

বাঙালি পল্টন গঠন

আধুনিক সামরিক ইতিহাসে বাঙালিকে যোদ্ধা হিসেবে খুব একটা দেখা যায় না। উনিশ শতকের শেষার্ধে ইংরেজ শাসকেরা বাঙালিকে 'অযোদ্ধা জাতি' হিসেবে চিহ্নিত করেন। ফলে বাঙালির জন্য সৈন্যবৃত্তি আরও দূরে চলে যায়। অতীতেও যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙালির উপস্থিতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয়। ইতিহাসে বাঙালিকে

কেউ যুদ্ধবাজ বা সাহসী যোদ্ধা হিসেবে উল্লেখ করেননি, বরং অনেকে বিপরীত মত প্রচার করেছেন। এই অবস্থার পরিবর্তন আসে প্রথম মহাযুদ্ধকালে—১৯১৫ সালের মাঝামাঝি। এ সময় স্বল্প কয়েকজন বাঙালি স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসাসেবা দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধে অংশ নেন। তাঁদের প্রশংসনীয় কাজে বাঙালি সম্পর্কে শাসকদের ধারণা পাল্টাতে থাকে। সেনা হিসেবে বাঙালির উপযুক্ততা প্রমাণিত হয়। তাঁরা বাঙালির জন্য পল্টন গঠনের চিন্তাভাবনা শুরু করেন। এরই সঙ্গে এটাও সত্য যে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য এ সময় শাসকদেরও প্রচুর সেনার প্রয়োজন দেখা দেয়।

১৯১৬ সালের ৭ আগস্ট ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক আইনসভায় বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল 'বাঙালি পল্টন' গঠনের সরকারি ঘোষণা দেন। বাঙালি পল্টনের প্রথম সরকারি নাম ছিল 'বেঙ্গলি ডবল কোম্পানি'। এর জনবল ছিল ২৫০ জন। এক বছর পর এটিকে ব্যাটালিয়নে রূপান্তরিত করা হয় এবং নামকরণ করা হয় '৪৯তম বেঙ্গলি রেজিমেন্ট' বা সংক্ষেপে '৪৯তম বেঙ্গলিজ'। যুদ্ধ শেষে পল্টন ভেঙে দেওয়ার কালে এর জনবল দাঁড়ায় প্রায় ছয় হাজারে। দীর্ঘদিন পর বাঙালির নিজস্ব পল্টন গঠনের সুযোগ আসায় সাজ সাজ রব পড়ে যায় সারা বাংলায়। ৭ আগস্টের ঘোষণা বাঙালি নেতাদের সক্রিয় করে তোলে, তাঁরা মনে করেন যে এই ঘোষণার ফলে বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ আর 'অযোদ্ধা জাতির' অন্যায্য অপবাদ দূর করার সুযোগ এসেছে। ৮ আগস্ট কলকাতার পত্রপত্রিকায় গভর্নরের ঘোষণাটি প্রকাশ পায়। ওই দিন *দি ইংলিশম্যান* পত্রিকার প্রতিনিধি বাঙালি পল্টনের উদ্যোক্তাদের প্রধান ব্যক্তি ডা. শরৎ কুমার মল্লিকের সাক্ষাৎকার নেন। ডা. মল্লিক বাঙালি পল্টন গঠনের জন্য প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু থেকে, অর্থাৎ ১৯১৪ সালের আগস্ট মাস থেকে সরকারের সঙ্গে দেনদরবার করে আসছিলেন। আর কাজটি ত্বরান্বিত করতে বর্ধমানের মহারাজার নেতৃত্বে 'বেঙ্গল রেজিমেন্ট কমিটি' নামের একটি বেসরকারি সংস্থা গঠন করেছিলেন। এই কমিটির কাজ ছিল সরকারের সঙ্গে দর-কষাকষির পাশাপাশি সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে তরুণদের পল্টনে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করা।

বাঙালি পল্টনে নারী

৮ আগস্টের সাক্ষাৎকারে ডা. মল্লিক বাঙালি পল্টন গঠনের জন্য তাঁর বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রম সম্পর্কে পত্রিকাটির প্রতিনিধিকে অবহিত করেন। তিনি জানান, বাঙালি পল্টনকে সফল করার জন্য তিনি বেশ কয়েকটি কমিটি গঠন করবেন, যার মধ্যে থাকবে নারীদের নিয়ে কয়েকটি কমিটি। একটি নারী কমিটির দায়িত্ব থাকবে বাঙালি সেনাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং চিত্তবিনোদনের উপকরণ সরবরাহ করা। ডা. মল্লিক আরেকটি মহিলা সমিতি গঠনের কথা উল্লেখ করেন,

যাদের কাজ হবে নারীসমাজ, বিশেষ করে মায়েদের উৎসাহিত করা, যাতে তাঁদের পরিবারের সদস্য বা সন্তানেরা পল্টনে যোগ দেয়। অর্থাৎ প্রথম মহিলা সমিতি মূলত সেনাদের বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করবে আর দ্বিতীয় মহিলা সমিতি প্রচারণার মাধ্যমে নারীদের, বিশেষত মায়েদের, বাঙালি পল্টনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করবে। ৯ আগস্ট সংবাদটি পত্রিকায় প্রকাশ পায় :

> 'Amongst other committees there is talk of forming one of ladies to look after the needs and comforts of the troops, while another will work with the aim of convincing mothers as to the utility of recruiting and of teaching them their duty as women of Bengal.'[৫]

বাংলার নারীরা প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে বাঙালি তরুণদের যুদ্ধে যোগদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করে আসছিলেন। ১৯১৫ সালের মাঝামাঝিতে বাঙালি স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে 'বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর' গঠিত হয়, আর ১৯১৬ সালের শুরুতে চন্দনগর (কলকাতার সন্নিকটে একটি ফরাসি ঔপনিবেশিক শহর) থেকে কিছু বাঙালি তরুণ ফরাসি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর ও ফরাসি বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন এক শয়েরও কিছু কম বাঙালি। বাঙালির এই যুদ্ধযাত্রায় বাংলার নারীরা সংহতি প্রকাশ করেছিলেন। এ ছাড়া প্রথম মহাযুদ্ধের বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধরত সেনাদের কল্যাণে অর্থ সংগ্রহের জন্য 'লেডি কারমাইকেল যুদ্ধ তহবিল' গঠনেও বাংলার নারীরা অবদান রাখেন। এই উদ্যোগগুলো ছিল মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক ও সীমিত আকারের। এতে সারা বাংলার সম্পৃক্ততা ছিল না। বিপরীতে বাঙালি পল্টনের জন্য প্রয়োজন ছিল হাজার হাজার সেনা ও সমানুপাতিক হারে অর্থ বা তহবিল। অর্থাৎ, বাঙালি পল্টন গঠনের উদ্যোগটি ছিল অভূতপূর্ব ও ব্যাপক এবং এতে সারা বাংলার সম্পৃক্ততার প্রয়োজন ছিল।

বাংলার নারীরা বাঙালি পল্টন গঠনে এগিয়ে আসেন। বাঙালি পল্টন গঠনে তাঁরা মূলত দুভাবে অবদান রাখেন। প্রথমত, তাঁরা একটি মহিলা সমিতি গঠন করেন। সমিতি সারা বাংলা থেকে পল্টনের জন্য অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করত। আর ওই অর্থের সাহায্যে তারা নতুন ভর্তি হওয়া সেনাদের ঢাকা আর কলকাতা থেকে পল্টন যাত্রাকালে উপহারসামগ্রী প্রদান করত। এ ছাড়া নওশেরা, করাচি আর মেসোপটেমিয়ায় থাকা বাঙালি সেনাদের কাছে নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পাঠিয়ে দিত। দ্বিতীয়ত, নারীরা বাঙালি তরুণ ও সেনাদের গান, কবিতা আর নাটকের সাহায্যে উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁদের কেউ কেউ বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমেও তরুণদের পল্টনে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করতেন। দ্বিতীয় উদ্যোগটি ছিল ব্যক্তি পর্যায়ের এবং বিচ্ছিন্নভাবে সংগঠিত হতো। এই রচনায় মূলত মহিলা সমিতির কর্মকাণ্ড তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সব

নারীকে চিহ্নিত করে তাঁদের কর্মকাণ্ডের তথ্য পাওয়া খুবই দুষ্কর। রচনায় দুজন নারীর তৎপরতা তুলে ধরে দ্বিতীয় উদ্যোগে নারীদের অবদান সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে।

মহিলা সমিতি ও বেঙ্গলি রেজিমেন্ট কমফোর্ট ফান্ড

মহিলা সমিতির সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। তবে এস এন হালদারের স্ত্রী বেলা হালদার (ল্যান্সডন স্ট্রিট) এবং পি কে রায়ের স্ত্রী সরলা রায় (বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড) মহিলা সমিতির যুগ্ম সচিবের দায়িত্বে ছিলেন। পত্রপত্রিকায় মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে তাঁদের নামে সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রকাশ পেত। কোথাও সরাসরি উল্লেখ না পাওয়া গেলেও বাঙালি পল্টনের প্রধান উদ্যোক্তা ডা. মল্লিকের স্ত্রী শিশির কুমারী মল্লিকা মহিলা সমিতির নেতৃত্বে ছিলেন বলে আভাস পাওয়া যায়, বিশেষ করে সুবেদার মনবাহাদুর তাঁর গ্রন্থে এ রকম ধারণাই দিয়েছেন। একেবারে শুরুতে সমিতির দাপ্তরিক কার্যক্রম ১০ ল্যান্সডন রোডে মিসেস বেলা হালদারের বাসায় শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে প্রায় এক বছর মিসেস আর সি দত্তের ৯/১ হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটের বাসায় মহিলা সমিতির কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। শেষে মহিলা সমিতির অফিস মিসেস কে বি দত্তের বাসায় স্থানান্তর করা হয়। প্রতি বুধবার মহিলা সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হতো। কলকাতায় মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের পাশাপাশি বাংলার অন্যান্য স্থানে আঞ্চলিক মহিলা সমিতি গঠিত হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর, ভাগলপুর, কাকিনা, আরামবাগে(!) মহিলা সমিতির উল্লেখ পাওয়া গেছে।

১৯১৬ সালের আগস্ট মাসে ডা. মল্লিক বেঙ্গল রেজিমেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে সেনাদের প্রয়োজনীয় কিছু দ্রব্য, যা সেনাবাহিনী বরাদ্দ করে না, তা প্রদানের জন্য সর্বসাধারণকে আহ্বান জানান। বাংলার প্রভাবশালী নারীরা এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে কলকাতার 'মেরি কার্পেন্টার হলে' একটি বড় ধরনের সভার আয়োজন করেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, তাঁরা বাঙালি পল্টন গঠনে সাহায্য করবেন। সেদিন বাঙালি পল্টন ও বাঙালি সেনাদের সহায়তা করতে একটি লেডিস কমিটি বা মহিলা সমিতি গঠিত হয়। সভায় আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, প্রশিক্ষণের জন্য রওনা হওয়ার সময় প্রত্যেক সেনাকে সাত রুপি মূল্যের ১১টি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীসহ একটি করে ব্যাগ উপহার দেওয়া হবে। সভায় অনেক ধনী ও উৎসাহী নারী এই উদ্যোগের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে বেশ কিছু অর্থ প্রদান করেন। মহিলা সমিতির উদ্যোগ সফল করার জন্য সর্বসাধারণকে অর্থ পাঠানোর আবেদন জানিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়।

১৯১৬ সালের ৩০ আগস্ট কলকাতায় বাঙালি পল্টনে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়।

'বেঙ্গলি ডবল কোম্পানি' নামের এই দলের জনবল ছিল ২২৮। নির্বাচিত সেনাদের ফোর্ট উইলিয়াম সেনানিবাসে রেখে দফায় দফায় নওশেরায় (বর্তমানে পাকিস্তানের অংশ) প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হতো। ১১ সেপ্টেম্বরের *দি ইংলিশম্যান* পত্রিকা থেকে জানা যায়, সেনানিবাসে অবস্থানকালে কলকাতার বেশ কিছু গণ্যমান্য পরিবারের নারীরা ভর্তি হওয়া নতুন সেনাদের জন্য খাওয়া ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পাঠাতেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ময়ূরভঞ্জের মহারানি, মিস এস সেন, মিসেস মেহতা, লেডি সিনহা, লেডি মুখার্জি, মিসেস ডি চৌধুরী, মিসেস কে পি বসু, মিসেস আর গুপ্তা, মিসেস এস আর দাস, মিসেস কে এন চৌধুরী, মিসেস এস পি সিনহা, মিসেস এন এন ঘটক প্রমুখ। একই সংবাদ থেকে জানা যায়, মহিলা সমিতি সেনাদের কঠোর জীবনকে সহনীয় ও স্বস্তিদায়ক করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে একটি তহবিল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে।[৬] মহিলা সমিতির এই তহবিলের নাম রাখা হয় 'বেঙ্গলি রেজিমেন্ট কমফোর্ট ফান্ড'। মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে তহবিল গঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় মিসেস কে বি দত্ত ও মিসেস পি চৌধুরীকে (বিশেষ কোষাধ্যক্ষ)। মহিলা সমিতির অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগে মিসেস পি চৌধুরী (বালিগঞ্জ), সরলা রায়, বেলা হালদার বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন, পত্রপত্রিকায় তাঁদের ঠিকানায় অর্থ পাঠানোর জন্য নারীসমাজকে আহ্বান জানানো হতো। তহবিলের অর্থ ব্যাংকে রাখা হতো। এই তহবিলের সাহায্যে মহিলা সমিতি সেনাদের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে বিদায়কালে তাঁদের দিত আর পল্টনের বিভিন্ন অবস্থানে পাঠাত।

মহিলা সমিতি এই তহবিলে অর্থ দেওয়ার জন্য মূলত নারীদের কাছেই আবেদন রাখত। তবে তহবিলের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, অনেক ভদ্রলোক এবং বিভিন্ন ধরনের সংগঠন ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানও এই তহবিলে অর্থ প্রদান করেছিল। এ ছাড়া বিভিন্ন চ্যারিটি শো, সিনেমা ও নাটক প্রদর্শন এবং মেলা বা প্রদর্শনীর আয়োজন করেও অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল। ১৯১৭ সালের ১১ আগস্টের পত্রিকা থেকে জানা যায়, মনমোহন থিয়েটার (কলকাতা) বেনিফিট পারফরম্যান্সের মাধ্যমে ১৩৫৯ রুপি ছয় আনা (এ সময় আনা ও পয়সারও বেশ মূল্য ছিল) সংগ্রহ করে তহবিলে জমা দিয়েছে। মহিলা সমিতির তহবিল সংগ্রহে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের আরও কিছু বেনিফিট পারফরম্যান্সের সংবাদ পাওয়া যায়। যেমন : বগুড়া এডওয়ার্ড ড্রামেটিক ক্লাব ১৩৫ রুপি, রংপুর ড্রামেটিক অ্যাসোসিয়েশন ৫০০ রুপি, রাচি থেকে শিশু পারফরম্যান্স বাবদ ৩০০ রুপি তহবিলে জমা দিয়েছিল। মহিলা সমিতির সদস্যদের অনেকে নিয়মিতভাবে তহবিলে চাঁদা দিতেন। চাঁদার পরিমাণ সুনির্দিষ্ট না থাকলেও মাসপ্রতি চার-পাঁচ রুপি করে দেওয়ার উদাহরণ লক্ষ করা গেছে। আবার কেউ কেউ এককালীন

মোটা অর্থ দিতেন। যেমন ১৯১৬ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পত্রিকা থেকে জানা যায়, কাশিমবাজারের মহারানি মহিলা সমিতির তহবিলে এক হাজার ৫০০ রুপি দান করেছেন।[৭]

বাঙালি পল্টনের সেনারা ১৯১৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর প্রশিক্ষণের জন্য যাত্রা শুরু করেন। ১২ সেপ্টেম্বর রাতে পল্টনের প্রথম দলের যাত্রাকালে হাওড়া রেলস্টেশনে বিদায় অনুষ্ঠান হয়, সেখানে দেশীয় ও ইউরোপীয় নারীরাও উপস্থিত ছিলেন। নারীরা বিদায়কালে আশীর্বাদসহ প্রত্যেক সেনাকে মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে কিছু উপহার দেন। মহিলা সমিতি পরবর্তী দলগুলোকেও একইভাবে বিদায় দেয়। নারীরা কীভাবে সেনাদের বিদায় জানাতেন, তা বেশ কয়েকজন সেনার লেখায় উঠে এসেছে। সুবেদার মনবাহাদুর সিং লিখেছেন :

'[১৯১৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর] প্রায় ৫টার সময় ফোর্ট থেকে হাওড়া স্টেশন অভিমুখে রওনা হলাম। সেখানে দেখি জনসমুদ্র! হর্ষে আনন্দে গর্বে মন অভিভূত হ'য়ে পড়ল। সেদিন যা দেখেছি, সেদিন জীবনে যে সম্পদ লাভ করছি, তা কখনও ভুলব না। আমাদের কামরার সামনে দুধারে দুটো সিঁদুর মাখানো মাটির কলসী ও ছোট ছোট দুটো কলা গাছ দিয়ে মঙ্গলঘট বানানো হয়েছে। লেডিজ্ কমিটি প্রত্যেককে এক-একটি ক'রে ব্যাগ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে সাবান, মাথার তেল, আয়না, চিরুনী, তোয়ালে, চিঠির কাগজ, খাম, পেন্সিল ইত্যাদি ছিল। মাতৃহৃদয়ের স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ সেই দানই সেদিন ছিল আমাদের যাত্রাপথের পাথেয়। মন সেদিন আমাদের কানায় কানায় পূর্ণ। কথা বলার শক্তি ছিল না, নীরব বিস্ময়ে, বিপুল পুলকে, অসীম কৃতজ্ঞতায় সেদিন হৃদয় আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। হয়তো চোখে দু-এক ফোঁটা জলও দেখা দিয়েছিল। ... গার্ডের বাঁশী বাজল। গাড়িতে উঠছি এমন সময় একটি বাঙালী মেয়ে মধুর কণ্ঠে বলে উঠলেন— "ভিক্টোরিয়া ক্রস আনা চাই কিন্তু।" "ভিক্টোরিয়া ক্রস!" সৈনিক জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান—প্রত্যেক সৈনিকের স্বপ্ন! তাই আনব আমরা? আনব কিনা জানি না, তবু বাঙালী কন্যা আমাদের জন্য সেদিন উচ্চতম আশাই করেছিলেন।'[৮]

একই ধরনের বর্ণনা দিয়েছেন ওই বছরের নভেম্বর মাসে বাঙালি পল্টনে যোগ দেওয়া সুবেদার ফণীভূষণ দত্ত। তিনি লিখেছেন :

'দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা বিশেষতঃ জননী সম্প্রদায় (মহিলা সমিতি) আমাদের জন্য নিজের সুখ শান্তি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কত আগ্রহ সহকারে আমাদের মঙ্গল সাধনে ব্যস্ত - কত কষ্ট করিয়া আমাদিগকে নানাভাবে আশীর্বাদ করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন তাহাতে সকলেরই একটা অনবদ্য গর্ব্ব ও আহ্লাদে বক্ষঃস্ফীত হইয়া উঠে। ...

যেদিন আমরা যাত্রা করি সেদিন হাওড়া স্টেশনে খুব সমারোহ এবং লোকের ভীড় হইয়াছিল। মহিলাবৃন্দের উৎসাহবাণী এবং আশীর্ব্বাদ তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক সৈনিককে একটি পেটিকায় (Comfort bag) নানাবিধ আবশ্যক দ্রব্য এবং শয্যা-দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া তাঁহারা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। রমণীগণ বাঙ্গালীবৃন্দের জন্য যাহা করিয়াছেন এবং করিতেছেন সে সমস্ত বস্তুতঃই অবর্ণনীয়, ইহাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য—ইহাঁদের স্নেহদৃষ্টি সততই আমাদিগের বহুবিধ সুখ বিধানে নিপতিত রহিয়াছে।[৯]

রেলস্টেশনে মহিলা সমিতির বিদায় অনুষ্ঠান সম্পর্কে সবাই প্রশংসা করলেও কিছু কিছু ত্রুটির জন্য তারা সমালোচিত হয়। পত্রিকায় প্রকাশ পায় :

'যে-সকল বাঙালীর ছেলে সিপাহী হইতেছে, তাহাদিগকে সমাদর করিয়া হাবড়া স্টেশন হইতে বিদায় দেওয়া হইতেছে এবং পথেও নানা স্থানে তাহাদের অভ্যর্থনা হইতেছে। কলিকাতার একটি নারীসভা সিপাহীদের প্রত্যেককে নানা-প্রকার নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যে পূর্ণ একটি করিয়া ব্যাগ উপহার দিতেছেন। সৈন্যদের প্রতি এই-প্রকার প্রীতি প্রদর্শন করিয়া নারীরা মাতৃজাতির কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। কিন্তু উপহারের ব্যাগগুলোতে সিগারেট থাকায় আমরা দুঃখিত হইয়াছি। আমাদের দেশী শিষ্টাচার পালন করিতে হইলে মাতৃস্থানীয়া নারীদিগের পক্ষ হইতে সন্তানস্থানীয় বালক ও যুবকগণকে সিগারেট উপহার দিবার প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া, সিগারেট বালক ও যুবকদের পক্ষে হানিকর; সকল বালক ও যুবক যে ধূমপান করে, তাহাও নয়; করিলেও জননী ও ভগিনীরা এই অনিষ্টকর জিনিস তাহাদিগকে উপহার দিবেন কেন?'[১০]

নারীসমাজের পথিকৃৎ হিসেবে সেনাদের মায়েরাও বিদায়কালে উপস্থিত থেকে তাঁদের সন্তানদের বিদায় জানাতেন বলেও পত্রপত্রিকায় উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৯১৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর হাওড়া রেলস্টেশনে বিদায় অনুষ্ঠানের বর্ণনায় উল্লেখ পাওয়া যায়, 'শ্রীমান কুমার অধিক্রম মজুমদার ও শ্রীমান অটলবিহারী মুখোপাধ্যায় নামক দুজন সৈনিকের জননীরা চন্দন দুর্বা দিয়া সৈন্যগণকে আশীর্বাদ করেন। এই নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলাদ্বয় আশীর্বাদ করিবার জন্যই দূর হইতে আত্মীয়দের সঙ্গে আসিয়াছেন।'[১১]

এভাবেই প্রতিটি সেনাদলকে কলকাতা থেকে নওশেরা ও পরবর্তী সময়ে করাচি রওনা দেওয়ার কালে রেলস্টেশনে বিদায় দেওয়া হতো। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর জৌলুশ কমতে থাকে। প্রথম দিকে স্টেশনে অনেক নারী উপস্থিত থাকলেও পরবর্তী সময়ে উপস্থিতির হার কমতে থাকে। তবে মহিলা সমিতি তাদের উপহার ঠিকই স্টেশনে বিতরণ করত। সেনা মাহবুব-উল-আলম ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে

পল্টনে যোগ দেন। তাঁর বিদায়কালে মহিলা সমিতি থেকে একজন নারী হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হয়ে প্রত্যেককে উপহারসামগ্রী বিতরণ করেন। কলকাতা বা মফস্বলে রেলস্টেশনে বিদায় অনুষ্ঠান ছাড়াও নারীরা নানাভাবে বাঙালি পল্টনের সেনাদের সম্মানিত করতেন। ১৯১৬ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ থেকে বাঙালি সেনার একটি দল পল্টন যাত্রা করে। অগ্রভাগে হাতি ও বাদক দলসহ একটি বিরাট মিছিল তাঁদের রেলস্টেশনে পৌঁছিয়ে দেয়। মিছিলটি রেলস্টেশনে যাওয়ার পথে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে বিরতি করে। সেখানে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা সেনাদের দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শোনায়। ১৯১৬ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম থেকে প্রথম রিক্রুট দল কলকাতা রওনা হয়। ওই দিন চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সদস্যরা রায় নবীনচন্দ্র দত্ত বাহাদুরের বাসায় অবস্থানরত ১১ জন রিক্রুটকে বিদায় শুভেচ্ছা জানান। ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে সভা করে বিভাগীয় কমিশনার মি কেসি দের স্ত্রী বাঙালি সেনাদের বিদায় জানান।

১৯১৬ সালের আগস্ট মাসের শেষে মহিলা সমিতি গঠিত হয় এবং পরের মাস থেকে তহবিল সংগ্রহ শুরু হয়। তহবিলে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহের আগেই বাঙালি পল্টনের সেনারা প্রশিক্ষণের জন্য যাত্রা শুরু করেন। তাই প্রথম দিকের, সম্ভবত শুধু সেপ্টেম্বর মাসের, সেনাদের বিদায়কালে প্রদত্ত উপহারের অর্থ 'লেডি কারমাইকেল যুদ্ধ তহবিল' থেকে খরচ হয়। পরবর্তী সময়ে মহিলা সমিতির পৃথক তহবিল গঠিত হয়ে গেলে অর্থের বিষয়ে তাদের আর সমস্যায় পড়তে হয়নি।

১৯১৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মহিলা সমিতি সারা ভারতের নারীদের কাছে বাঙালি পল্টনের জন্য গঠিত তহবিলে অর্থ প্রদানের আবেদন করে। আবেদনে প্রত্যেক সেনাকে কী কী দ্রব্য প্রদান করা হচ্ছে এবং তার জন্য কী পরিমাণ অর্থ খরচ হচ্ছে, তা উল্লেখ ছিল :

> 'On behalf of the Mohila Samiti we beg to bring to the kind notice of all Indian ladies that we have been working towards supplying necessities for the newly formed Bengali Double Company. The following list of things we are packing in the bags to be given to each of the recruited soldiers namely:- 1 bed sheet, 2 handkerchiefs, 2 towels, 1 vest, 1 pillow, 1 pillowcase, 1 bottle of mustard oil, 1 tooth powder, 1 soap, 1 cloth cleaning soap, 1 hair brush, 1 shoe brush, 1 shoe polish, button-thread, needle, letter papers, envelopes, pencil, looking glass, comb, pen, knife and enameled plat and glass. The cost of each bag of such bags is Rs. 7 and 228 bags are necessary which would cost Rs. 1576. For the present only 60 bags have been subscribed for and a donation of Rs. 105 has been received by the Samiti. May we ask you to subscribe towards this

scheme and help the Mohila Samiti in completing this work. You must be aware through your husbands that this is the first time that Bengal has been allowed this privilege and we need hardly remind you how important it is that we women should come forward and help in encouraging our young men to go out to uphold the honour of our country.'[১২]

একই সংবাদ ২ অক্টোবর পুনরায় প্রকাশ পায়। এভাবে পত্রপত্রিকায় মাঝেমধ্যে মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে আবেদন প্রকাশ পেত। ১৯১৬ সালের ৯ ডিসেম্বর *দ্য হিন্দু প্যাট্রিয়ট*, ১৯১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি *দি ইংলিশম্যান* এবং একই সালের ৭ এপ্রিল *দ্য বেঙ্গলি* পত্রিকায় অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী পাঠানোর জন্য এ ধরনের আবেদন লক্ষ করা যায়। আবেদনের ভাষাও লক্ষণীয়, 'All contributions, no matter how small, be received by Mrs P Chaudhury, 1 Bright Street, Ballygong.'

১৯১৬ সালের ১৯ অক্টোবর প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, ডা. মল্লিক বাঙালি পল্টনের সেনাদের জন্য বিনোদনমূলক প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছেন।[১৩] এ ধরনের সামগ্রী সেনাদের একঘেয়েমি দূর করবে এবং তাঁদের কষ্টের জীবনকে কিছুটা স্বস্তিদায়ক করবে। তিনি সর্বসাধারণের কাছে খেলার সামগ্রী, কাপড়চোপড়,' শীতবস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস পাঠানোর আবেদন রাখেন। এই দ্রব্যসামগ্রীর পাশাপাশি খাদ্যদ্রব্য, বিশেষ করে চাটনি, আচার, মসলা, মিষ্টি, শুকনো ফল, গুঁড়া দুধ, চা, বিস্কুট ইত্যাদি মহিলা সমিতির মিসেস এস এন হালদার ও মিসেস মল্লিকের (বিডন স্ট্রিট) ঠিকানায় পাঠানোর জন্য তিনি অনুরোধ করেন। বেঙ্গল রেজিমেন্ট কমিটি এভাবে মাঝেমধ্যে পত্রিকার মাধ্যমে সর্বসাধারণকে, বিশেষ করে নারীদের কাছে খাদ্যদ্রব্য পাঠানোর জন্য আবেদন করত।

মহিলা সমিতি তাদের তহবিলে যে অর্থ সংগ্রহ হতো, তার আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতি এক-দুই মাস পর পত্রিকা মারফত প্রচার করত। অর্থের হিসাবের পাশাপাশি মোটা দাগের বা অধিক পরিমাণে পাওয়া দ্রব্যসামগ্রীর তালিকাও প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হতো। ১৯১৬ সালের ৯ ডিসেম্বর হিসাবের প্রথম প্রতিবেদন *দ্য হিন্দু প্যাট্রিয়ট* পত্রিকায় প্রকাশ পায়। প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, শুরু থেকে ১৯১৬ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত তারা দুই হাজার ৫১২ রুপি ১৫ আনা সংগ্রহ করেছে। একই সংবাদ থেকে জানা যায়, মহিলা সমিতি প্রশিক্ষণরত সেনাদের জন্য তাদের তহবিল থেকে খাদ্য, কাপড়, ওষুধ ইত্যাদি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাতে জনপ্রতি দুই রুপি হিসেবে মাসে আনুমানিক ৪৫০ রুপির প্রয়োজন হবে।

২৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, ওই সময়ে তহবিলে মোট চার হাজার ২৯৪ রুপি ১২ আনা সংগৃহীত হয়েছিল।[১৪] ১৯১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, মহিলা সমিতি ওই পর্যন্ত ছয় হাজার ৫৭২

রুপি ১২ আনা সংগ্রহ করেছে। প্রতিবেদনে অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী প্রদানকারীদের একটি তালিকাও প্রকাশ করা হয়।[১৫] পরবর্তী সময়ে একই পত্রিকার ২১ এপ্রিল ও ৩১ মে সংখ্যা থেকে জানা যায়, মহিলা সমিতির তহবিলে যথাক্রমে ১০ হাজার ৩৫ রুপি ১২ আনা ও ১৩ হাজার ৫৯১ রুপি ১৪ আনা নয় পয়সা জমা পড়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মহিলা সমিতি অর্থ সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য ও সেনাদের ব্যবহার্য ব্যক্তিগত দ্রব্যসামগ্রী, যেমন চাটনি, আচার, মিষ্টি, সরষের তেল, সাবান ইত্যাদি সংগ্রহ করে বাঙালি পল্টনে পাঠিয়ে দিত। মহিলা সমিতি এই উদ্যোগ ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর থেকে শুরু করেছিল; আর এর জন্য তাদের সেনাপ্রতি দুই রুপি খরচ হতো, পরবর্তী সময়ে ১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এ অর্থ বাড়িয়ে চার রুপি করা হয়।

মহিলা সমিতি ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে তাদের তহবিলের নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে উল্লেখ ছিল, ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯১৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত সময়ে তহবিলে ১৬ হাজার ৩১৪ রুপি ১৫ আনা নয় পয়সা সংগ্রহ হয়েছে, যার মধ্যে খরচ হয়েছে ১২ হাজার ৭৯১ রুপি ১৫ আনা তিন পয়সা। ১৯১৭ সালের ১১ ডিসেম্বর *দি ইংলিশম্যান* পত্রিকায় বেলা হালদার ও সরলা রায় স্বাক্ষরিত মহিলা সমিতির একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ পায়। ওই প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ১৩ মাসে মহিলা সমিতি ১৫ হাজার ৬৬৬ রুপি সংগ্রহ করে, যার মধ্যে ১৪ হাজার ৬৫৯ রুপি খরচ হয়েছে।

২. মহিলা সমিতি বাঙালি পল্টনের জন্য দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা নিরূপণ করে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে তা সংগ্রহ ও বাক্সবোঝাই করে প্রতি সপ্তাহে পল্টনের করাচি ও মেসোপটেমিয়া অংশে প্রেরণ করছে।

৩. প্রতি মাসে এই পদ্ধতিতে বাঙালি পল্টনে দ্রব্যসামগ্রী প্রেরণে মহিলা সমিতির গড়ে এক হাজার ৬০০ রুপি প্রয়োজন হচ্ছে।

৪. বাঙালি পল্টনের সুবেদার মেজর, সুবেদার, জমাদার ও অন্য সেনারা দ্রব্যসামগ্রী প্রেরণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মহিলা সমিতিকে নিয়মিতভাবে চিঠি পাঠাচ্ছেন।

৫. উত্তর কলকাতার নারীদের সুবিধার জন্য ডা. মিসেস গাঙ্গুলি (গুরু প্রসাদ চৌধুরী লেন) এবং মিসেস মৃগেন্দ্র লাল মিত্রের (কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট) নিকট অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী প্রেরণের অনুরোধ করা হয়। অন্যান্য এলাকার নারীদের আগের মতো ট্রেজারার মিসেস পি চৌধুরীর (বালিগঞ্জ) সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়।

প্রতিবেদনে বাংলার নারীদের কাছে পুনরায় নিম্নরূপ আবেদন রাখা হয় :

'The Mahila Somity therefore approach you once more with the earnest hope that each and every well wisher of the Bengali Regiment will kindly contribute something towards the fund, which will enable them to carry on their work with satisfaction. Some of the boys who are now in Mesopotamia, had left their home over a year ago, it is needless to say how much they appreciate and love to receive any little gifts which come (as they say) from their mother and sisters at home. It would be an extra pleasure and delight to them if we could send something as the *Puja* and *Bhatri Dyttia* gift.'[১৬]

বাঙালি পল্টনের একাংশ ১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসে আজিজিয়ায় (মেসোপটেমিয়া) অবস্থান করছিল। সুবেদার মনবাহাদুরের লেখা থেকে জানা যায়, সেখানেও তাঁদের জন্য মহিলা সমিতির উপহার পৌঁছে যেত। তিনি লিখেছেন, 'এখনও বাংলাদেশের মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে নানারকম জিনিস আসছে।'[১৭] মহিলা সমিতির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, মেসোপটেমিয়ায় বাঙালি সেনাদের দ্রব্যসামগ্রী প্রেরণে প্রতি মাসে পাঁচ থেকে ছয় শ রুপি প্রয়োজন হতো।

১৯১৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির পত্রিকা থেকে জানা যায়, বেঙ্গলি রেজিমেন্ট কমফোর্ট তহবিলে মোট ১৯ হাজার ৪৮৩ রুপি ১৩ আনা নয় পয়সা জমা হয়েছে। এ সময় মহিলা সমিতির তহবিলে বেঙ্গলি প্যাট্রিয়টিক ফান্ড থেকেও নিয়মিতভাবে ২৫০ রুপি করে পাওয়া শুরু হয়। ১৯১৮ সালের প্রথমার্ধে তহবিলের সংকট দেখা দিলে কাশিমবাজারের মহারাজা তাঁর নিজস্ব জায়গায় মহিলা সমিতিকে একটি প্রদর্শনী করার অনুমতি দেন। মে মাসে তিন দিনের জন্য মহিলা সমিতি সেখানে প্রদর্শনীর আয়োজন করে এবং তা থেকে চার হাজার রুপি সংগ্রহ করে।[১৮]

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ধীরে ধীরে বাঙালি সেনারা পল্টন ত্যাগ করতে থাকেন। ১৯২০ সালের মাঝামাঝি বাঙালি পল্টন চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে বাঙালি পল্টনের জন্য গঠিত 'মহিলা সমিতি' আর 'বেঙ্গলি রেজিমেন্ট কমফোর্ট ফান্ড'ও বিলুপ্ত হয়। বেঙ্গলি রেজিমেন্ট কমফোর্ট ফান্ডে চূড়ান্তভাবে কী পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ হয়েছিল, তা জানা যায়নি। তবে ১৯১৮ সালের জুলাই পর্যন্ত মহিলা সমিতির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন *সৈনিক বাঙালী* গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রতিবেদনটিতে সমিতির যুগ্ম সেক্রেটারিরা স্বাক্ষর করেন। সেখানে শুরু থেকে ১৯১৮ সালের জুলাই পর্যন্ত সমিতির বিভিন্ন তথ্যের উল্লেখ আছে। প্রতিবেদনটি অনেকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় পরিশিষ্ট হিসেবে রচনার সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। এই প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এ সময় পর্যন্ত তহবিলে মোট ২৭ হাজার ৪৪০ রুপি চার আনা সংগ্রহ হয়েছিল এবং বিভিন্ন

ধরনের খরচের পর সাত হাজার ৫৬৩ রুপি পাঁচ আনা উদ্বৃত্ত ছিল। চূড়ান্তভাবে তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ মহিলা সমিতি সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে।

বাঙালি পল্টনের মৃত সেনাদের স্মৃতি রক্ষার্থে ১৯২৪ সালের আগস্ট মাসে কলকাতার কলেজ স্কয়ারে সামরিক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়। মহিলা সমিতি 'বেঙ্গলি রেজিমেন্ট কমফোর্ট ফান্ড'-এর যে অর্থ সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছিল, তা এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। সুবেদার মনবাহাদুর বলেছেন, 'মহিলা সমিতির তহবিলে যে টাকা ছিল সেই টাকা এই স্মৃতিস্তম্ভ রচনায় সাহায্য করেছে। সমিতি সেই টাকা সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়ে বাঙালী পল্টনের স্মৃতি রক্ষার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন।'[১৯]

ঢাকার মহিলা সমিতি

বাঙালি পল্টনে সেনা সংগ্রহের জন্য ঢাকায় একটি রিক্রুটিং সেন্টার ছিল। যেসব বাঙালি তরুণ ঢাকায় সেনা হিসেবে ভর্তি হতেন, তাঁরা ঢাকা থেকে সরাসরি করাচিতে চলে যেতেন। ফলে কলকাতা মহিলা সমিতির পক্ষে তাঁদের উপহারসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। ১৯১৭ সালের ৩ জুনের পত্রিকা থেকে জানা যায়, ওই দিন বিকেলে ঢাকায় ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউশনে গণ্যমান্য নারীদের একটি সভা হবে। এই সভায় সেনাদের উপহারসামগ্রী প্রদানের দায়িত্ব দিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে, যাতে কলকাতা মহিলা সমিতিকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে। এরপর ঢাকায় মহিলা সমিতি গঠিত হয় এবং কর্মকাণ্ড শুরু করে। *মেসোপটেমিয়ায় নজরুল* গ্রন্থে ঢাকায় গঠিত মহিলা সমিতির কর্তাব্যক্তিদের আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়, 'এ-সময় ঢাকায় যে-সব মহিলা প্রশংসনীয় কর্মতৎপরতার পরিচয় দেন, তাঁদের মধ্যে স্থানীয় উকিল অমৃত লাল চৌধুরীর সহধর্মিণী, সরসীবালা চৌধুরাণী; ব্যারিস্টার মি. এস. কে. নাগের পত্নী, প্রতিভা নাগ; উকিল শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।'[২০] */মেসোপটেমিয়ায় নজরুল : পৃ. ১৪৭/*। এখানে উল্লেখ্য, ঢাকার নারীরা বাঙালি পল্টন গঠনের আগেও ভারতীয় সেনাদের জন্য ব্যবহার্য জিনিস প্রেরণ করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় :

> 'এ শহরের [ঢাকা] অনেক মহিলাই যুদ্ধে আহত সৈনিকগণের সুখ-স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছেন। রমনাস্থ গভর্ণমেন্ট হাউসের যে-ঘরে বসিয়া ঐ সকল রমণীগণ তাহাদের কার্য্য করিয়া থাকেন, মাননীয় গভর্ণমেন্ট বাহাদুর সেদিন [১৯১৬ সালের জুলাই মাসে] সে-গৃহটি পরিদর্শন করিয়াছেন। সরকার বাহাদুরের এই পরিদর্শন দ্বারা মহিলাকুল বড়ই আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছেন।'[২১]

১৯১৮ সালের ৯ মার্চ গভর্নর লর্ড রোনাল্ডস ঢাকায় স্থানীয় নারীদের কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে উল্লেখ করেন :

> 'I thank too the ladies of Dhaka, both Indian and European for the works which they are doing in providing comfort for the troops. I thank too all those who have generously subscribed to the Dacca Ladies War Fund and in particular Srimati Sarajabala Devi of Bhowal, Babu Ramnath Ray of Kapasia, Babu Harendralal Ray of Bhagyakul, the Estate of Srimati Ananda Kumari Devi of Bhowal and Babu Rananath Das and his mother.[২২]

গভর্নর রোনাল্ডসের ঢাকায় প্রদত্ত বক্তৃতাটি ১০ মার্চ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ পায়, যেখানে তিনি ঢাকার মহিলা সমিতির অর্থ সংগ্রহে অবদান রাখার জন্য কয়েকজন নারীর নাম উল্লেখ করে প্রশংসা করেন। যুদ্ধ শেষে সরকার ঢাকার নারীদের মধ্যে প্রতিভা নাগ ও সরসীবালাকে 'সার্টিফিকেট অব অনার' প্রদান করে। ১৯১৯ সালের ২১ নভেম্বর ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মি. হার্ট সভা করে পুরুষ ও নারীদের সার্টিফিকেট প্রদান করেন। সরসীবালা পর্দানশিন বলে সভায় উপস্থিত হননি।

প্রশংসা ও স্বীকৃতি

মহিলা সমিতির কর্মকাণ্ড সমাজের সব স্তরে প্রশংসিত হয়। পল্টনের সেনারা, পত্রপত্রিকা, বিশিষ্ট ব্যক্তি, সাধারণ মানুষ—সবাই মহিলা সমিতির উদ্যোগগুলোর ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৯১৭ সালের ১৭ মার্চের পত্রিকায় উল্লেখ পাওয়া যায়, 'The efforts of the Mahila Samiti and Mr. J. N. Bose of Chandernagore and few others to see to the comforts of the members of the Double Company are most praise worthy.'[২৩] ১৯১৭ সালের ৯ জুন *দ্য হিন্দু প্যাট্রিয়ট* মহিলা সমিতির কর্মকাণ্ডের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাদের উদ্যোগকে চলমান রাখার জন্য অনুরোধ করে। নিচে সংবাদের অংশবিশেষ দেওয়া হলো :

> 'The very successful efforts of the Mahila Samiti in providing comforts for the Bengalee Regiment have been appreciated by the soldiers and the military authorities and by the public at large. Indeed, if the men's committee have busied themselves with the work of recruiting and organization, the Mohila Samiti have felt a mother's love for the lads and have thoughtfully provided them with many of the necessaries which would go for to soften the rigours of a soldier's life. ... We have every hope that Bengalee ladies will not be slow to contribute their mite towards the provision of comforts for the soldier sons of their motherland.'[২৪]

সার্বিকভাবে মহিলা সমিতির অবদান যে কত বিস্তারিত ও ব্যাপক ছিল, তা সেনা মাহবুব-উল-আলম উল্লেখ করেছেন এভাবে :

'মায়েদের সহানুভূতি আগা-গোড়াই ছিল। বাঙালী পল্টনের পশ্চাতে ছিল বাঙালী নারীর Sanction। পল্টন যত দূরেই গিয়াছে, জননীদের মঙ্গল জিজ্ঞাসা উহার অনুসরণ করিয়াছে। চোখের জল, আশীর্বাদ, হাওড়া হইতে যাত্রাকালে বিদায়—অভিনন্দন, পথের জন্য জলের কুজো, খাওয়ার সরঞ্জাম, বাগদাদের শীতের সময় সুদৃশ্য গরম কাপড়, জলপাই আচার, আমসত্ত্ব, মুড়ি, সন্দেশ, রসগোল্লা, নারিকেল, মাথায় মাখিবার তেল প্রভৃতি মায়ের দল বাঁধিয়া এবং জনে জনে পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান লেডীজ কমিটি পূজা পার্বণে তত্ত্ব পাঠাইতেও ভুলেন নাই। ফলতঃ একমাত্র নারীরাই পল্টনের প্রতি অবিমিশ্র আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন।'[২৫]

সুবেদার মনবাহাদুরও তাঁর গ্রন্থে মহিলা সমিতির প্রশংসা করেছেন :

'ডাক্তার মল্লিক, সুরেন ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি বাঙালী নেতারা যেভাবে বাঙালী যুবকদের অনুপ্রাণিত করে তুলছিলেন তাতে বাংলার মাতৃজাতিও নীরব ছিলেন না। মিসেস এস কে মল্লিক, মিসেস কে বি দত্ত, মিসেস জে এম রায়, মিসেস এম এস মিত্র, মিসেস জে সি মুখার্জি, মিসেস এ সি দত্ত, মিসেস এ পি সেন, মিসেস পি কে রায়, ডাক্তার মিসেস গাঙ্গুলি, মিসেস এস এন হালদার, মিসেস চৌধুরী এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আইসিএস মহাশয়ের পত্নী সরোজনলিনী দত্ত প্রভৃতি নেত্রীস্থানীয় মহিলাদের আন্তরিক উৎসাহে এবং উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে মহিলা সমিতি (লেডিস কমিটি) গঠন করে বাংলা থেকে বহু অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন এবং তা থেকে প্রায় সাত (৭০০০) হাজারের উপর বাঙালী সৈনিকের দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযুক্ত বহু জিনিসপত্র নৌসেরা, করাচি ও মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন। দূর দেশে বসে স্নেহহীন রুক্ষ আবহাওয়ায় এই দান আমাদের মনকে কৃতজ্ঞতায় এবং আনন্দে অভিভূত করে ফেলত।'[২৬]

মহিলা সমিতির সহায়তার কথা সেনারা ছাড়াও সাধারণ বাঙালিরাও বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করেছেন। ১৯১৭ সালের প্রথম দিকে একজন বাঙালি ভদ্রলোক করাচিতে গিয়ে বাঙালি পল্টন পরিদর্শন করেন। তিনি পল্টনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড দেখে এসে তার বিস্তারিত বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। বিবরণে মহিলা সমিতি প্রসঙ্গে লিখেছেন :

'মহিলা-সমিতি রোগীদের জন্য কয়েক প্রকার ঔষধ, ব্যান্ডাজ, হলিক্রস মিল্ক, টেবলয়েড, টিকেন ও এসেন্স প্রভৃতি দিয়াছেন। তাঁদের প্রদত্ত টিকেন ও মাউন এসেন্স বাঙ্গালী কোম্পানীর মরণোন্মুখ রোগীদেরকে প্রকৃতই সঞ্জীবনী শক্তি প্রদান করিয়াছে। এ-জন্য মহিলা-সমিতিকে ধন্যবাদ না দিলে নিতান্ত

অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয়।

'সৈনিক জীবনের কঠোরতার ভিতরে "মহিলা-সমিতি" প্রদত্ত জিনিসের দ্বারা বাঙ্গালী সৈনিকেরা অনেক আরাম পাইয়াছে। তাহাদের জিনিসগুলি ব্যবহারের সময়ে মনে হয় যেন "অমরধামের দেবীগণ" বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বরান্বিতা থাকিয়া আশ্বাসজনিত কঠোর ব্রতালম্বী বাঙ্গালী সৈনিকের শ্রম ও ক্লান্তি দূর করিতেছেন। তাহাদের স্নেহ-মানসপটে অঙ্কিত থাকিলে, বাঙ্গালী সৈনিকেরা অচিরেই রণক্ষেত্রে পৃথিবীর অজেয় বীর বলিয়া পরিচিত হইবে।'[২৭]

মহিলা সমিতির অবদান বিখ্যাত ব্যক্তিদের নজরও এড়ায়নি। রায় সাহেব রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *বাঙ্গালীর বল*-এ উল্লেখ করেছেন :

'বঙ্গ-মাতৃকা সেদিন "মহিলা-সমিতির" বেশে দেখা দিয়া নবধর্ম্মে দীক্ষিত পুত্রগণের শিরে আশীষকুসুম বর্ষণ করিয়াছিলেন, নানা নিত্যাবশ্যক উপাচার প্রদান করিয়া তাঁহারা পুত্রদিগকে সমরাঙ্গনে প্রেরণ করিয়াছিলেন - সহসা জাগ্রত পুত্রগণের নবদীক্ষার যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের হৃদয়ে বল সঞ্চার করিয়াছিলেন। মাতৃস্নেহ সেদিন অবরোধ প্রথাকেও উপেক্ষা করিয়া রেল স্টেশন পর্য্যন্ত বীর পুত্রের অনুগমন করিয়াছিল। সংবাদপত্রের বিজ্ঞ ইংরাজ সম্পাদক ও লেখকগণ এই সকল দেখিয়া বলিয়াছিলেন - বঙ্গের এই অনুষ্ঠান বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের একটি গৌরবমন্ডিত সূচনাকে উজ্জ্বল করিয়াছে - সন্দেহশূন্য করিয়াছে - সত্য বলিয়া জগৎ সমক্ষে বিঘোষিত করিয়াছে।'[২৮]

নারীসমাজের অন্যান্য অবদান

বাঙালি পল্টনকে উপলক্ষ করে বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু গান, কবিতা ও গল্প রচনা হয়েছিল। এসব গান, গল্প ও কবিতার মূল আবেদন ছিল বাঙালি তরুণদের উদ্বুদ্ধ করা, যাতে তাঁরা যুদ্ধে যোগ দেন এবং বিজয়ীর বেশে ফিরে আসেন। নারীদের মধ্যেও কেউ কেউ এই উদ্যোগে অংশ নেন। তাঁদের কবিতা ও গান এবং গানের স্বরলিপি সে সময়ের প্রধান সাময়িকীগুলোতে প্রকাশিত হয়েছিল। এ বিষয়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এ ছাড়া নারীদের মধ্যে সরলা দেবী তাঁর লেখনী ছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাহায্যে বাঙালি পল্টন গঠনে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। নারীসমাজের মধ্যে স্বর্ণকুমারী ও সরলা দেবীর ভূমিকা প্রতিনিধিত্বশীল বিবেচনায় নিচে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হলো।

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)

স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৫৫ সালের আগস্ট মাসে কলকাতার জোড়াসাঁকোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় বোন ছিলেন। তিনি কবি, ঔপন্যাসিক ও

সমাজসেবিকা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বাঙালি পল্টনের শুরু থেকেই তিনি এই আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং এর সপক্ষে বেশ কিছু কবিতা ও গান রচনা করেন।

১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের *ভারতী* পত্রিকায় 'বীর বন্দনা' নামে স্বর্ণকুমারী দেবীর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতায় স্বদেশি বীর সেনার স্তুতি গাওয়া হয়েছে। নিচে কবিতাটির প্রথম ও শেষ পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করা হলো :

'হে সৈনিক, মহাবীর, স্বদেশী আমার,
তোমার বীরত্বে মুগ্ধ দ্যুলোক ভূলোক,
ক্ষুদ্র আমি মহা গণি ভাই ব'লে ডাকি,
ভুলেছি গৌরবে তব, অধীনতা শোক। ...
কেমনে প্রশংসী তোমা? —নাহি কোনো ভাষা,
এ মহাসমরে আশা, দেবতার তুমি,
জানি না কি অর্ঘ্যে বীর বন্দিব তোমারে,
তব নামে দেশ ধন্য, ধন্য পরভূমি।'

১৩২৫ সালের পৌষ সংখ্যা *ভারতী* পত্রিকায় 'বাঙ্গালী পল্টনের যুদ্ধযাত্রা সংগীত' নামে স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫-১৯৩৯) একটি গান প্রকাশিত হয়। গানটির সুর ও স্বরলিপি রচনা করেন ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী (১৮৮৪-১৯৪০)। গানটি 'রাগিনী মিশ্র-তাল কাওয়ালি' সুরে রচিত। গানের প্রথম পঙ্‌ক্তিটি নিচে দেওয়া হলো :

'ঐ আহ্বান-গীতি বাজে,
জয় জয় জয় জয় প্রণামি রাজ রাজে,
সবে জাগি, এস লাগি জন্মভূমির কাজে।
হের দূরিত তিমির রাত্রি,
মোরা দীপ্ত প্রভাতের যাত্রী,
চলি উৎসাহে কোটি ভ্রাতৃ
বীর সৈন্যের সাজে;
যাপি বৃথা আলস্য ঘুমে
আর লুণ্ঠিত না রব ভূমে,
সম-আসন লব করমে
জগত-জাতির মাঝে।
(কোরাস) ঐ আহ্বান-গীতিবাজে, ইত্যাদি।'

'রণসংগীত' নামে স্বর্ণকুমারী দেবী আরেকটি গান প্রকাশ করেন *ভারতী* পত্রিকার ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। এটি ছিল 'মিশ্র শঙ্করা - একতাল' সুরে। সুর ও স্বরলিপি রচনা করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)। গানের চারটি পঙ্‌ক্তি ছিল, এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তি নিচে দেওয়া হলো :

(২)

'অন্ধ নয়ন গেছে খুলি, রণের মাঝে কোলাকুলি
মরণ আগে ভ্রাতৃবরণ, পূণ্য শপথ বলব—
কোরাস - জয় জয় জয় আর কি শঙ্কা, বেজেছে ঐ অভয় ডঙ্কা,
সমরে আজ অমর হয়ে বিজয়ধ্বনি তুলব।'

(৩)

'রক্তে লব প্রেমের টিকা, বুকে জ্বালব ক্ষেমের শিখা,
স্বদেশ বিদেশ ন্যায়ের দ্বারে এক ক'রে ভাই ফেলব।
কোরাস - জয় জয় আর কি শঙ্কা, বেজেছে ঐ অভয় ডঙ্কা
সমরে আজ অমর হয়ে বিজয়ধ্বনি তুলব।'

স্বর্ণকুমারী দেবী 'রণসংগীত' শিরোনামে আরও একটি গান রচনা করেন, যা *ভারতী* পত্রিকার ১৩২৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশ পায়। এর সুর ও স্বরলিপি রচনা করেন ইন্দিরা দেবী (১৮৭৯-১৯২২)। তিন পঙ্‌ক্তির গানের শেষ পঙ্‌ক্তিতে উল্লেখ ছিল :

'তপ্ত রক্ত শিরায় জাগে, নামরে কূলে,
চলরে আগে,
দাড়াই গিয়ে পুরোভাগে,—অরির প্রতাপ হবি।
ধন্য হোক তুচ্ছ জীবন, —ধন্য মানি স্তন্য গ্রহণ
জয়সমুদ্রে পার হব ভাই —ধর্ম্মরাজে স্মরি।
কোরাস
জয় জয় জয় জয় বল বল হো—
দিগ সীমান্তে চল চল হো—
গাও জয়, রণ জয়, গগন ভরি—
আমরা 'তুফানে কি ভড়ি।'

এ ছাড়া স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা ১৩২৪ সনের আষাঢ় সংখ্যা *ভারতী*তে একজন বাঙালি সেনার লেখা ব্যঙ্গ কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। কবিতাটি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন, 'ইহা ছন্দে বন্ধে নির্দ্দোষ নহে, ভাষা লালিত্যেও অপরুপ নহে, তথাপি ইহার ছত্রে ছত্রে যে একটি হাস্য কৌতুক নিহিত আছে তাহা অতি মনোরম এবং ইহার বর্ণনাও অতি উপাদেয়।'

সরলাদেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪০)

সরলাদেবী ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার জোড়াসাঁকোতে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম জানকীনাথ ঘোষাল। বাংলার নারীরা বাঙালি পল্টন গঠনের

বেশ আগেও বাঙালি তরুণদের শৌর্যবীর্য এবং শক্তি ও সাহস জাগিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সরলাদেবী এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। বিশ শতকের প্রারম্ভে *ভারতী* পত্রিকায় এ বিষয়ে তিনি বেশ কিছু রচনা প্রকাশ করেছিলেন। সরলাদেবী ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙালি তরুণদের মধ্যে বীরপূজা, বীরের নামে উৎসব ইত্যাদি কর্মকাণ্ড শুরু করেন। উৎসবে বাঙালি তরুণেরা তলোয়ার খেলা, কুস্তি, বক্সিং ইত্যাদি যুদ্ধন্যায় ক্রীড়ার চর্চা করতেন। সরলাদেবী বাঙালি বীরদের নিয়ে ছোট ছোট পুস্তিকাও প্রকাশ করেন। সরলাদেবীর এ সমস্ত কর্মকাণ্ডকে কেউ কেউ ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে তৎপরতা মনে করতেন। সরলাদেবীর মামা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এ সমস্ত উদ্যোগকে সন্দেহের চোখে দেখতেন এবং বিরোধিতা করতেন। *জীবনের ঝরা পাতা* সরলাদেবীর বিবাহপূর্ব জীবনের (১৯০৫ সাল পর্যন্ত) স্মৃতিকথা। এই বই-এ সরলাদেবী বাঙালি তরুণদের শৌর্যবীর্য জাগিয়ে তোলার জন্য কী কী করেছিলেন, তার বর্ণনা পাওয়া যায়। –

বাঙালি পল্টনে সেনা ভর্তির জন্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে উদ্দীপনামূলক সভার আয়োজন করা হতো। এই সভায় দেশের নামকরা নেতারা বক্তৃতা দিতেন। নারীরাও এ ধরনের সভায় তরুণদের উদ্বুদ্ধ করতেন। এ প্রসঙ্গে সরলাদেবী সবচেয়ে এগিয়ে ছিলেন। তিনি লাহোরে থাকতেন এবং সেখান থেকে ১৯১৮ সালের প্রথম দিকে দু-তিন মাসের জন্য বাংলায় আসেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি বাঙালি পল্টনে যোগদানের জন্য তরুণদের এবং তাঁদের অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করতে কলকাতা, চট্টগ্রাম, হুগলি, কাশীপুর প্রভৃতি এলাকায় সভা করে বক্তৃতা দেন। এসব বক্তৃতার কিছু উদ্ধৃতাংশ নিচে দেওয়া হলো :

'আজ তোমাদের বীরত্বে উত্তেজনা দিতে এখানকার [হুগলীর] ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দ্বারা এ সভা আহূত হয়েছে। ডাক্তার মল্লিক প্রভৃতি উদ্যোগীরা তোমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান করতে এসেছেন এবং আমার মুখ দিয়ে সেই আহ্বানবাণী উচ্চারিত করার জন্য আমাকে নিয়ে এসেছেন। কেন? কারণ আমার আহ্বান আজ হঠাৎ আহ্বান নয়। যতদিন আমার জ্ঞানবুদ্ধি বিকশিত হয়েছে ততদিন থেকে আমি তোমাদের আহ্বান করছি। আর সে আমারও আহ্বান নয়। আমার দ্বারা চিৎরূপিনী জগজ্জননী শক্তির আহ্বান। যিনি অখিলের আত্মা, সৎ-অসৎ যা-কিছুর মধ্যে যে শক্তি তা যিনি, সেই শক্তির শক্তি মহাশক্তি বাঙ্গালী জাতিকে আমার ক্ষুদ্র কণ্ঠ দিয়ে আহ্বান করছেন।' */ভারতী : চৈত্র ১৩২৪. পৃ. ১১৩৮ ও ১১৩৯/*। 'বাঙ্গালীর ধড়ে বীরত্ব নেই বাঙ্গালীর শরীরে সাহস নেই, বাঙ্গালীর প্রাণে কষ্ট সহিষ্ণুতা নেই, বাঙ্গালীর আত্মমর্য্যাদা নেই, আত্মসম্মান বোধ নেই এ কলঙ্ক স্খলন কর।' */ভারতী : বৈশাখ ১৩২৫. পৃ. ৯০/*। 'মেকলে থেকে আরম্ভ করে সব ইংরেজই বাঙ্গালীকে বুলি

পড়িয়ে আসছেন—"বাঙ্গালী ঝুটো, বাঙ্গালী নগণ্য, বাঙ্গালী মূল্যহীন"—এত বছরের বুলি পড়েও বাঙ্গালী বল্লে—"না বাঙ্গালী সাচ্চা, বাঙ্গালী সোনা, আগুনে পুড়িয়ে দেখ"। চট্টগ্রামের বাঙ্গালী, তোমাদের মধ্যে সেই কথা বলবে কে, কে আগুনে পুড়তে সাহস করবে?'[২৯]

১৯১৮ সালের ২ মার্চ কলকাতা কলেজ স্কয়ারে জে জি কেসির সভাপতিত্বে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কুমার মনিন্দ্র, কর্নেল বুডিয়ার, পণ্ডিত রামেন্দ্রভূষণ, ডা. মল্লিকসহ আরও কেউ কেউ বক্তব্য দেন। সরলাদেবীও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি তরুণদের বাঙালি পল্টনে যোগদানের জন্য আবেগপ্রবণ ভাষণ দেন। তিনি বলেন :

'Where are the youths of our nation? Let them come forward. Let them think of the day when their ideals will change, so that a Deputy Magistrate or an Engineer or a lawyer will be less in popular-esteem than a Lieutenant, or Captain, or Colonel, or General. They wanted University medals, why do they not try for a Victoria Cross. The University must not be the all and end all of life. Mother Bengal was calling on them to come forward.'[৩০]

বাঙালি পল্টনে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করার বিষয়ে সরলাদেবীর ভূমিকার প্রশংসা করে চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার তাঁকে একটি পত্র দেন। পত্রের অংশবিশেষ নিচে দেওয়া হলো :

'You [Sarala Devi] have asked me to say what you did to help recruiting in my Division, your services to the cause in Bengal have already been commended by Sir Charles Monro in his Dispatch, I add to that by saying that you re-kindled the enthusiasm when our endeavors had failed and popular feeling had subsided, your speeches drew the attention of the Mohammedans who were so long keeping away and your earnestness fervor brought fresh life to the movement and really increased the rates of recruiting in Chittagong Division, Sitakund and Agartola.

We had been supplying a large number of non-combatants but on combatant recruits were very few and after you came that we succeeded in inducing the lower classes, particularly the Mohammedans to join the combatants ranks. This was to a great extent due to your effects and we are all deeply grateful to you. ... K C De.'[৩১]

১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাঙালি পল্টনে যোগ দেওয়া সেনাদের প্রশিক্ষণ নওশেরায় (বর্তমানে পাকিস্তানের অংশ) হতো। সেনাদের লাহোর হয়ে

নওশেরায় যেতে হতো। সরলাদেবী বিবাহসূত্রে লাহোরে থাকতেন। সরলাদেবী নিয়মিতভাবে লাহোর রেলস্টেশনে বাঙালি সেনাদের অভ্যর্থনা জানাতেন। অনেক সেনাই সরলাদেবীর এই বদান্য তাঁদের স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন। পল্টনের সেনা সুবেদার ফণীভূষণ দত্ত সরলাদেবীর আতিথেয়তা সম্পর্কে উল্লেখ করেন :

'লাহোরে শ্রদ্ধাস্পদা মাতৃস্থানীয় শ্রীমতী সরলা দেবীর আতিথ্য গ্রহণে আমরা পবিত্র ও ধন্য হই। সহস্র অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি আমাদের জন্য স্টেশনে ধাবিত হইয়াছিলেন। আমাদের এই "লক্ষ্মীছড়া দলের" জন্য এই মূল্যহীন নগণ্য ক্ষুদ্র জীবগুলোর জন্য—তাহার অসীম অকৃত্রিম স্নেহের নিদর্শন পাইয়া পরম আপ্যায়িত ও আনন্দিত হইলাম—আমাদের জীবনগুলিকে সার্থক জ্ঞান করিতে লাগিলাম। তিনি আমাদের স্বহস্তে নানাবিধ ভোজদ্রব্য প্রস্তুত করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই—আমাদের পরিতোষ ও উৎসাহের নিমিত্ত রাতে ১০ ঘটিকার সময় স্বীয় পুত্রদ্বয়ের সহিত নিম্নোদ্ধৃত স্বরচিত সুললিত সঙ্গীতটি সুমধুর কণ্ঠে গান করিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করেন—

"বাঙ্গালী ডবল কোম্পানী"

খাম্বাজ-একতাল

(১)

'কোন, রূপ সাগরে ডুব দিলিরে,
বাঙ্গালী সেপাইরা!
তোদের দেখে চক্ষু জুড়ায়
ওরে মানিক ভাইরা!

বাঙ্গালী সেপাইরা, আমার মানিক ভাইরা! ...

'তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষা ও আশীর্ব্বাণী জীবনে কখনই ভুলিব না। তাঁহার বাণীগুলো প্রস্তরাঙ্কিত অক্ষরের ন্যায় আমাদিগকে সতত সত্যের আলোকে ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করিবে। তাঁহার উপদেশ, কর্তব্য শিক্ষা এবং বিপথগামী হইলে তাঁহারই আশীস, সুদৃঢ় বর্ম্মের মত আমাদিগকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করিবে। ...

'বলিতে ভুলিয়াছি, বোধহয় শ্রদ্ধাস্পদা সরলা দেবী মহাশয়া নিজে। "বাঙ্গালী ডবল কোম্পানী"র কল্যাণার্থে তিনবার আনন্দধ্বনি করেন। আমরাও অবনত মস্তকে তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে যথারীতি সম্মান প্রদর্শনে ধন্য হই!'[৩২]

সরলাদেবীর রচিত ওপরে উল্লিখিত গানটিই সম্ভবত বাঙালি পল্টন গঠনের পর রচিত প্রথম গান। বাঙালি পল্টনের প্রথম দল যখন লাহোর হয়ে নওশেরায় যাচ্ছিল, তখন তিনি তাঁর রচিত গানটি গেয়ে শোনান। পরবর্তী সময়ে পল্টনের যত দল এ পথে নওশেরায় গিয়েছিল, তাদের সবাইকেই সরলাদেবী গানটি শুনিয়েছিলেন এবং এর নকল সরবরাহ করেছিলেন।

১৩২৪ সনের ফাল্গুন সংখ্যা *ভারতী* পত্রিকায় সরলাদেবী 'যুদ্ধ গীতি' নামের একটি গান স্বরলিপিসহ প্রকাশ করেন। গানটি 'ঝিঁঝিট খাম্বাজ-কাওয়ালি' সুরের। সরলাদেবী উল্লেখ করেছেন, মেসোপটেমিয়া থেকে বাঙালি সেনাদের অনুরোধে তিনি এই মার্চিং সঙ বা রণসংগীতটি রচনা করেন। গানের শেষ পঙ্‌ক্তিতে রচয়িতা লিখেছেন,

'মা ভৈঃ মা ভৈঃ রবে চল ছুটে সবে
আ হবে, আগে কে হবে!
বিজয় বা স্বরগের স্বাদ কেবা লবে
আ হবে, আগে কে হবে।
আমি সে, আমি সে, আমি, আমি, আমি
যেতে দে, আগে হতে দে।
রণরঙ্গে মার সঙ্গে হতে দে
আগে যেতে দে।
গরজে তোপ্ কামান মাঝে
জগ জননী সমর সাজে রে
না চে!
আজি নাচে!
ঐ নাচে
রণ মাঝে।'
(বন্দে মাতরম)

বাঙালি পল্টন ভেঙে দিলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহী সেনারাও হতাশ হন। তাঁদের অনেকে মত প্রকাশ করেন, দু-একজন নেতা ব্যতীত অন্যদের অনুৎসাহের কারণেই বাঙালি পল্টন স্থায়িত্ব পায়নি। তাঁদের ধারণা হয়, সরলাদেবী বা এ ধরনের উদ্যোগীরা চেষ্টা করলে হয়তো বাঙালি পল্টন স্থায়িত্ব পেত। সুবেদার মনবাহাদুর উল্লেখ করেন, 'বাঙালি রেজিমেন্ট গড়ে তুলতে হলে বর্ধমানের মহারাজা, মি. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও ডাক্তার এস কে মল্লিকের মত উৎসাহী নেতা প্রয়োজন। আর একদিকে আরও প্রয়োজন পুজনীয়া শিশির কুমারী মল্লিক (মিসেস এস কে মল্লিক) ও সরলা দেবীর মত উৎসাহী কর্মী মাতা।'[৩৩]

উপসংহার

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাঙালি নারীরা অন্তঃপুরবাসিনী হলেও যে মাঝেমধ্যে তাঁরা চৌহদ্দির বাইরে বের হননি বা হতে চাননি, তা নয়। বাঙালি পল্টনে নারীরা

যে ভূমিকা রেখেছিলেন, তা আলোচ্য এ প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে। শহর ও গ্রামের নারী কিংবা বয়স্ক ও কম বয়স্ক নারী সবাই বাঙালি পল্টন গঠনে একত্র হন। বিশ শতকের প্রথম ভাগ বাঙালি সমাজ ভীষণভাবে পুরুষতান্ত্রিক হলেও, সমাজের ফাঁক গলে নারীরা মাঝেমধ্যেই হাজির হতেন জনসাধারণ্যে, ইতিহাসে তাঁদের অস্তিত্বের জানান দিতেন। বাঙালি পল্টনে নারীদের অবদান এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইতিহাসের কর্তৃত্বশীল ধারা নারীদের এসব অবদানকে এর বিবরণে প্রায় জায়গা দেয়নি বললেই চলে। তাই বর্তমান প্রবন্ধে প্রায় বিস্মৃত এই ঘটনা বাংলার ইতিহাসতত্ত্বে যেন সামান্যতম হলেও একটু জায়গা পায়, সে চেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. Tanika Sarkar, *Rebels, Wives, Saints: Desining Selves and Nation in Colonial Times* (London: Segaul Books, 2009) আরও দেখুন Tanika Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation: Community, Religion and Cultural Nationalism* (London: Hurst and Company, 2001).

২. Sugata Bose, 'Nations as Mother: Representations and Contestations of India' in Sugata Bose and Ayesha Jalal (eds.), *Nationalism, Democracy and Development: State and Politics in India* (New Deldhi: Oxford University Press, 1997), p. 154.

৩. Partha Chatterjee, `The Nationalist Resolution of the Women's Question' in Kumkum Sangari and Sudesh Vaid (eds.), *Recasting Women: Essays in Colonial History* (New Delhi: Kali for Women, 1989), pp. 233-253.

৪. Willem van Schendel, *A History of Bangladesh* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), p.34.

৫. *The Englishman*, 9 August, 1916.

৬. *The Englishman*, 11 September, 1916.

৭. *The Englishman*, 11 August, 1917.

৮. সুবেদার মনবাহাদুর সিংহ, *সৈনিক বাঙালী* (কলকাতা : মুখার্জি প্রেস, ১৯৪০), পৃ. ৭২-৩।

৯. সুবেদার ফণীভূষণ দত্ত, 'আমার যুদ্ধ যাত্রা' *মালঞ্চ, মাঘ ১৩২৫*, পৃ. ৭০৯।

১০. *প্রবাসী*, কার্ত্তিক ১৩২৩, *পৃ. ১১*।

১১. *প্রবাসী*, কার্ত্তিক ১৩২৩।

১২. *The Englishman,* 27 September, 1916.

১৩. *The Englishman,* 19 October, 1916.

১৪. *The Hindoo Patriot*, 29 December, 1916.

১৫. *The Hindoo Patriot*, 27 February, 1917.

১৬. *The Englishman,* 11 December 1917.

১৭. সিংহ, *সৈনিক বাঙালী*, পৃ. ১৬৭।

১৮. *The Englishman,* 27 February, 1918.

১৯. সিংহ, *সৈনিক বাঙালী*, পৃ. ২২৪-২২৬।
২০. ড. এস. এম. লুৎফর রহমান, *মেসোপটেমিয়ায় নজরুল* (ঢাকা : ধরণী সাহিত্য সংসদ, ২০০৫), পৃ. ১৪৭।
২১. রহমান, *মেসোপটেমিয়ায় নজরুল*, পৃ. ১৪৬।
২২. সিংহ, *সৈনিক বাঙালী*, পৃ. ২৩৫।
২৩. *The Hindoo Patriot,* 17 March 1917.
২৪. *The Hindoo Patriot,* 9 June 1917.
২৫. মাহবুব-উল-আলম, *পল্টন-জীবনের স্মৃতি* (চট্টগ্রাম : জামানা পাবলিশার্স, ১৯৫৫), পৃ. ৩, ৫।
২৬. সিংহ, *সৈনিক বাঙালী*, পৃ. ১১০।
২৭. রহমান, *মেসোপটেমিয়ায় নজরুল*, পৃ. ৬২।
২৮. রায় সাহেব রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, *বাঙ্গালীর বল* (কলকাতা : স্টুডেন্টস লাইব্রেরী, ১৩৪৫), পৃ. ৫৯৪।
২৯. *ভারতী*, জৈষ্ঠ্যে ১৩২৫. পৃ. ১১৬, ১১৭।
৩০. *The Englishman,* 5 March 1918.
৩১. *The Bengalee,* 7 September 1919.
৩২. *মালঞ্চ,* মাঘ ১৩২৫ পৃ. ৭১০ ও ৭১১।
৩৩. সিংহ, *সৈনিক বাঙালী*, পৃ. ২৪১।

সাংস্কৃতিক পাঠ

ফুটপাতের চটি বই ও ‘মাঝারি’ গরিবের আত্মপরিচয়

সুমন রহমান

সারসংক্ষেপ

একটি বিলুপ্তপ্রায় শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে একটি বিপন্নপ্রায় সাংস্কৃতিক বর্গের আদান-প্রদান এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। চটি বই নামক মুমূর্ষু শিল্পমাধ্যমটিকে ধরে শহরকেন্দ্রিক অল্পশিক্ষিত ‘মাঝারি’ গরিবের সাংস্কৃতিক অভিলাষকে শনাক্ত করা হয়েছে এখানে। কোন ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিসরে শহরবাসী এই মাঝারি গরিবের প্রেম উৎপাদিত হচ্ছে এবং তার সাথে এই সাংস্কৃতিক শ্রেণীর আত্মপরিচয়ের রাজনীতি কীভাবে সম্পর্কিত হচ্ছে—এই লেখায় তারই অনুসন্ধান করা হয়েছে গত শতকের নব্বই দশকে বের হওয়া কয়েকটি প্রেমপত্রের চটি বইয়ের নিবিড় পঠনের মাধ্যমে। অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের হাতিয়ার হিসেবে এই প্রবন্ধে চিহ্নতাত্ত্বিক বা সেমিওলজিক্যাল পদ্ধতির সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের মিশেল ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: ফুটপাতের বই, মাঝারি গরিব, নিম্নবর্গের বিনোদনমাধ্যম, আরবান ফোকগান, সোশ্যাল রিয়ালিজম ও সোশ্যাল ফ্যান্টাসি।

ভূমিকা

সিডি-ডিভিডির সহজলভ্যতার এই যুগে ফুটপাতের বই আজকাল বিরল হয়ে যাওয়া একটি বিনোদনমাধ্যমের নাম। তবু আজও এর অস্তিত্ব আছে এবং শহুরে নিম্নবর্গের একটি অংশ এখনো এসব বই নেড়েচেড়ে দেখে। এই ধারার সস্তা বইয়ের ইতিহাস সুদীর্ঘ আড়াই শ বছরের, আছে বিচিত্র বিষয়ে ও আঙ্গিকে বই প্রকাশনার রেওয়াজ। ‘প্রেমপত্রের বই’ তেমনি একটা ক্যাটাগরি, যাকে আশ্রয় করে বর্তমান নিবন্ধে আমরা দেখব ঢাকা শহরে কীভাবে ‘মাঝারি’ গরিবের আত্মপরিচয় উৎপাদিত হচ্ছে। এসব

বইতে বিভিন্ন প্রেমমূলক পরিস্থিতিতে একজন পুরুষের সঙ্গে নারীর চিঠি চালাচালি নমুনা আকারে থাকে। যেহেতু একটি প্রেমের শুরু, মধ্য ও শেষ আছে, ফলে ধারাবাহিকভাবে একটি প্রেমের উপাখ্যানকে বর্ণনা করার চেষ্টার মাধ্যমে প্রেমপত্রের বই প্রায়ই বিভিন্ন কাহিনির উন্মোচন করে। প্রেমার্থী নর এবং নারীই কেবল এসব কাহিনির উপজীব্য নয়, বরং নানান বর্ণের পার্শ্বচরিত্রও ঘুরে বেড়ায় তার ছত্রে ছত্রে। ১৯৯০-এর দশকে বের হওয়া এমনি কয়েকটি বইয়ের নিবিড় পঠনের মাধ্যমে এই লেখাটি মূলত ঢাকা শহরের অল্পশিক্ষিত 'মাঝারি' গরিবকে একটি বিপন্নপ্রায় সাংস্কৃতিক প্রজাতি হিসেবে শনাক্ত করবে, যারা অপ্রাতিষ্ঠানিক নগরগরিবি বিকাশের রমরমা এই যুগে নিজেদের শহুরে মধ্যশ্রেণীর বিস্তৃত সাংস্কৃতিক বলয়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

গোড়াতেই 'মাঝারি গরিব' বলতে কাদের বোঝাচ্ছি, সেটা পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেওয়া যাক, যদিও আখেরে এ রকম একটি সমাজতাত্ত্বিক অবস্থাকে ঠিকঠাক বোঝার উদ্দেশ্যেই এই সাংস্কৃতিক পঠন। ফলে 'মাঝারি গরিব' কারা এটা এখন নিতান্তই শুরুর আলাপ, শেষের মোকাম খানিক ভিন্ন হলেও হতে পারে। সেটুকু ঝুঁকি স্বীকার করেই আলাপটা পাড়া যাক, যাতে এই প্রবন্ধের মনস্তাত্ত্বিক ভ্রমণটুকু পাঠক ওয়াকিবহাল থাকেন। উন্নয়ন-অধ্যয়নশাস্ত্রে আয়ের কিংবা ক্রয়ক্ষমতার ফারাক বোঝানোর জন্য যে গরিব গোষ্ঠীকে 'মডারেট আরবান পুওর' বলে শনাক্ত করা হয়, 'মাঝারি গরিব'কে এর অনুবাদ ঠাওরালে সমস্যা হতে পারে। আবার পেশার রকমফের খেয়াল করে অর্থশাস্ত্রে 'ফর্মাল পুওর' বলে যে শ্রেণীকে শনাক্ত করার চেষ্টা আছে, তাতেও পুরোপুরি মিশ খায় না এই 'সাংস্কৃতিক' গোষ্ঠী। যে গরিবের কথা এই প্রবন্ধে পাড়া হয়েছে, তারা মোটা দাগে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিরই অংশ বটে। কিন্তু তাদের যে সাংস্কৃতিক দ্যোতনার উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে এই লেখায়, প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির দেওয়া সংজ্ঞায় সেটাকে আঁটানো যায় না। ফলে বর্তমান প্রবন্ধে, এ রকম একটি দ্ব্যর্থবোধক অভিধাকে সম্বল করেই এগোনোর নিয়ত করেছি।

প্রেমপত্রের বইয়ের প্রায়োগিক উদ্দেশ্যের দিকটি সহজে বোধগম্য। যে চিঠিটি পাশের বাড়ির সখিনার কাছে কিংবা পাশের গ্রামের আয়েশার কাছে লিখবে বলে কত কত দিন হাতে কলম নিয়ে ছটফট করেছে ঢাকা শহরের দোকান কর্মচারী জাহাঙ্গীর, সিএনজিচালিত অটোরিকশার ড্রাইভার ইসরাইল বা বাস টার্মিনালের টিকিট ক্লার্ক সোলমান, কলম নিয়ে মেসের চৌকিতে ছুটির দিন দুপুরবেলা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তেই ফুরিয়ে গেছে ভাব, বদমাশের মতো উধাও হয়ে গেছে অতি দরকারি শব্দ কিংবা শব্দবন্ধ। শেষে, নিরুপায় হয়ে একটা লাগসই 'ছন্দের'[১] জন্য ধরনা দিয়েছে শাহ আলীর মাজারের ভবঘুরে ফকির আবদুল্লার কাছে। সেই চিঠি,

সেসব দিস্তা দিস্তা চিঠির জন্য সস্তা কিছু বই তাদের এই ভাবজোগাড়ের কাজ থেকে রেহাই দিয়েছে। সারা দিনের হাঁকডাক মেশিন চালানো বেচাবিক্রির পর ক্লান্ত হাতে কলম নিয়ে ভাবের ঘরে গুঁতাগুঁতি তাদের যেন মানায় না, ফলে এই রেডিমেড পুস্তকি সহায়তা। এসব পুস্তকপ্রণেতা আমাদের জানান যে শহরবাসী মাঝারি গরিবের প্রেম কীভাবে কোথায় হয়, সেখানে কাদের ভাবের ঘরে কারা টোকা দেয়, অমর প্রেমের যাত্রাপথে কোন ঘটনার পর কোন ঘটনা ঘটে, পতনোন্মুখ ভাবকে ঠেকা দিয়ে রাখার জন্য কোন পরিস্থিতিতে কোন 'ছন্দ' লাগসই ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই জানানোটা যে চেহারা নিয়ে বাজারে হাজির হয়, তার চলতি নাম 'প্রেমপত্রের বই'। নিউজপ্রিন্টে ছাপা এসব বইয়ের প্রচ্ছদে হয় নামী কোনো নায়িকার ছবি থাকে, নয়তো থাকে একটা আঁকা ছবি: মুখে চিঠি নিয়ে উড়ে যাচ্ছে পাখি। পেছনের প্রচ্ছদে অবধারিতভাবে *বেহেশতের কুঞ্জী* বা এ জাতীয় কোনো বইয়ের বিজ্ঞাপন। টেক্সটের ফাঁকে ফাঁকেও মেকআপ গেটিস হিসেবে সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের অন্তরঙ্গ ছবি থাকতে দেখা যায়, কখনো এত প্রাসঙ্গিকভাবে থাকে যে, মনে হয় যেন অলংকরণ। কোনো কোনো বইয়ের শুরুতে একটা ভূমিকা দেওয়ার চেষ্টা থাকে, যেখানে প্রেম কী কিংবা কীভাবে প্রেম হয় জাতীয় প্রশ্নের দার্শনিক ও জটিল আধিবিদ্যক আলোচনা করেন বইপ্রণেতা। ভেতরে, কল্পিত পাত্রপাত্রীর প্রেমের নানান বাঁকবিকুলির মধ্যেও এসব প্রায়-অবোধ্য দার্শনিকতা থরে থরে বিছানো থাকে। একটি বইয়ের ভূমিকা থেকে খানিক উদ্ধৃত করি:

> 'মনে করেন আপনি একজন যুবক আর সে একজন যুবতী। রাস্তায়, পথে, বাড়িতে, গ্রামে প্রতিনিয়ত আপনার আর তার সাক্ষাৎ হচ্ছে। এমনভাবে দেখা সাক্ষাৎ হবার মাধ্যমে আস্তে আস্তে আপনাদের উভয়ের মাঝে দেখা দিলে প্রেম সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গমালা সৃষ্টি করলো। প্রেম সমুদ্র থেকে উত্তাল তরঙ্গমালা সৃষ্টি হতেই সেটাকে নয়ন যুগলের কাছে ছুড়ে ফেলে দেয়। যদিও নয়ন যুগল প্রথমে দর্শন করেছিলো কিন্তু তার কোনো ক্ষমতা নেই, সে শুধু দর্শন লাভ করে হৃদয়ের প্রেম কেন্দ্রের কাছে টোকা দিয়ে জানিয়ে দেয়। ব্যস! আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এরপর উভয়ে দিনের পর দিন ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে।'[২]

বই প্রকাশের আঁতুড়ঘর বাংলাবাজার থেকে ঢাকার ফুটপাতসহ নানান জায়গায় বিক্রি হয় এসব প্রেমের চিঠির বই। দোকান কর্মচারী, অটোরিকশার ড্রাইভার, ফুটপাতের অন্য হকার, রিকশাওয়ালা এবং অন্যান্য শ্রমিকশ্রেণীর মানুষ এসব বই কেনেন বলে জানালেন এক বিক্রেতা।[৩] এসব বই মানুষ শুধু যে প্রেমপত্র লেখার গাইড হিসেবে কেনে, তা তো নয়। বরং এদের গল্পমূল্য ও সাহিত্যমূল্যও নেহাত কম নয়। অবশ্য শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সাহিত্যরুচির বিচারে এসবের অধিকাংশই উৎকট

ও অশোভন মনে হওয়া সম্ভব। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরও আছে চিঠিসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত, বাংলা সাহিত্যে যেমন যাযাবর প্রণীত *দৃষ্টিপাত*, তেমনি বিশ্বসাহিত্যে দস্তয়েভস্কি প্রণীত *Poor Folk* (বাংলা অনুবাদে *অভাজন*), যেগুলো রচিত হয়েছিল স্রেফ চিঠির পরম্পরায়।[৪] ফুটপাতের প্রেমপত্রের বইয়ের চিঠিগুলো পড়লেও এর ভেতরকার সাহিত্যিক উদ্দেশ্য টের পাওয়া যায়। শুধু চিঠির ছাঁচ সরবরাহ করাই বইয়ের উদ্দেশ্য নয়, এর বাইরেও এসব বই নানান বার্তা বহন করে।

বটতলার পুঁথি, চকবাজারের চটি

এসব প্রেমপত্রের বই বাজারচলতি চটি বই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। চটি বই বা বটতলার বইয়ের ইতিহাস কিন্তু বাংলাভাষার ভদ্রলোকি বইয়ের প্রায় কাছাকাছি। ভারতবর্ষে পর্তুগিজরা প্রথম প্রেস বসায় ষোড়শ শতাব্দীতে, মূলত বাংলা ভাষায় বাইবেল ছাপানোর জন্য। এই মিশনারি উদ্যোগ বাদ দিলে, আঠারো শতকের আগ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় পুস্তকের বাণিজ্যিক মুদ্রণের খবর পাওয়া যায় না। চটি বইয়ের রমরমা হাল আরম্ভ হয় উনিশ শতকে। ১৮৫৭ সালে, অর্থাৎ সিপাহি বিপ্লবের বছরে বাংলা ভাষায় চটি বই বেরিয়েছিল ৩২২টি এবং রেভারেন্ড জেমস লঙের হিসাব অনুযায়ী শুধু কলকাতাতেই এসব বই ছাপা হয়েছিল ছয় লাখের মতো।[৫] বটতলার বইয়ের রমরমা ব্যবসার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ভারতচন্দ্র কিংবা বঙ্কিমের বই বের করা অভিজাত তত্ত্ববোধিনী প্রেসের জিব বেরিয়ে যাওয়ার দশা হয়েছিল সেই উনিশ শতকেই। শিক্ষামূলক গল্প, পুরাণকথা, আদিরস ও স্যাটায়ার—এগুলোই মোটা দাগে সেই আমলের চটি বইয়ের বিষয়বস্তু ছিল। ঢাকা কিংবা রাজশাহীও কলকাতা থেকে খুব বেশি পিছিয়ে ছিল না। কলকাতার বটতলায় প্রথম ছাপাখানা বসানো হয়েছিল ১৮২০ সালে আর ঢাকার চকবাজারের কেতাবপট্টিতে ছাপাখানা বসে ১৮৬০-এর দিকে এবং বটতলার অনুকরণে সুলভযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৩ সালে। সুকুমার সেনের মতে, ১৮৪০ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত ছিল বটতলার স্বর্ণযুগ। এর সূত্র ধরে মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম (১৯৯০) জানান যে বটতলার প্রকাশনার দ্বিতীয় পর্বটি বিকশিত হয়েছিল মুসলমানি পুঁথির ব্যাপকভিত্তিক মুদ্রণের মাধ্যমে। ফলে ১৮৬৫ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত সময়টা হলো বটতলার বইয়ের দ্বিতীয় পর্ব তথা মুসলমানি পুঁথি প্রকাশের স্বর্ণযুগ। ঢাকার চকবাজারের কেতাবপট্টি সেই যুগে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে।[৬]

এই যে বটতলার পুঁথি কিংবা চকবাজারের চটি, তাদের সাংস্কৃতিক রাজনীতির অভিমুখ নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। ব্রিটিশ-শাসিত বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে তপতী রয় এবং সুমন্ত ব্যানার্জির মতো লেখকেরা মনে করেন, বটতলার বই মূলত জনসমাজের রুচিকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি প্রকল্প, যার মাধ্যমে নিম্নবর্গকে নসিহত

(disciplining and marginalising) করার সুযোগ নিয়েছে সেকালের ঔপনিবেশিক বাঙালি ভদ্রলোকি সমাজ।[৭] পক্ষান্তরে, অনিন্দিতা ঘোষের মতে, বটতলার বই তার ক্রমবর্ধমান পাঠকগোষ্ঠীর কল্যাণে ওই নিয়ন্ত্রণকে প্রতিহত করেছে।[৮] এই মোটামুটি অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন (functionally literate) নতুন পাঠকগোষ্ঠীর সামাজিক পরিচয় হলো তাঁরা শহরের অল্প বেতনের কেরানি। অনিন্দিতা স্পষ্ট করে না বললেও বোঝা যায় তিনি মনে করছেন, পাঠকের রুচির শাসনেই বটতলার বইয়ের কনটেন্ট তৈরি হয়েছে। ফলে নিম্নবর্গের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের দ্যোতক হিসেবেই ঐতিহাসিকভাবে আবির্ভূত হয়েছে। মহাভারত কিংবা অন্নদামঙ্গলের মতো বইয়েরও বটতলা সংস্করণের ইলাস্ট্রেশনে আমরা দেখি হিন্দু দেবতা কার্তিকের মাথায় ইউরোপীয় হ্যাট কিংবা মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করছে কোনো ইউরোপীয় সাহেব। এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সিপাহি বিদ্রোহের কালে বের হওয়া বটতলার বইয়ে ইংরেজবিদ্বেষ প্রচার একটা মুখ্য বিষয় ছিল, সেটা সত্য ঘটনার বয়ান করেই হোক, পুরাণ কাহিনির নতুন তফসির হাজির করেই হোক কিংবা স্ক্যান্ডাল ছড়িয়েই হোক। বই তখনো এত ব্যক্তিগত পঠনের বিষয় হয়ে ওঠেনি, অন্তত নিম্নবর্গের কাছে। একজন গলা ছেড়ে পড়েছে তো দল বেঁধে অন্যরা শুনেছে। ফলে বটতলার বইয়ের পাঠক-শ্রোতার সংখ্যা কোনো অর্থেই কম ছিল না সে সময়।

দেখা যাচ্ছে, একদিকে সুমন্ত ও তপতী বলছেন, চটি নিম্নবর্গকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রকল্প, আবার অন্যদিকে অনিন্দিতা বলছেন চটি প্রতিরোধের দ্যোতক। বটতলার চটি আবির্ভাবের সময় ও রাজনীতিটুকু বিচার করলে সুমন্ত ও তপতীর দাবি যৌক্তিক, আবার এর ক্রমবিকাশের রাজনীতি বিবেচনা করলে অনিন্দিতার বক্তব্য মানতে হয়। ঐতিহাসিকভাবে যদি দেখি, চটি এসেছিল বইয়ের সস্তা বিকল্প হিসেবে, গজিয়ে ওঠা পাঠকগোষ্ঠীর সীমিত সামর্থ্যের কথা মাথায় রেখে। মনে রাখতে হবে, বাংলার মুদ্রণশালায় প্রথম উৎপাদিত পণ্যটির নাম বাংলা বাইবেল। বটতলার প্রেস থেকে প্রথম দিকে যেসব বই বাজারে এল, তা প্রেস নিয়ন্ত্রকদের রুচিমাফিকই। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাজারের ভূমিকা সংগত কারণেই নিয়ামক হয়ে উঠল। এভাবে বটতলার চটি মূলত শাসকরুচি ও জনরুচির লড়াইয়ের একটা দুর্দান্ত ক্ষেত্র হয়ে উঠল। এটাকে আমরা মোটা দাগে জনসংস্কৃতিরই একটি নিয়ামক বৈশিষ্ট্য গণ্য করতে পারি, স্টুয়ার্ট হলের অনুসরণে। সাংস্কৃতিক বিধাতাগোষ্ঠী কখনোই এই নিম্নবর্গের চটি বইয়ের বিষয়বস্তু উৎপাদন থেকে হাতের রাশ আলগা করে দেয়নি, আবার কখনোই এই বই এককাট্টাভাবে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের স্মারক হয়ে উঠতে পারেনি। লড়াই হয়েছে বিস্তর, টানাপোড়েন আছে অনেক।

আড়াই শ বছরে এই শিল্পমাধ্যমটি নানাভাবে বিবর্তিত হয়েছে, নানাবিধ

বিষয়ের ওপর বই বের হয়েছে এবং কলকাতায় বিচ্ছিন্ন কিছু আলোচনা চোখে পড়লেও ঢাকার চটি বইয়ের ইতিহাস নিয়ে খুব অল্পই লেখালেখি হয়েছে। একটি বিশেষ ধরনের চটি বই 'পথ-কবিতা' নিয়ে মুনতাসীর মামুন যা লিখেছেন তাতে জানা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকায় 'চারপেজি, আটপেজি বা ষোলোপেজি ডাবল ডিমাই আকারের নিউজপ্রিন্টে নিম্নমানের প্রেসে ছাপা' চটি বই বিক্রি হতো। তাঁর বিবেচনায় ওই শতকে রচিত বেশির ভাগ পথ-কবিতারই বিষয়বস্তু ছিল ১৮৯৭ সালের ঢাকার ভূমিকম্প এবং ১৮৮৮ সালের টর্নেডো। কিছু কিছু পথ-কবিতা রচিত হয়েছে 'অশ্লীল' বিষয় নিয়ে, কিছু কিছু হিন্দুদের উৎসব নিয়ে। মুনতাসীর মামুনের মতে, ওই সব পথ-কবিতা সমসাময়িক ঘটনার ও বিষয়ের 'বিশ্বস্ত দলিল' এবং যোগাযোগব্যবস্থার ক্রমোন্নতির কারণে এসব প্রকাশনা স্তিমিত হয়ে আসে।[৯] বোঝা যায়, মুনতাসীর মামুন এই প্রকাশনাগুলোর সংবাদমূল্যকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, ওই সব প্রকাশনায় কাব্যের বা সাহিত্যের যে অবয়বটি আছে, সেটি নেহাতই ইনস্ট্রুমেন্টাল। যার ফলে, যোগাযোগব্যবস্থার প্রসারে এই শিল্প মার খেয়ে গেছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু অন্য একটি লেখায় আমি দেখিয়েছি যে নেহাত সাংবাদিকতা করাই পথ-কবিতা বা চটি বইয়ের উদ্দেশ্য ছিল না। পথ-কবিতার যাঁরা পাঠক, তাঁরা একটা জানা ঘটনার ভেতর এসব চোরাগোপ্তা ভাষ্যকে সাংবাদিকতাসুলভ বিবরণের চেয়ে কম গুরুত্ব দেন বলে মনে হয় না। সে কারণেই চটি বই কেবল ঘটনার বিবরণই নয়, ভাষ্যও। ঘটনা এখানে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ভাষ্য তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। ফলে এটা সাংবাদিকতা নয়, স্রেফ সংবাদতৃষ্ণা মেটানোর জন্য এর আবির্ভাব হয়নি।[১০]

অস্বীকার করার উপায় নেই যে চটি বই এখন একটি মৃতপ্রায় সংস্কৃতি, এর কারণ বহুবিধ। প্রথমত, এটি মূলত ছিল শহরে কাজ করা অল্পশিক্ষিত নিম্নবর্গের বিনোদনমাধ্যম। বাংলাদেশের অশিক্ষিত গরিব ঢাকা শহরে এবং শহরনির্ভর বিনোদনের জগতে প্রবেশ করেছে মোটামুটিভাবে সত্তর দশকের শেষাশেষি। কিন্তু সেটা সংগীত তথা অডিও মাধ্যম মারফত।[১১] ফলে এই বিস্তীর্ণ জনগোষ্ঠীর বিনোদনের ভার মুদ্রণমাধ্যম কখনোই সেভাবে হাতে পায়নি। কিন্তু চটি বই শুধু যে মানুষকে টেক্সট দিয়েই বিনোদন দিয়েছে, তা নয়। অক্ষরজ্ঞানবিরল নিম্নবর্গীয় সমাজে চটি বইয়ের সংখ্যালঘু পাঠক আর সংখ্যাগুরু শ্রোতা মিলে এক দারুণ যৌথতার পুনরুৎপাদনও হয়ে আসছিল। ব্যক্তিবাদী হতে থাকা সমাজে এহেন সংঘবদ্ধ বিনোদনের প্রথা কত দিন টিকবে? মুক্তি দিল অডিও, নিরক্ষর থাকার অসুবিধা থেকে। ফলে গরিবের পক্ষেও এখন নিজের ঘরে বসে একা একা বিনোদন সম্ভব। এ জন্য যে আর্থিক বিনিয়োগটুকু করতে হয়, সেটিও চলে এসেছে তার নাগালে। এহেন ব্যবস্থায় চটি বইয়ের টিকে থাকার কথা নয়। তবু সে

পুরোপুরি মরেও যায়নি, যেমন করে অল্পশিক্ষিত কেরানিগোষ্ঠী শহরের বিস্তীর্ণ গরিবসমুদ্রে নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। এখনো গরিব 'শিক্ষিত' মানুষজন এসব বই কেনেন বলে জানালেন ফুটপাতের এক দোকানদার। বিক্রি কমে গেছে, আফসোস তাঁর। ফলে বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে চিরুনি, কানখোঁচানি, সুইসুতা, ব্লেড, ছোট আয়না, টুকিটাকি নানান স্টেশনারি বেচতে হয় তাঁকে। বইয়ের চেয়ে সিডি ক্যাসেট বেশি চলে, পড়ার ঝামেলা নেই, খালি প্লেয়ারে ঢুকিয়ে চাপ দিয়ে দিলেই কাজ শেষ। পোড়ার বস্তিতে, মাসে এক দিন মাছ কিনে খাবার মুরোদ হয় না অনেকের, কিন্তু ক্যাসেট বাজে ঘরে ঘরে!

বর্তমান নিবন্ধে আমরা এই মুমূর্ষু শিল্পমাধ্যমটিকে ধরে শহরকেন্দ্রিক অল্পশিক্ষিত মাঝারি গরিবের সাংস্কৃতিক অভিলাষকে শনাক্ত করার চেষ্টা করব। গোড়াতেই পরিষ্কার যে আমরা এই নিবন্ধে শহরবাসী গরিবের মধ্যে একটা বিভাজনরেখা টানছি। অন্যভাবে বলা যায়, এই বিভাজনটি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেওয়ার জন্যই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। একদিকে বস্তিবাসী অশিক্ষিত নগরগরিব যারা শহরে এসেছে অভাবের তাড়নায়, অন্যদিকে অল্পশিক্ষিত মেসবাসী গরিব যারা শহরে এসেছে শ্রেয়তর জীবনের আশায়। অন্যভাবে বললে, প্রথমোক্তদের গ্রাম 'ঠেলে' দিয়েছে, আর দ্বিতীয় দলটিকে শহর 'টেনে' এনেছে। এই দুই ধরনের গরিব শহরে থিতু হয়েছে দুভাবে। একদল জড়িয়েছে মূলত অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির চাকায়, অন্য দল নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির তলানিতে। যদিও উচ্চবর্গের চোখে এরা সবাই 'গরিব', কিন্তু নিজেদের মধ্যে একটা আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভাজন সম্পর্কে এরা সচেতন। অবশ্য তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা দিন দিন একই রকম হয়ে ওঠার ফলে সাংস্কৃতিক ভিন্নতারও দাবি কমে যাচ্ছে ক্রমেই। চটি বইয়ের উদ্দিষ্ট পাঠক মূলত সেই অল্পশিক্ষিত গরিব যাদের শহর 'টেনে' এনেছে। এই নিবন্ধে, প্রেমপত্রের টেক্সট থেকে আমরা বুঝতে চাইব কোন ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিসরে শহরবাসী এই মাঝারি গরিবের প্রেম উৎপাদিত হচ্ছে এবং তার সঙ্গে এই সাংস্কৃতিক শ্রেণীর আত্মপরিচয়ের রাজনীতি কীভাবে সম্পর্কিত হচ্ছে।

সোশ্যাল রিয়ালিজম, সোশ্যাল ফ্যান্টাসি

বাস্তবে যেমনই হোক, বইয়ের প্রেমপত্র একতরফা কোনো ব্যাপার নয়। অর্থাৎ এসব বইতে কোনো চিঠি জবাবে ও পাল্টাজবাবে গল্প কিংবা উপন্যাসের আকার নিতে চায়। প্রায়ই দেখা যায়, চারটা-পাঁচটা চিঠিতে ভেঙে ভেঙে একটা গল্পকে বিবৃত করা হচ্ছে। প্রেম বিকশিত হচ্ছে আমাদের চোখের সামনে, পত্রে, পত্রান্তরে। কিন্তু চিঠির বাইরে যে জগৎ, সে জগতে আমাদের পাত্রপাত্রীদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়,

মনোলোভা ঘটনাগুলো ঘটে। সেই জগতে দুজনার মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে আবার চিঠির মাধ্যমে জাবর কাটা কখনো কখনো পীড়াদায়ক লাগতে পারে, ফলে প্রেমের চিঠির এই সিরিজে নতুন নতুন চিঠিগ্রহীতার আবির্ভাব ঘটে। প্রায়ই দেখা যায়, বন্ধু কিংবা বান্ধবীর কাছে লেখা চিঠিগুলোর সুবাদে আমরা প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে ঘটে যাওয়া মুহূর্তগুলোর বিবরণ জেনে ফেলতে পারছি। এগুলো প্রেমের চিঠি না হলেও পুরো গল্পটি বোঝার জন্য অপরিহার্য। ফলে প্রেমপত্রের বইতে শুধু প্রেমিক-প্রেমিকার চিঠিই থাকছে না, নিজ নিজ বন্ধুমহলের কাছে আলাদাভাবে লেখা চিঠিগুলোও থাকছে। ফলে একদিকে প্রেমিক-প্রেমিকার চিঠি চালাচালির মাধ্যমে যেমন আবেগমথিত প্রেমের নমুনা হাজির থাকছে, অন্যদিকে বন্ধু-বান্ধবীদের কাছে লেখা চিঠিগুলোতে থাকছে এই প্রেম ও প্রেমের পাত্রপাত্রী নিয়ে নিরাবেগ বোঝাপড়া। শেষ পর্যন্ত পাঠকই বিশেষ সুবিধা পায়, পাত্র কিংবা পাত্রী থেকে প্রেম সম্পর্কে বেশি অবগত থাকার সুবিধা। বোঝা যায়, পাঠককে প্রেমপত্র লেখায় সহায়তা করাই বইয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, এর বাইরে গোপন নান্দনিক সাহিত্যিক উদ্দেশ্যও আছে লেখকের। এ কারণেই সে তার কাহিনির চৌহদ্দির মাঝে পাঠকের ক্ষমতায়ন ঘটায়।

এসব বইতে প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের কাছে প্রথম পরিচিত হতে পারে, কিংবা পূর্বপরিচিত ও আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধও হতে পারে। পূর্বপরিচিতির ক্ষেত্রে তারা হতে পারে একে অপরের নবপরিণীত স্বামী-স্ত্রী অথবা হতে পারে বেয়াই-বেয়াইন, তালাতো ভাইবোন, বন্ধুর ছোট বোন, বান্ধবীর বড় ভাই, প্রাক্তন সহপাঠী, শ্যালিকা-দুলাভাই, দেবর-ভাবি ইত্যাদি। এর বাইরেও প্রেমের বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে চিঠির আদান-প্রদান হচ্ছে প্রেমিক-প্রেমিকার নিজ নিজ বন্ধুদের কাছে, কখনো ভাইবোনদের মাঝে।

প্রেমিক-প্রেমিকা যখন পরস্পরের নিতান্ত অপরিচিত, তখন তাদের মধ্যে প্রথম দেখাটি হচ্ছে কোথায়? বেশির ভাগই হচ্ছে বিয়েবাড়িতে, পার্কে, না হয় কাজিনের বাড়ি বেড়াতে এসে, না হয় ট্রেনে, বাসে কিংবা লঞ্চে। শাহরিক প্রেক্ষাপটে পরবর্তী অভিসারগুলোর জন্য পার্ক রীতিমতো অপরিহার্য। আরেকটু ঘনিষ্ঠ অভিসারের জন্য সিনেমা হল। প্রেমের পাত্রপাত্রী কিন্তু সদা ভ্রাম্যমাণ। বলা যায়, ভ্রমণই যেন তাদের জীবিকা। ফলে চিঠিগুলোর অধিকাংশ জুড়েই থাকে ভ্রমণের বর্ণনা। পরস্পরের মধুময় স্মৃতিচারণার জন্যও ভ্রমণ এক মোক্ষম মুহূর্ত। এসব মুহূর্তে চিঠিগুলো (মধ্যবিত্তের) সাহিত্যের চেহারা নিতে শুরু করে। এমনি এক মুহূর্তে, রাতের ট্রেন ভ্রমণের বিশদ বিবরণ এক চিঠিতে, যেখানে তন্দ্রামগ্ন প্রেমিক ভাবছে তার প্রেমিকার কথা :

'সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙে যায়। ভাঙতেই তাকিয়ে দেখি কোথায় তুমি?

আশেপাশে যাত্রীসাধারণ বসে আবার কেউ ঘুমিয়ে। জ্যোৎস্না রাতে জানালা পথে তাকিয়ে দেখি শস্য শ্যামল মাতৃভূমির ওপর দিয়ে ট্রেন দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে।'[১২]

এ রকম প্রকৃতিবন্দনা সত্ত্বেও প্রেমিকের এই ভ্রাম্যমাণতা তার সামাজিক শ্রেণীপরিচয়েরও দ্যোতক। ভ্রমণের কোনো আয়েশি চিত্র পেশ করে না এই চিঠিগুলো, বিরল দু-একটা মুহূর্তের কথা বাদ দিলে। বরং যে ক্লেশকর পৌনঃপুনিকতার মধ্য দিয়ে শহরতলি কিংবা নিকটস্থ গ্রাম-মফস্বলের নিম্ন আয়ের মানুষ শহরের কর্মস্থলে যাওয়া-আসা করে, সেসবের চেহারাই ফুটে ওঠে। ঐতিহাসিকভাবেই গ্রাম ছেড়ে শহরে আসা অসুখী নিম্নবর্গ চটি বইয়ের প্রধান ক্রেতাগোষ্ঠী, সুমিত সরকার এ কথা বলেন।[১৩] কিন্তু গ্রাম ছেড়ে শহরে আসা এই নিম্নবর্গের মধ্যে যে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ফারাক রয়েছে, তার প্রদর্শন তিনি চটি বইয়ের ক্রেতাগোষ্ঠীর মধ্যে দেখেননি। আবার, যারা ডেইলি প্যাসেঞ্জার, শহরে কাজ শেষে ট্রেনে চেপে বাড়ি ফেরে প্রতিদিন, কম দামের চটি বই তাদেরও ভ্রমণের অপরিহার্য উপাদান, এ কথা বলেছেন অনিন্দিতা ঘোষ।[১৪] সম্ভবত এই ধারাবাহিকতা থেকেই ট্রেনে চটি বই বিক্রির ঐতিহ্য আজও বহাল আছে। সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে, এই শহরে আসা অসুখী নিম্নবর্গের মধ্যেও একটি সংখ্যালঘু অংশ চটি বইয়ের ক্রেতা। এটি বিশেষভাবে বোঝা দরকার, নইলে আমরা হরেদরে সব গরিবকেই চটি বইয়ের ভোক্তা ভাবতে শুরু করব। আদতে তা নয়। এই চটি বইয়ের ক্রেতাগোষ্ঠী তাদের পঠনক্ষমতা দিয়েই অপরাপর বস্তিবাসী গরিব থেকে নিজেদের সাংস্কৃতিকভাবে আলাদা করে। প্রেমপত্রের টেক্সটে আমরা দেখি, প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া প্রিয় বান্ধবীর চিঠির জবাবে বান্ধবী তাকে সাবধান করছে যাতে সে 'প্রেমিক চিনে' প্রেম করে, নইলে তাকে সারা জীবন কাঁদতে হবে। এই বক্তব্যের সমর্থনে আমাদের বান্ধবী একটি দৃষ্টান্ত হাজির করে, যেখানে প্রেমিক-প্রেমিকা পূর্বাপর বিবেচনা না করেই বিয়ে করার কারণে সেই সংসার ছারখার হয়ে যায়। ওই দৃষ্টান্তমূলক কাহিনির যে প্রেমিক, সে কিন্তু রিকশা মেকানিক, অর্থাৎ অপ্রাতিষ্ঠানিক ও 'অশিক্ষিত' গরিব গোত্রের। অন্যত্র একটি চিঠিতে দেখি প্রাকবিবাহ যৌনসম্পর্ক নিয়ে বান্ধবীকে সাবধান করছে অন্য বান্ধবী। এই 'গর্হিত' কাজের ফলে জীবন যে ছারখার হয়ে যায়, তার নমুনা হিসেবে যে কাহিনিটি সে তার বান্ধবীকে বয়ান করে, সেখানেও দেখা যায় ওই 'গর্হিত' কাজটি সম্পন্ন হয় বস্তিবাসী 'অশিক্ষিত' গরিবের জগতে।

যাদের জবানিতে প্রেমপত্রগুলো বইতে লেখা হচ্ছে, ব্যক্তিগত জীবনে তারা কে কী করে? এ বিষয়ে কোনো বইয়ের অবস্থান সত্যপ্রায় বা সোশ্যাল রিয়ালিস্টিক, কোনোটার হলো ইচ্ছাপূরণ বা সোশ্যাল-ফ্যান্টাসি। সোশ্যাল রিয়ালিস্ট কৌশল

থেকে আমরা জানতে পারি, আমাদের নায়ক কোনো জুট মিলে চাকরি করে, নয়তো ব্যাংকের নিম্নপদস্থ কেরানি, নয়তো প্রবাসী নিম্ন আয়ের শ্রমিক। আর আমাদের নায়িকা হয় কলেজে পড়ে, না হয় পোশাকশ্রমিক, নয় প্রবাসী নারীশ্রমিক, নয়তো গৃহবধূ। লক্ষণীয়, পাত্রপাত্রীর পেশাগুলো যথাসম্ভব নিম্নবর্গীয় হলেও সচেতনভাবেই শহরের বিস্তীর্ণ অপ্রাতিষ্ঠানিক পেশাবলয়ের বাইরে। অর্থাৎ আমাদের মূল নায়কদের কেউ রিকশা চালায় না বা এমনকি ফুটপাতে দোকানদারিও করে না। তারা মাঝারি গরিব। কিন্তু তারা যখনই নিজেদের মধ্যে খারাপ দৃষ্টান্ত হাজির করে, সেখানে আমরা অপ্রাতিষ্ঠানিক নগরগরিবের সন্ধান পাই। এই প্রবণতা থেকেও আমরা চটি বইয়ের উদ্দিষ্ট পাঠকের সাংস্কৃতিক শ্রেণীকে ঐতিহাসিকভাবে শনাক্ত করতে পারি। অনিন্দিতা ঘোষ জানান, ব্রিটিশ আমলে বটতলার বইয়ের প্রধান ক্রেতা ছিল শহরের অল্পশিক্ষিত 'পাতি ভদ্রলোক' শ্রেণী, যাদের পেশা মূলত কেরানিগিরি।[১৫] এরা অর্থনৈতিক বিচারে নিম্নবর্গ হলেও সাংস্কৃতিক বিচারে ভদ্রলোকি কৃষ্টির মার্জিনে অর্থাৎ চলতি ভাষায় 'গরিব হলেও ছোটলোক নয়'। কিন্তু গত এক শতকে সেই সাংস্কৃতিক বিভাজনের অনেক অদলবদল ঘটেছে। অর্থনৈতিক অবস্থানের নৈকট্য তথা ক্রয়ক্ষমতার সাদৃশ্যই হয়তো শহুরে কেরানি শ্রেণী আর অপ্রাতিষ্ঠানিক গরিবের সাংস্কৃতিক দূরত্ব অনেক কমিয়ে এনেছে। পক্ষান্তরে, একই কারণে শহুরে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের দূরত্ব বেড়েছে অনেক।

আত্মপরিচয়ের সোশ্যাল-ফ্যান্টাসিগুলোতে দেখা যায়, পাত্রের বাবা যদি হয় সাংসদ, পাত্রীর বাবা সেখানে মধ্যপদস্থ সরকারি আমলা। অথবা, পাত্রীর বাবা যেখানে পুলিশের এসপি, পাত্রের বাবা সেখানে হয়তো নামজাদা অ্যাডভোকেট। সেসব গল্পে আবার আমাদের প্রেমিক-প্রেমিকারা প্রত্যেকেই মা-বাবার একমাত্র সন্তান, সেই অর্থে সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। পাত্রীর বাবা সৎ পুলিশ হলেও গরিব নয়, কারণ সে উত্তরাধিকারসূত্রে অগাধ সম্পদের অধিকারী! আর এদিকে পাত্রের বাবা নামকরা উকিল। অর্থাৎ একটু আঠারো-বিশ থাকলেও গুরুতর কোনো সামাজিক মিসম্যাচ হচ্ছে না এই নবগঠিত প্রণয়সম্পর্কের মাধ্যমে। এহেন সম্পর্কের দিকে চোখ গরম করে তাকানোর দরকার নেই। কিন্তু তবু এদের চিঠিগুলো প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যকার গুরুতর অসাম্য থাকার যাতনাখানি বহন করে। অর্থাৎ পরিচয় বিনির্মাণে ফ্যান্টাসি থাকলেও অনুভব বিনির্মাণে লেখক বাস্তবের অনুগামীই থেকে যান। এভাবে, ধনীর গরিবি যাতনা এক অবিশ্বাস্য পরাবাস্তব অবস্থার উদ্বোধন ঘটায় চিঠিগুলোতে। আবার, এ রকম ঊর্ধ্বতন শ্রেণীপরিচয় ধারণ করেও আমাদের প্রেমিক-প্রেমিকাদের গরিবি খায়েশ যায় না। তারা যদিও গাড়ি ছাড়া চলাফেরা করে না, তবু সিনেমা হলে গিয়ে ছবি দেখে,

প্রেমিককে চিঠি লেখে, পার্কে গিয়ে বাদাম খায় ইত্যাদি। পুলিশকন্যা নায়িকার একটা চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিই :

'ছবি খুব বড় বেশী একটা দেখি না। যখন হঠাৎ মন চাইলো একাই চলে আসি। তবে সর্বদা গাড়ী নিয়ে আসি। আজ গাড়ী নিয়ে বাবা কাজে বের হয়ে গেছেন। মন চাইলো রিকশা নিয়ে চলে এলাম। কুমিল্লার প্রত্যেকটি সিনেমা হলের গেইট কিপার থেকে শুরু করে মালিকরা আমাকে চিনেন। আমি আসলে ওনারা পয়সা নিতে চান না। কিন্তু আমি কোনদিন পয়সা ছাড়া ছবি দেখি না। আমার বাবা পুলিশ সুপার হলেও বিনা পয়সায় ছবি দেখাকে ঘৃণা করি।'[১৬]

চিঠিগুলোতে দেখা যায়, আমাদের নায়িকা পুলিশ সুপারের মেয়ে হলেও প্রেমে অপুলিশের মেয়ের মতোই কাতর, শয়নে স্বপনে প্রেমিকের নাম জপে এবং তার বাবা পুলিশ সুপার হলেও কৃষকের মতো লিবারাল! আবার অন্যত্র, নায়কের সঙ্গে নায়িকার দেখা হচ্ছে 'চলন্ত কোস্টারে' এবং নায়িকার বাবা ঢাকার বিখ্যাত ব্যবসায়ী যার দু-দুটো বাড়ি আছে ঢাকা শহরে। তাদের প্রতিদিনকার দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে রমনা পার্কে। এসব বিবরণ প্রেমিক জানাচ্ছে তার বন্ধুকে অন্য চিঠিতে। প্রেমিকের সেই বন্ধুটি, যে কিনা বন্ধুর প্রেমকেই নিজের প্রেমের মতো ভেবে নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে আছে, সেও ফেরত-চিঠিতে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে 'ধনীর ছেলে ধনীর মেয়ে এই যাকে বলে বড়লোকের বিরাট কারবার'। এই বিরল বন্ধুবাৎসল্যের সুযোগে আমরা জেনে যাই সেই বন্ধুটির ইতিবৃত্ত :

'...মনে বড় আশা ছিল প্রেম করার কিন্তু কোনো মেয়েই ভালবাসতে চাইল না, কি বা আছে আমার ধন সম্পদ না রূপ, কোনটাই না, না আছে মুখের শ্রী, গায়ের রংটা শ্যামলা, হালকা স্বাস্থ্য। তুই যে কেমন করে আমায় ভালবাসলি, এটাই আমার সুভাগ্য।'[১৭]

এই বন্ধু-অন্তঃপ্রাণ বন্ধুটি সুপরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করছে তার প্রেমিক বন্ধুকে, বলছে প্রতিদিনই অভিসারে না গিয়ে 'ধীরে চলো নীতি'তে এগোতে। সে নিজে প্রেম করতে না পারলেও ঢাকা শহরে যেসব 'প্রেম প্রেম খেলা' হয়, সে বিষয়ে বন্ধুকে সতর্ক করে দেওয়ার দায়িত্ব বোধ করে। বড়লোকদের বিয়ে যে ক্ষণিকের জিনিস, এই গড়ে তো এই ভাঙে, এটাও সে একটি সত্য ঘটনা বয়ানের মাধ্যমে বন্ধুকে জানিয়ে দেয় চিঠিতে। কিন্তু এত কিছু বলার পরও আমাদের গরিব বন্ধুটি তার দায়িত্ব সম্পর্কে অসচেতন নয়। চিঠিতেই জানাচ্ছে, সে কয়েক দিনের মধ্যে আসছে এবং এসে এই প্রেমের পরিণতির ব্যাপারে পরিবারের সঙ্গে দেনদরবার করার মাধ্যমে বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করবে। এই পরোপকারী বন্ধুটিকে কি চেনা চেনা লাগে?

এই বন্ধুটিই আসলে এহেন চটি বইয়ের উদ্দিষ্ট শহুরে অল্পশিক্ষিত মাঝারি

গরিব, যুগপৎ এই পুস্তকের লেখক ও পাঠক, বড়লোকি ফ্যান্টাসির স্বখাতসলিলে পুরোপুরি আরাম না-পেয়ে 'বন্ধু' পরিচয় নিয়ে কাহিনিতে পুনঃপ্রবিষ্ট হয়েছে। সেটা এই কাহিনি ও ফ্যান্টাসিকে নিয়ন্ত্রণ করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই। ফলে অন্য একটি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের মধ্যে বসেও আমরা এই যুবকের জীবন ও চিন্তাভাবনা সম্পর্কে অবগত হতে বাধ্য হই। প্রেমের আকাঙ্ক্ষা ছিল তার, কিন্তু দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্য তাকে করেছে দার্শনিক ও পরোপকারী। সে হাজির হয়েছে এই প্রেমের উপাখ্যানে ধনীর বিবেকের অপরিহার্য ভূমিকায়। ফলে পাঠকের দ্বিবিধ আনন্দ হলো: একবার তার পুলক বাড়ল ধনীর পোশাক পরে এই প্রেমের আখ্যানে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় নিজেকে ভাবার মাধ্যমে; পাশাপাশি, পরোপকারী বন্ধুকে সহায়তা করার মাধ্যমে সে তার শ্রেণীপরিচয়কে এই কাহিনিতে একটা প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকা দিতে পারল, এটাও কম আনন্দের কথা নয়।

যৌন-নৈতিকতার ব্যবস্থাপনা

চটি বই ঐতিহ্যগতভাবেই শৃঙ্গার রসে উৎসাহী। ফলে প্রেমের কাহিনিতে তার ঢেউ লাগবে, এটা প্রত্যাশিত। চিঠিগুলোতে আমরা প্রেমিক-প্রেমিকার অভিসারের যে বর্ণনা পাই, তার একটি প্রধান অংশ এই শারীরিক সংস্পর্শের বর্ণনা। কিন্তু এই শরীরী আকর্ষণ বাঁধা থাকে কঠিন নৈতিক অনুশাসনে। আবার, নৈতিক আকর্ষণ যত কঠিনই হোক, সে পাত্রপাত্রীর মধ্যে যৌনতার প্রাথমিক উদ্বোধন ঠেকাতে অসমর্থ। 'বিবেক' জাগ্রত হয় কেবল গভীরতর যৌনতার পর্দা উন্মোচিত হওয়ার প্রাক্কালে।

প্রেমপত্রের পাত্রপাত্রীদের এই যে যৌনসংযম, তাকে মিশেল ফুকো নির্দেশিত বুর্জোয়া সমাজের যৌনতাবিষয়ক বাকসংযমের উপজাত হিসেবে ভাবার ন্যায্য কারণ আছে। *হিস্ট্রি অব সেক্সুয়ালিটি* গ্রন্থের প্রথম পর্বে ফুকো দেখিয়েছেন যে পাশ্চাত্যবাসীর বদ্ধমূল ধারণা হচ্ছে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর দুই-তৃতীয়াংশ অব্দি সমাজে ও জীবনে যৌনতা জিনিসটাকে বেশ দমিয়ে রাখা হয়েছিল। যদিও ফুকো বলছেন, আদতে সে রকম ছিল না। তার পরও যৌনতা নিয়ে পশ্চিমারা এমন ধারার একটি দমনমূলক প্রকল্প (রিপ্রেসিভ হাইপোথিসিস) দাঁড় করাচ্ছে কেন? উত্তর সোজা, বর্তমানের যে (খোলামেলা) যৌনসংস্কৃতি, তাকে প্রতিরোধী সংস্কৃতি আকারে উপভোগ করার জন্য। ফুকোর ভাষায়, সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত যৌনতার আলোচনা ছিল খোলামেলা, কোনো রাখঢাকের বালাই ছিল না। কিন্তু ভিক্টোরীয় বুর্জোয়ার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকাশ্য আলাপের সংস্কৃতির মধ্যে নানা রকম প্রতীক-সংকেতের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং সেটি শোবার ঘরের ফিসফাস হয়ে দাঁড়ায়। আলাপ আর বাস্তবিক চর্চার এই ফারাককে ফুকো ভিক্টোরীয় মতাদর্শে দীক্ষিত বুর্জোয়ার হিপোক্রেসি হিসেবেই শনাক্ত করেছেন।[১৮]

লক্ষণীয়, যেসব চিঠি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লিখিত, অর্থাৎ যাদের মধ্যে বৈধ যৌনসম্পর্ক আছে, তাদের যৌনতার বিবরণ চিঠিগুলো বহন করে না। বরং যাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হয়নি, কিংবা যাদের মধ্যে যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে শিথিল টাবু রয়েছে (যথা দুলাভাই-শ্যালিকা, দেবর-ভাবি ইত্যাদি) তাদের যৌনসম্পর্কের বিবরণই থাকে চিঠিগুলোতে। সম্পর্ক না বলে উসকানি বলাই শ্রেয়, কারণ এহেন যৌনক্রিয়ায় এদের কেউই ঝাঁপিয়ে পড়ে না, বরং বিবাহবহির্ভূত দৈহিক সম্পর্ককে 'খারাপ' মনে করে। একটি যৌথতার মাঝামাঝি এহেন নৈতিকতার উদ্বোধন বরং এর পাঠককে উদ্দীপ্ত করার কাজেই ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্ত দিই :

> নারী পুরুষ ফেস টু ফেস আলিঙ্গনে যে কত সুখ তা জীবনে কোনো দিন অনুভব করতে পারিনি, তুমি সেই আশা পূর্ণ করে দিলে আমায় নিজেকে বিলিয়ে, আর আমি দুহাত বাড়িয়ে তোমার নরম তুলতুলে দেহখানি যৌবন ভরা বুকে, কুসুম কলিতে চলে যাই, তুমি প্রথমে বাধা দিলেও পরে শুধু চোখ বুজে আনন্দ উপভোগ করছিলে।... ঠিক সেই সময় ফেরিওয়ালা ছেলেটা যদি না আসত তাহলে যে কি হতো ভাবতেই পারিনি।[১৯]

এখানে অবশ্য ভিক্টোরীয় নৈতিকতা নয়, পার্কে ভ্রাম্যমাণ ফেরিওয়ালা অনুপ্রবেশ করেছে। এমন নয় যে ফেরিওয়ালা না এলেই তাদের আশঙ্কা সত্য হয়ে যেত! কারণ, অন্য আরেকটি পার্কেই আমরা দেখি :

> আমি তোমাকে আমার দুহাত দিয়ে তোমার নরম তুলতুলে দেহখানি একান্তভাবে কাছে টেনে নিলাম, আর সেই মুহূর্তে যদি তুমি আমার মাঝে জেগে ওঠা উত্তেজনাকে তোমার মধুর কটি সংলাপ দিয়ে দমিয়ে না দিতে হয়তো একটা অঘটন ঘটে যেত আমাদের মাঝে। পবিত্র প্রেম কলঙ্কিত হয়ে পড়ত।... যৌন উত্তেজনা যে মানুষকে অমানুষে পরিণত করতে পারে, সেদিনই সেটা প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম।[২০]

অন্যত্র—

> যখন তুমি চরম উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়ে তোমার অবাধ্য হাতটি নিচের দিকে নিয়ে গেলে, তখন আমার চেতনা ফিরে এল।[২১]

অন্যত্র, নায়ক স্বীকার করছে—

> প্রেম ভালোবাসাতে দেহের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। যারা প্রেম ভালোবাসাকে দেহের সম্পর্ক বলে মনে করে তারা সত্যি সত্যি প্রেমিকের অযোগ্য।[২২]

প্রায় সব চিঠিতেই দেখা যাচ্ছে, পরস্পরের প্রতি শরীরী আকর্ষণই এদের প্রেমের উপজীব্য। কিন্তু প্রাক-বৈবাহিক অবস্থায় পূর্ণ শরীরী যোগাযোগ রীতিমতো বিষবৎ পরিত্যাজ্য। এহেন আধাসিদ্ধ যৌনতা নিশ্চিতভাবেই ফুকো-নির্দেশিত

শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অর্জিত ভিক্টোরীয় মূল্যবোধের নকলি রূপ, সম্ভবত সিনেমা-বাহিত হয়ে নিম্নবর্গের এই অংশের মধ্যে প্রবেশ করেছে। শরীর আধা 'রক্ষা' করেও কীভাবে উদ্দাম প্রেম করা যায়, সেটা সত্তর দশক থেকে বাংলা সিনেমা জোরেশোরেই দেখিয়ে আসছে। ফলে সিনেমার সঙ্গে এসব চিঠির আদর্শিক যোগাযোগের অনুমান জোরালো হয়। যৌনতা ছাড়াও এসব চিঠির নানান জায়গায় সিনেম্যাটিক মেলোড্রামার সন্ধান মেলে। যেমন প্রতারিত প্রেমিকা তার প্রাক্তন প্রেমিকের বাসরঘরের দিকে ধাবমান :

> গরু জবাইর ছুরিখানা নিয়ে উল্কা বেগে ছুটে চলেছি। যখন তোমাদের বাড়ী ঢুকলাম, তখন তোমার মত জালিম কুকুরটা আক্রমণ করল। চলার পথে বাধা পড়ল, তাই প্রথমে কুকুরটা খুন করে তোমার ঘরের নিকট যাই। দরজা বন্ধ, অনেক কষ্ট করে জানালা খুলতে চাঁদের আলোতে দেখতে পেলাম তোমরা দুজন পাশাপাশি শুয়ে আছ। তোমার নববধূর পানে চেয়ে পারলাম না তোমাকে খুন করতে। কেননা আমি যে নারী, নারী হয়ে অপর নারীকে বাসরঘরে বিধবা করতে পারলাম না, তাই ফিরে এলাম।[২৩]

আবার, ব্যর্থ প্রেমিক বা বিরহী প্রেমিকা যখন ভাবপ্রকাশের জন্য গান খোঁজে, তা অবধারিতভাবেই বাংলা সিনেমার গান। কোনো কোনো বইতে শেষ পৃষ্ঠাগুলো ভরিয়ে দেওয়া হয় বাংলা সিনেমার গান দিয়ে। নায়ক-নায়িকার ফটোগ্রাফের কথা তো আগেই বলেছি।

যেসব আত্মীয়ের মধ্যে যৌনসম্পর্কের শিথিল ট্যাবু আছে, সেসবের ফিরিস্তি পাওয়া যায় প্রেমপত্রের বইতে। এ ক্ষেত্রে দেবর-ভাবি এবং দুলাভাই-শ্যালিকা প্রেমপত্রের বইতে দুটি জনপ্রিয় নমুনা। কিন্তু তাকেও বৈধতা দেওয়ার যাবতীয় আয়োজন রয়েছে কাহিনিগুলোতে। দেবর-ভাবির প্রেমপত্রে দেখা যায়, বড় ভাই অর্থাৎ ভাবির স্বামী গত হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে, ফলে যৌবনবতী ভাবি একা। আর এদিকে বিবাহযোগ্য দেবর, ভাবি যখনই তাকে বিয়ের কথা বলে, দেবর তখনই গোঁজ হয়ে জবাব দেয় যে এমন মেয়ে দেখে দিতে হবে যে কি না ভাবির মতো! আবার ভাবিও কোনো এককালে কথায় কথায় বলেছিল যে দুই ভাইয়ের শরীরের গঠন একই রকমের। যা ই হোক, দেবর-ভাবির পারস্পরিক এই ভালো লাগাগুলো প্রাণ ফিরে পাওয়ার জন্য বড় ভাইকে মৃত্যুবরণ করতে হলো। শুধু মরেই যে সে তার দায়িত্ব পালন করল তা নয়, জীবিত অবস্থায় এমন কিছু বলে রেখে গেল যার ফলে এই দেবর-ভাবির সম্পর্ক শক্ত নৈতিক ভিত্তি পেয়ে যায়! ভাবির চিঠিতে :

> তোমার ভাই মৃত্যুর পরই আমি তোমাকে আমার স্বামী বলে গ্রহণ করে নিয়েছি। কারণ তোমার ভাই মৃত্যুর পূর্বে যখন বলেছিল, সে না থাকলে তোমাকে আপন করে নিতে, মৃত ব্যক্তির আদেশ অমান্য করতে পারি না।...

এত দিন ছিলাম বড় ভাইয়ের দাসী, এখন হবো ছোট ভাইয়ের দাসী।[২৪]

প্রেমিকার দাসীভাব আরও প্রকট হয়ে ওঠে, যখন আমরা দেখি সে তার দেবরের 'সংযমে'র প্রশংসা করছে, কারণ তার দেবর রাতের অন্ধকারে ভাবির ঘরে ঢুকে শুধু তার শরীরের সংবেদনশীল অংশগুলোতে হাত বুলিয়েই চলে গেছে। ভাবি নিশ্চিত যে 'কোনো পুরুষ এমতাবস্থায় তার প্রিয়তমা নারীকে অক্ষত রেখে ঘর থেকে চলে যেতে পারে না।' দেবর যে সেটা পারল, এটা তার শক্ত নৈতিকতারই স্মারক!

ভাইয়ের মৃত্যুর পর আমাদের এই দেবর-ভাবি লোকের কানাঘুষা সত্ত্বেও এক ছাদের নিচে বসবাস করে। তাদের চিঠি থেকে এটাও বোঝা যায় যে, বাড়িতে আর অন্য কেউ থাকে না। একই বাড়িতে বসবাসকারী দুজন নিকটাত্মীয় যখন চিঠি চালাচালি করছে মনের ভাব জানানোর জন্য, তখন আমরা এসব চিঠির সাহিত্যিক ও গাল্পিক উদ্দেশ্য টের পাই। চিঠি এখানে শুধু চিঠি নয়, অর্থাৎ পাঠককে চিঠি লেখা শেখানোই তার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, বরং সে চিঠির অছিলায় একটি গল্প বলতে চায়। চিঠি এখানে গল্পের ফর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

এক ছাদের নিচে থেকে দেবর-ভাবি যেমন সম্পর্কে জড়াচ্ছে, অন্যদিকে দূর বিদেশে অবস্থান করেও দুলাভাইয়ের নজর সরছে না সোমত্ত শ্যালিকার শরীর থেকে। বোন গর্ভবতী, সেটা যে দুলাভাইয়ের 'কীর্তি', সে রকম উসকানিমূলক ইঙ্গিত শ্যালিকার চিঠিতে ছিল। ফলে দুলাভাইকে আর পায় কে? 'আপা'কে তিনি যা যা করেছেন তার ফিরিস্তি শুনিয়েছেন স্ত্রীর স্কুলছাত্রী ছোট বোনকে। তা ছাড়া তিনি জানেন 'শ্যালিকার কাছে পত্র লেখা বা তাকে আরও নিজের করে পাওয়া অশোভন কিছু নয়।'[২৫] পরের চিঠিতেই আমরা দেখি দুলাভাইয়ের সংযমের বাঁধ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। তিনি স্মৃতিচারণা করছেন,

> সেদিন যখন তোমাকে আমার কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে একটি কথা বলতে গিয়ে তোমার গালে একটি চুম্বন এঁকে দিয়েছিলাম। সে সময় সত্যি আমি মনে করেছিলাম স্বর্গসুখ। তোমার আপাকে বারবার চুম্বন দিয়েও সে সুখ শান্তি আমি পাইনি।[২৬]

দুলাভাইদের এসব চিঠির জবাবে শ্যালিকারা কী কী লিখবে, তা সম্ভবত আমাদের চিঠিপ্রণেতাগণ নিজেরাও কূলকিনারা করতে পারেননি। ফলে দুলাভাইয়ের উসকানিকাতর চিঠিগুলোর কোনো প্রত্যুত্তর বইগুলোতে ছাপা হয়নি। তবে এহেন শিথিল-ট্যাবু সম্পর্কের প্রথম উসকানি যে শ্যালিকা তথা নারীর কাছ থেকেই আসে, এ বিষয়ে চিঠিপ্রণেতাদের মধ্যে দ্বিমত নেই। এটা নিশ্চয়ই পুরুষ চিঠিলেখকের ইচ্ছাপূরণের গল্প। কিন্তু এটা আবার সেই সমাজেরও গল্প, যেখানে নারী ধর্ষিতা হলেও তার পেছনে খোদ ভিকটিমেরই 'উসকানি' আছে, এমনটা সন্দেহ করা হয়।

আত্মপরিচয়ের নতুন মেরুকরণ?

অনিন্দিতা যেমন বলেছেন, ফুটপাতের প্রেমপত্রের বই মূলত শহরে কাজ করতে আসা অল্পশিক্ষিত 'পাতি ভদ্রলোক'-এর বিনোদনমাধ্যম হিসেবে ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে গণ-অভিবাসনে শহরে আসা 'অশিক্ষিত' গরিব কিন্তু প্রায় কাছাকাছি রকমের আর্থিক সক্ষমতা (এমনকি কখনো এদের চেয়েও বেশি) অর্জন করেছে। অর্থাৎ হাল আমলে নিম্নপদস্থ কেরানি আর বাসচালকের বা ফেরিওয়ালার উপার্জনের মধ্যে ফারাক বিশেষ নেই। কিন্তু এই দুই নিম্নবর্গের সাংস্কৃতিক সত্তার উসকানি আসছে ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে। মাঝারি গরিবের অল্পশিক্ষা তাকে সাংস্কৃতিকভাবে মধ্যবিত্তের কৃপানির্ভর করে তুলেছে, ফলে সে সব সময় মধ্যবিত্তের লালন করা মূল্যবোধগুলোকে শ্রেয়তর ভেবে এসেছে। প্রেমপত্রের বইগুলো পাঠ করে আমরা টের পেয়েছি এই মাঝারি গরিব কীভাবে মধ্যবিত্তের সাহিত্য ও যৌনভাবনার অনুরাগী গ্রাহক হয়ে উঠেছে।

সাংস্কৃতিক ফর্মগুলোর নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদানের যে রীতি, সেই বিচারে আমরা এও দেখেছি যে এসব চিঠিতে বর্ণিত প্রেমলীলা বিকশিত হয়েছে সত্তর দশকের ঢাকাই সিনেমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। মূল্যবোধ ভারাক্রান্ত মাঝারি গরিবের জীবন সেসব সিনেমারও যেমন প্রধান উপজীব্য, এসব চিঠিতেও তা-ই। তাদের নিজস্ব কোনো ফোক-ফ্যান্টাসি নেই, কিচ্ছাকাহিনির গ্রামীণ জীবন তারা এমনকি মধ্যবিত্তের চেয়েও নির্মমভাবে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। ফলে এদের চিঠিপত্রে কোথাও বৃহত্তর গ্রামীণ জীবনের কোনো অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায় না, এমনকি নায়ক যখন নায়িকার গ্রামের বাড়িতে অভিসার করছে তখনো। শহরের নিম্নবর্গ হিসেবে জীবন শুরু করার প্রাক্কালে এরা মধ্যবিত্তের জীবনকেই নাগালযোগ্য আরাধনা ভেবে নিয়েছে, আর উচ্চবর্গের রঙিন জীবন হয়ে উঠেছে তাদের নিরানন্দ জীবনের ফ্যান্টাসি।

নিরুপায় গরিব মানুষের শহরমুখী যে স্রোত, এর থেকে আমাদের এই পত্রলেখক মাঝারি গরিব এভাবেই আলাদা হয়ে থাকতে চেয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে না হলেও সাংস্কৃতিকভাবে। কিন্তু সত্তর থেকে নব্বই দশকের শহরায়ণের ফলে শহরের অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি ফুলেফেঁপে উঠেছে, অশিক্ষিত গরিবের জয়জয়কার হয়েছে শহরে, মেসকে ছাড়িয়ে গিয়েছে বস্তি, ক্রমে ক্রমে এই বিপুল ভাসমান জনগোষ্ঠী তাদের বিনোদন খুঁজতে শুরু করে। নিম্ন মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ-শাসিত বাংলা সিনেমা দিয়ে এই জনগোষ্ঠীর বিনোদনচাহিদা যে মিটবে না, তা বলাই বাহুল্য। সিনেমার উৎপাদক আর ভোক্তার সাংস্কৃতিক দূরত্ব ঘোচানোর জন্য বাংলা সিনেমা নানা রকম চেষ্টাই করেছে, ফোক-ফ্যান্টাসি থেকে রগরগে যৌনতা পর্যন্ত, অশিক্ষিত গরিব কখনো কখনো সেসবের দু-একটা চেখে দেখেছে, তবু

মুমূর্ষুদশা থেকে সিনেমাশিল্প উঠে আসতে পারেনি। ইত্যবসরে, নিম্নবর্গের বিনোদনের জায়গাটি দখল করে নিয়েছে বিশেষ ধরনের আরবান ফোক গান। অন্যত্র আমি দেখিয়েছি যে এই গানের মাধ্যমে শহরমুখী নিরক্ষর গরিব তাদের পূর্বাপর জীবনধারাগুলোকে যুক্ত করতে পেরেছে, ফলে গান তাদের জীবনে অর্থময় হয়ে উঠেছে।

এই বিশাল ভোক্তাগোষ্ঠী মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে একদিকে যেমন সিনেমাশিল্প ও চটি বই দুই-ই বিপন্ন হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে এই বিপন্ন বিনোদনমাধ্যমগুলোর ভোক্তা হিসেবে মাঝারি গরিবও কম বিপন্ন হয়নি। চটি বই বা সিনেমাশিল্প বিপন্ন হওয়ায় মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত টেলিভিশনের খোঁড়লে ঢুকে পড়েছে, আর বস্তিবাসী গরিবের জন্য গান হয়ে উঠেছে আশ্রয়ের জায়গা। মাঝখানে পড়ে থাকা এই গোষ্ঠীর বড় একটি অংশ ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে এসব আরবান ফোক গানের শ্রোতা।[২৭] এভাবে, বিনোদনমাধ্যম-কেন্দ্রিক এই মেরুকরণ তাদের আত্মপরিচয়ের রাজনীতিতেও নির্ণায়ক ভূমিকা রাখছে। প্রেমপত্রের আখ্যানগুলো থেকেই আমরা বুঝতে পারি, সংখ্যালঘু একটি শ্রেণী কীভাবে শহুরে অপ্রাতিষ্ঠানিক গরিবের সঙ্গে দূরত্ব এবং মধ্যবিত্তের সঙ্গে নৈকট্য বোধ করে আসছিল। কিন্তু, অশিক্ষিত গরিব ও অল্পশিক্ষিত মাঝারি গরিবের মধ্যকার আর্থসামাজিক বিভেদ যতই কমে এসেছে, বিনোদনমাধ্যম হিসেবে চটি বই ততই বিরল হয়ে গিয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. অন্ত্যমিল দেওয়া দুই লাইন থেকে চার লাইনের কবিতা, যা একটি পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে, এরই চলতি নাম 'ছন্দ'।

২. প্রকাশ চৌধুরী, *বৃহৎ প্রেমের চিঠি*, (ঢাকা : সালমা বুক ডিপো, ১৯৯২)।

৩. ব্যক্তিগত কথোপকথন, ২০০৯।

৪. যাযাবর (বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়), *দৃষ্টিপাত*, (কলকাতা : প্রকাশালয় অজ্ঞাত, ১৩৫৩ বাংলা); F. Dostoyevsky, 2011 (First published in Russian in 1846). *Poor Folk.* Traslated by C. J. Hogarth. http://ebooks.adelaide.edu.au/d/dostoyevsky/d72po/

৫. Anindita Ghosh, "Cheap Books, 'Bad' Books: Contesting Print-Cultures in Colonial Bengal," *South Asia Research* 18 (1998): 173-94.

৬. মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, *চকবাজারের কেতাবপট্টি* (ঢাকা : ঢাকা নগর জাদুঘর, ১৯৯০)।

৭. Tapati Roy, "Disciplining the Printed Text: Colonial and Nationalist Surveillance of Bengali Literature," in *Texts of Power: Emerging*

Disciplines in Colonial Bengal, ed. Partha Chatterjee, (Calcutta: Centre for Studies in Social Sciences, 1996); Sumanta Banerjee, *The Parlour and the Streets: Elite and Popular Culture in Nineteenth Century Calcutta.* (Calcutta: Seagull, 1989).

৮. Ghosh, "Cheap Books, 'Bad' Books," 1998.

৯. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকার হারিয়ে যাওয়া বইয়ের খোঁজে,* (ঢাকা : অনন্যা, ২০০৬)।

১০. সুমন রহমান, "মুমূর্ষু চটি বই আর তার বিপন্ন নারীরা," *নারী ও প্রগতি,* রোকেয়া কবীর সম্পাদিত, সপ্তম সংখ্যা : জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৮।

১১. সুমন রহমান, *কানার হাটবাজার,* (ঢাকা : দুয়েন্দে, ২০১১)।

১২. চৌধুরী, ১৯৯২। *প্রাগুক্ত।*

১৩. Sumit Sarker, "Kaliyug", "Chakri" and "Bhakti": Ramkrishna and his Times," *Economic and Political Weekly* 27 (1992): p. 1549.

১৪. Ghosh, 1998. *Ibid.*

১৫. Ghosh, 1998. *Ibid.*

১৬. এম ডি কামরুল হাসান, *মডার্ন লাভ লেটার,* (ঢাকা : সালমা বুক ডিপো, ১৯৯৩)।

১৭. কবি সিদ্দিক, *মেয়েদের গোপন প্রেমপত্র,* (ঢাকা : সালমা বুক ডিপো, ১৯৯৪)।

১৮. Michel Foucault, *The History of Sexuality Part One,* 1978, pp. 4-5.

১৯. সিদ্দিক, ১৯৯৪। *প্রাগুক্ত।*

২০. হাসান, ১৯৯৩। *প্রাগুক্ত।*

২১. হাসান, ১৯৯৩। *প্রাগুক্ত।*

২২. চৌধুরী, ১৯৯২। *প্রাগুক্ত।*

২৩. সিদ্দিক, ১৯৯৪। *প্রাগুক্ত।*

২৪. হাসান, ১৯৯৩। *প্রাগুক্ত।*

২৫. চৌধুরী, ১৯৯২। *প্রাগুক্ত।*

২৬. চৌধুরী, ১৯৯২। *প্রাগুক্ত।*

২৭. রহমান, ২০১১। *প্রাগুক্ত।*

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

কাইয়ুম, মোহাম্মদ আবদুল। *চকবাজারের কেতাবপট্টি।* ঢাকা : ঢাকা নগর জাদুঘর, ১৯৯০।

চৌধুরী, প্রকাশ। *বৃহৎ প্রেমের চিঠি।* ১১২ পৃষ্ঠা। ঢাকা : সালমা বুক ডিপো, ১৯৯২।

মামুন, মুনতাসীর। *ঢাকার হারিয়ে যাওয়া বইয়ের খোঁজে।* ঢাকা : অনন্যা, ২০০৬।

যাযাবর (বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়)। *দৃষ্টিপাত।* কলকাতা : প্রকাশালয় অজ্ঞাত, ১৩৫৩ বাঙলা।

রহমান, সুমন। *কানার হাটবাজার।* ঢাকা : দুয়েন্দে, ২০১১।

রহমান, সুমন। "মুমূর্ষু চটি বই আর তার বিপন্ন নারীরা।" *নারী ও প্রগতি,* রোকেয়া কবীর সম্পাঃ, সপ্তম সংখ্যা : জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৮।

সিদ্দিক, কবি। *মেয়েদের গোপন প্রেমপত্র।* ঢাকা : সালমা বুক ডিপো, ১৯৯৪ (তৃতীয় সংস্করণ)।

হাসান, এমডি কামরুল। *মডার্ন লাভ লেটার।* ঢাকা : সালমা বুক ডিপো, ১৯৯৩।

Banerjee, Sumanta. *The Parlour and the Streets: Elite and Popular Culture in Nineteenth Century Calcutta.* Calcutta: Seagull, 1989.

Dostoyevsky, F. *Poor Folk.* Traslated by C. J. Hogarth. 2011 (First published in Russian in 1846). http://ebooks.adelaide.edu.au /d/dostoyevsky/d72po/

Ghosh, Anindita. Cheap Books, 'Bad' Books: Contesting Print-Cultures in Colonial Bengal. *South Asia Research* 18 (1998): 173-94.

Foucault, Michel. *The History of Sexuality Volume 1: An Introduction,* Trans. Robert Hurley. New York: Pantheon Books, 1978.

Roy, Tapati. Disciplining the Printed Text: Colonial and Nationalist Surveillance of Bengali Literature. *Texts of Power: Emerging Disciplines in Colonial Bengal,* ed. Partha Chatterjee. Calcutta: Centre for Studies in Social Sciences, 1996.

Sarker, Sumit. 'Kaliyug', 'Chakri' and 'Bhakti': Ramkrishna and his Times, *Economic and Political Weekly* 27 (1992): 1549.

আবু জাফর শামসুদ্দীনের সাক্ষাৎকার

আমার সাংবাদিকতা জীবন, দেশভাগ ও তৎকালীন সমাজ

[আবু জাফর শামসুদ্দীনের জন্ম ১৯১১ সালে গাজীপুর জেলার দক্ষিণবাগ গ্রামে। ১৯২৪ সালে স্থানীয় একডালা মাদ্রাসা থেকে জুনিয়র মাদ্রাসা পরীক্ষায় ও ১৯২৯ সালে ঢাকা সরকারি মাদ্রাসা থেকে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুদিন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পড়াশোনার পর কলকাতায় গিয়ে সাংবাদিকতা শুরু করেন।

১৯৩১ সালে সরকারের সেচ বিভাগে কেরানির চাকরিতে যোগ দেন। ১৯৪২ সালে এ চাকরি ছেড়ে নির্মীয়মাণ কটক বিমানবন্দরের তদারকি অফিসে হেড ক্লার্ক হিসেবে যোগ দেন। কিছুদিন পর এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে *দৈনিক আজাদ*-এর সাব-এডিটর হিসেবে যোগ দেন।

১৯৪৮ সালে পত্রিকাটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে তিনি এর সহকারী সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৫০ সালে *দৈনিক আজাদ* থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলে তিনি কিতাবিস্তান নামে পুস্তক ব্যবসা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫০-১৯৫১ সালে *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনে সম্পাদক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জন্মলগ্ন সময় থেকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন।

১৯৬১ সালে বাংলা একাডেমীর অনুবাদ বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন। অবসর গ্রহণের পর *দৈনিক পূর্বদেশ* পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। সত্তর ও আশির দশকে *সংবাদ* পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখতেন।

আবু জাফর শামসুদ্দীন বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করেন। বিশেষ করে বাংলাদেশ শান্তি পরিষদের সভাপতি, বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচিত সদস্য, বঙ্গবন্ধু পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, বাংলাদেশ-আফ্রো-এশীয় লেখক ইউনিয়নের সহসভাপতি ও বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির সভাপতি ছিলেন।

একজন প্রগতিশীল লেখক হিসেবে গল্প, উপন্যাস, মননশীল প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ১৯৮৩ সালে একুশে পদক লাভ করেন।

১৯৮৮ সালের ২৪ আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। সাক্ষাৎকারটি জাতীয় জাদুঘরের কথ্য ইতিহাস প্রকল্পের আওতায় ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ড. সালাহউদ্দীন আহমদ ও ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম নিয়েছিলেন]

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম : জাফর সাহেব, আপনার জন্ম কবে?

আবু জাফর শামসুদ্দীন : আমার জন্ম বাংলা ১৩৩৬ সনের ২৮ ফাল্গুন, শুক্রবার। ইংরেজি ১৯১১ সালের মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের কোনো একদিন।

আমার বাবার নাম মো. আক্কাস আলী ভূঁইয়া। গ্রাম: দক্ষিণবাগ, থানা: কালীগঞ্জ, এখন যেটাকে উপজেলা বলা হয়। জেলা বর্তমানে গাজীপুর। আগে ছিল ঢাকা।

মু নূ ই : সে সময়ে।

আ জা শা : সে সময় আমাদের পরিবার ছিল সামাজিকভাবে ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত পরিবার। আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। ঋণের ভারে ছিল ভয়ানকভাবে জর্জরিত। প্রায় অচলদশা তখন আমাদের। পারিবারিক এ রকম অবস্থার মধ্যেই আমার জন্ম। তবে আমার বাবা অতীত আভিজাত্যবোধ থেকে সাধারণ মানুষের প্রতি ঘৃণাবোধ বা তাদের হেয়জ্ঞান করতেন না। এ রকম কিছু তাঁর মধ্যে ছিল না। এর মূলে ছিলেন সম্ভবত আমার দাদা। তিনি মৌলভি ছিলেন। ১৮৫৭ সালে যখন ঢাকায় সিপাহি বিদ্রোহ[১] শুরু হয়, তখনো তিনি এখানে পড়াশোনা করতেন। আমার দাদির মুখে শুনেছি, ওই সময় মৌলভিগোছের লোক দেখলেই ইংরেজ সেনারা তাদের ধরে ফাঁসি দিত। এ অবস্থায় তিনি গ্রামে পালিয়ে আসেন। তার আগে অবশ্য গ্রামে তিনি মসজিদ তৈরি করেছিলেন। আমার বাবার আচরণ ইত্যাদি দেখে আমার মনে হয়েছে, আমাদের পরিবারের ওপর ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রভাব ছিল। তাঁরা মানুষকে ঘৃণা করতেন না এবং আমাদের বাড়িতে যেসব লোক কাজকর্ম করত, দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে, তাদের সঙ্গে বসে তিনি খাওয়া-দাওয়া করতেন। তাদের আদর-স্নেহ করতেন।

আমাদের পরিবার ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। তবে আমাদের পরিবার মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে কিছু অর্থকড়ি পেত।

মু নূ ই : আপনারা কি নিজেদের কৃষিনির্ভর মধ্যবিত্ত পরিবার বলে মনে করেন?

আ জা শা : মূলত আমরা ছিলাম কৃষিনির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত একটি পরিবার। এভাবেই আমরা আমাদের পরিচয় চিহ্নিত করতাম।

মু নূ ই : আপনাদের পারিবারিক আবহাওয়ার একটু বর্ণনা দেন। এটা কি

ধর্মভীরু বা ধর্মান্ধ একটি পরিবার? অথবা আপনারা কিছু পরিমাণে উদারও ছিলেন এবং আপনি যে ওয়াহাবির[২] কথা বললেন, আপনার নিজের অভিজ্ঞতায় গ্রামে ওয়াহাবির প্রভাব কিছু দেখেছেন কি না?

আ জা শা : আমাদের পরিবারকে একদিকে যেমন খুব গোঁড়া ধর্মভীরু বলা যাবে, অন্যদিকে আবার উদারও বলা যাবে। কেননা, গোঁড়ামি বলতে যেসব অন্ধ কুসংস্কারকে বোঝায়, সেগুলো আমাদের পরিবারে ছিল না। যেমন ধরুন, মসজিদ ও মাজারে ফিরনি দেওয়া বা পীরগিরির মতো ব্যাপারস্যাপারের প্রতি আমাদের পরিবারের তেমন কোনো আগ্রহ বা প্রবণতা একেবারেই ছিল না। আমার বাবা এসবে বিশ্বাস করতেন না। মানতটানতের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ছিলেন কবর পূজারও ঘোর বিরোধী। এমনকি অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকজনের মধ্যে মুরব্বিদের পায়ে ধরে সালাম করার যে প্রথা ছিল, তারও বিরোধী ছিলেন তাঁরা। আমাকে তিনি কখনো পায়ে সালাম করতে দেননি। তিনি 'সালামু আলাইকুম' বলে খাড়া হয়ে সালাম করতে বলতেন। বলতেন, আর একান্তই যদি পায়ে ধরে সালাম করতেই হয়, তাহলে খাড়া হয়ে বসবে। কখনোই মাথা নিচু করবে না।

মু নূ ই : আপনার নিজের শিক্ষা কীভাবে হয়েছে? আপনার শিক্ষাজীবনের কথা বলেন, বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে।

আ জা শা : আমাকে প্রথম লেখাপড়া শেখাতে শুরু করেন আমার বাবাই। আমার হাতেখড়ি তাঁর কাছেই হয়। অ, আ, ক, খ এবং আলিফ, বে, তে, ছে ইত্যাদি বর্ণের পরিচয় তাঁর কাছেই হয়। অর্থাৎ, আমাকে তিনি মোটমুটি চারটি ভাষা শিক্ষা দিতে শুরু করেন—বাংলা, উর্দু, ফারসি ও আরবি।

মু নূ ই : সেটাই কি তখন রেওয়াজ ছিল?

আ জা শা : অন্তত আমাদের মতো পরিবারে এ রকমেরই রেওয়াজ ছিল। কিন্তু এটা বেশি দিন চলেনি। কারণ, ফারসি ও আরবি—এই দুটোর মধ্যে শেষ পর্যন্ত একটা ভাষা বাছাই করে নিতে হয়েছিল। যা-ই হোক, পাঠশালায় আমার খুব বেশি দিন যাওয়া হয়নি। আমার যখন বাল্যকাল, তখন স্থায়ী কোনো পাঠশালা ছিল না। আমাদের এলাকায় প্রথম যে পাঠশালা হয়েছিল, সেটা হয়েছিল খুবই সম্পন্ন একটা গোয়ালাবাড়িতে। পাঠশালাটি চালু করেছিলেন প্রভাত গোপ নামের একজন জিটি পাস পণ্ডিত। কিন্তু বেশি দিন সেটা টেকেনি। আমি বেশি দিন সেখানে পড়তে যাইনি। দ্বিতীয় আরেকটা পাঠশালা চালু করেছিলেন এক ব্রাহ্মণ সন্তান। সেটা হয়েছিল একজন সম্পন্ন নমশূদ্রের বাড়িতে। সে পাঠশালাটাও খুব বেশি দিন টেকেনি। শেষ পর্যন্ত গৃহশিক্ষক রেখেই আমার শিক্ষাজীবন শুরু হয়। বাবা নিজেও পড়াতেন। ওই সময় আমাদের গ্রামে একজন মুসলমান ছেলে, নিম্ন শ্রেণীর কৃষক পরিবারের ছেলে পড়াশোনা করতেন। তাঁরা ছিলেন তিন ভাই। দুই ভাই কৃষিকাজ

করতেন। তিনি একাই পড়তেন। কিন্তু তাঁর ওই পড়াশোনার ব্যাপারটা তাঁর বড় ভাইয়ের কাছে খুবই দৃষ্টিকটু ছিল। এ জন্য তাঁকে মারপিট পর্যন্ত করা হতো। এমনকি বড় ভাইয়ের স্ত্রী কেন ভাত রেঁধে খাইয়ে তাঁকে স্কুলে যেতে সাহায্য করেন, সে জন্য তাঁর ওপরও নির্যাতন করতেন তাঁর স্বামী। এক দিনের কথা আমার বেশ মনে পড়ে, হঠাৎ ওই ভদ্রলোক, তাঁর নাম ছিল নাসিরুদ্দিন আহমদ, তাঁর রক্তাক্ত হাত থেকে খুবই রক্ত পড়ছিল, সেই অবস্থায় আমার বাবার কাছে এসেছেন বিচারের জন্য।

কী ব্যাপার, বাবা জিজ্ঞাসা করলেন।

জবাবে তিনি অভিযোগের সুরে বললেন, তাঁর বড় ভাই তাঁর বাঁ ও ডান হাতের বাজু কামড়ে দিয়েছেন। দরদর করে রক্ত পড়ছে। দাঁত বসে গেছে। বাবা তাঁর বড় ভাইকে ডাকিয়ে এনেছিলেন, কিন্তু তাঁর কী বিচার করেছিলেন, আমার ঠিক মনে নেই। তবে তিনি নাসিরুদ্দিনকে বলেছিলেন, 'নাসিরুদ্দিন, তুমি আমার এখানে থাকো। আর যে দুই বছর আছে, আমার এখানে থেকে পড়াশোনা করো। স্কুলে যাও, পরীক্ষা দাও। ওই বাড়িতে তোমার লেখাপড়া হবে না।'

সেই থেকে নাসিরুদ্দিন আমাদের বাড়িতেই থেকে যান এবং এখান থেকে খাওয়াদাওয়া করে চার মাইল দূরে কালীগঞ্জ হাইস্কুলে পড়তে যেতেন। পাশাপাশি সকাল, বিকেল, সন্ধ্যাবেলা আমাকে পড়াতেন। ইংরেজি ও বাংলা। এর মধ্যে অবশ্য বাবাও তাঁর অবসর সময়ে আমাকে পড়া দেখিয়ে দিতেন। আমাদের কালে এই জাতীয় গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এরপর নাসিরুদ্দিন, খুব সম্ভবত ১৯২৩ সালের কথা সেটা, ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় চলে যান, চাকরির উদ্দেশ্যে। ফলে, পড়াশোনায় আমার অসুবিধা হয়। সে সময় আশপাশে কোনো স্কুলও ছিল না। আমার বাবা সাত মাইল দূরে ডেমরা গ্রামের তারাগঞ্জ হাইস্কুলে আমাকে ভর্তি করিয়ে দেন। ডেমরাতেই ছিল আমাদের আদি নিবাস। আমাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী লোকজন তখনো ওখানে বসবাস করতেন। এখনো অনেকেই আছেন। আমার মামার বাড়িও ওই গ্রামে। নতুন ভর্তি হওয়া তারাগঞ্জ হাইস্কুল ছিল নতুন প্রতিষ্ঠিত স্কুল। আমার চাচা ও ফুফা আবদুল গফুর ভুঁইয়া ছিলেন এলাকার একজন নামকরা লোক। আমি তাঁদের বাড়িতে থেকেই ওই স্কুলে পড়াশোনা করতে লাগলাম। ভর্তি হয়েছিলাম ক্লাস থ্রিতে। কিন্তু কিছুদিন যাওয়ার পর ওখানে আমার মন টেকেনি। আমি কান্নাকাটি করে বাড়িতে চলে আসি। আবার আমার জন্য গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করা হয়। উনি ছিলেন কুমিল্লার এক মৌলভি। তিনি এসে আমাকে আরবি পড়াতে শুরু করেন। পাশাপাশি তিনি আমাকে বাংলা, উর্দু, ইংরেজি ইত্যাদিও পড়াতে থাকেন। তিনি নিউ স্কিম মাদ্রাসা থেকে পাস করা আলেম ছিলেন। বাড়িতে থেকে বছর দুয়েক পড়াশোনা করি। তারপর আমি ডেমরার কাছে একডাল বলে একটা

গ্রাম আছে, সেখানে নিউ স্কিম মাদ্রাসায় ক্লাস ফাইভে ভর্তি হই এবং ১৯২৫ সালে জুনিয়র মাদ্রাসা পাস করে ঢাকায় এসে ক্লাস সেভেনে ঢাকা মাদ্রাসায় ভর্তি হই।

তখন আমাদের মতো পরিবারের ছেলেদের বেশির ভাগকেই মাদ্রাসায় পড়তে যেতে হতো। লিবারেল এডুকেশনে যাওয়া বেশ কঠিন ছিল। মুসলমান পরিবারের ছেলেরা হাই মাদ্রাসা পাস করে জেনারেল লাইনের কলেজে পড়াশোনা করতে পারত। যেমন আমি মাদ্রাসা লাইনে লেখাপড়া করে কলেজে চলে যাই। ফরমাল এডুকেশন বলতে যা বোঝায়, সেটা ঢাকার ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বছর খানেক পড়ার পর আমি আর লেখাপড়া করিনি।

১৯১৯-২০ সালের কথা বলতে হয়, আমার বাবা সে সময় আমাদের এলাকায় কংগ্রেস-খিলাফতের সভাপতি ছিলেন। আমাদের গ্রাম যে মুসলিমপ্রধান ছিল, সে কথা বলা যাবে না। আমরা হিন্দু-মুসলমান বোধ হয় সমান সমানই ছিলাম। তার মধ্যে বেশ কিছু প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ পরিবার ছিল। মুসলমান অঞ্চল বা পাড়ার দিক থেকে প্রভাবশালী বলেন অথবা কিছু লেখাপড়া জানা লোকই বলেন, সেই বিচারে ছিলেন একমাত্র আমার বাবাই। আমার এক চাচাও প্রভাবশালী ছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বেশ আগেই।

আমি তখন বেশ ছোট। অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলন[৩] যে আমাদের গ্রামে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে কথা আমার মনে পড়ে। আমাদের গ্রামে একবার একটি সভা হয়েছিল। একটি খালি ময়দানে কয়েকটা চৌকি একসঙ্গে করে একটা ডায়াস তৈরি করা হয়েছিল। দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে সেই সভায় লোকজন মিছিল করে এসেছিল। পতাকাও ছিল তাদের হাতে হাতে। এখনো আমার স্পষ্ট মনে পড়ে একজন পাগড়ি পরা, আচকান, পাজামা পরা মৌলভি সাহেবের মতো দেখতে একজন লোক, খুব জোরালো বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং তাঁর মুখে আমি সর্বপ্রথম 'ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসি' শব্দটা শুনি। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড[৪] এবং রাউলাট অ্যাক্টের[৫] কথাও যে বলা হয়েছিল তাঁর ভাষণে, সে কথা এখন পর্যন্ত আমার মনে আছে। সভার পর আমার বাবা লোকাল কংগ্রেস-খিলাফত কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর পরপরই তিনি কোথা থেকে যেন চরকা সংগ্রহ করে আনেন। বোধ হয় কংগ্রেসের কোনো অফিস থেকে এসব দেওয়া হতো। আমি ঠিক জানি না। আমাদের বাড়িতেও তিনি চরকা নিয়ে আসেন। পাড়ার অনেক বাড়িতেও তিনি চরকা এনে দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, নমশূদ্র ও মুসলমানপাড়াতেও তিনি চরকা এনে দিয়েছিলেন।

আমার দাদি কোম্পানি আমলের মানুষ। আমার দাদার জন্ম ১৮১৬ সালে। কাগজপত্র থেকেই আমি এটা জেনেছি। আমার দাদি বোধ হয় তাঁর পাঁচ-ছয় বছরের ছোট ছিলেন। তাঁর জন্ম হয়ে থাকবে সেই হিসাবে ১৮২০-২২ সালের

দিকে। তিনি চরকায় সুতা কাটতে জানতেন। আমার মায়েদেরও, আমার দুই মা ছিলেন, বড় মা নিঃসন্তান ছিলেন, তাঁদেরও তিনি চরকা কাটা শিখিয়েছিলেন। অন্য গ্রামের নারীরা তাঁর কাছে এলেও তিনি তাঁদের কীভাবে চরকায় সুতা কাটতে হয়, সেটা দেখিয়ে দিতেন। আমাদের বাড়ির সামনেই ছিল মসজিদ। ওই মসজিদে মুষ্টিভিক্ষা করা হতো কংগ্রেস-খিলাফত কমিটির তহবিলের জন্য। ব্যাপারটি বেশ মনে আছে। আমার দাদি মারা যান ১৯৩৩ সালে, ১১১ বছর বয়সে।

আমি ১৯২৪ সালে জুনিয়র মাদ্রাসা পাস করি। ১৯২৫ সালের ২০ জানুয়ারি সপ্তম শ্রেণীতে ঢাকা মাদ্রাসায় এসে ভর্তি হই। লেখাপড়া করতে আসার সুবাদে আমাকে ঢাকায় থাকতে গিয়ে পার করতে হয়েছিল এক বিচিত্র জীবন। কখনো জায়গিরে ছিলাম অনেক দূরে কাজলাতে। তারপর এখানে দয়াগঞ্জের এক বাড়িতে একবার কিছুদিনের জন্য জায়গির ছিলাম। বাবার খুব পরিচিত, বন্ধুস্থানীয় এক লোকের হোটেল ছিল। একটা আলাদা রুম নিয়ে আমরা তিনজন ছাত্র একসঙ্গে কিছুদিন সেখানে ছিলাম। কিছুদিন ছিলাম হোস্টেলে। আবার জায়গিরেও ছিলাম। অর্থাৎ, ঢাকায় আমাকে পার করতে হয়েছে খুব বিচিত্র একটা জীবন। এক জায়গায় স্থায়ী হয়ে খুব বেশি দিন থাকিনি। তবে নারিন্দাতে একটা হোস্টেল ছিল, সেখানে মনে হয় টানা বছর দেড়েক ছিলাম। আমি তখন ঢাকায় ছিলাম ১৯২৫ সালের শুরু থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত।

আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন পুরান ঢাকায় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা একরকম ছিল না বললেই বলা চলে। আমি কলতাবাজারে ছিলাম, দয়াগঞ্জে ছিলাম। তারপর কিছুদিন টিকাটুলীতে ছিলাম। এসব জায়গায় আমি যা দেখেছি এবং আগামসি লেনসহ এ রকম অন্যান্য পাড়া-মহল্লায় যাতায়াত করতে গিয়ে দেখেছি, এসব এলাকায় বসবাসকারী মুসলমানদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা গ্রামের চেয়েও কম ছিল। মুসলমানদের বেশির ভাগেরই ব্যবসা ছিল ঘোড়ার গাড়ির সহিসগিরি, পান-বিড়ির দোকানদারি ও রাজমিস্ত্রির কাজ। এই ছিল বেশির ভাগ মুসলমানের পেশা। সাংস্কৃতিক জীবন বলতে মুসলমানদের কার্যত কিছুই ছিল না। সেখানে কাদির সর্দারের 'লায়ন' সিনেমা হল ছিল। তখন পর্যন্ত ওটা অবশ্য সিনেমা নয়, লায়ন থিয়েটার। সেই থিয়েটারে পুরুষেরাই নারীর ভূমিকায় সেজে অভিনয় করতেন। অভিনীত নাটকের নাম হতো সাধারণত *গুলে বাকওয়ালি* ও *শিরি-ফরহাদ*। নাটকের নাম ও রকমের হলেও সেগুলোর সংলাপ বাংলাতেই হতো। মাঝেমধ্যে উর্দুর মিশেল দেওয়া হতো। গান থাকত। প্রবেশমূল্য ছিল বোধ হয় তিন আনা। মুসলমানরা ওসব নাটক দেখতে যেত। এরপর আরমানীটোলায় যখন একটা সিনেমা হল হলো এবং সদরঘাটে হলো, তখন তারা ওগুলোতেও যাওয়া-আসা করত। এর বাইরে তাদের আর কোনো ধরনের সাংস্কৃতিক জীবন ছিল না।

তবে ওস্তাদ, সংগীতজ্ঞ, ধ্রুপদি সংগীতে দক্ষ দু-চারজন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা বিশেষ স্থানে বা জায়গায় হয়তো কখনো জলসা ইত্যাদি করতেন। আমার তখন এত অল্প বয়স যে ওসব জলসায় স্বাভাবিক কারণেই যাওয়ার সুযোগ হয়নি।

বিশের দশকে আমি যখন ঢাকায় ছিলাম, তখনকার ঢাকায় মহল্লাকেন্দ্রিক সরদারশাসিত জীবন, যেটা আমি নিজের চোখে দেখেছি এবং যেসব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, সে সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, যে কয়েকটি মহল্লায় আমি ছিলাম, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি মহল্লার কথা বলছি। সেটা হচ্ছে কলতাবাজার। এই মহল্লায় সরদারি প্রথা দেখেছি। সরদার সাহেবের নাম ছিল ইলিয়াস সরদার। খুব ডাঁটের মানুষ ছিলেন তিনি। মহল্লার লোকজন বিচার-সালিস এবং অভাব-অভিযোগ নিয়ে সোজা তাঁর কাছে চলে আসত। মসজিদে লোকজনকে ডাকা হতো। সেখানে বসেই এই বিচার-সালিসের কাজ করা হতো। কখনো সরদার সাহেবের বাড়িতেও এমন করা হতো। এবং মহল্লাবাসী সেই বিচার মেনে নিত। সামাজিক একটা প্রথা হিসেবেই এটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। একে বলা হতো বাইশ পঞ্চায়েত। বাইশটি পঞ্চায়েতের বাইশজন সরদার বোধ হয় ছিলেন। তাঁদের প্রধান ছিলেন ঢাকার নবাব। বছরে একবার সবাই মিলিত হতেন এবং প্রায় ক্ষেত্রে অবশ্য একই ব্যক্তি সরদারি করতেন। তবে মাঝেমধ্যে বদলানো হতো। সেটা ঠিক নির্বাচনের মাধ্যমে হতো কি না, কিংবা ঢাকার নবাব সাহেব তাঁকে মনোনয়ন দিতেন কি না, সেটা আমার জানা নেই। তবে মাঝেমধ্যে ধর্মীয় ব্যাপারস্যাপার নিয়ে ঝগড়া-ফ্যাসাদ যা কিছুই হতো, কোর্টে না গিয়ে সেসব কিছুর নিষ্পত্তি এই সরদারেরাই করতেন। আর যদি সরদারের বিচার কারও মনঃপূত না হতো, তাহলে বাইশ পঞ্চায়েতে, নয়তো শেষ পর্যায়ে নবাব সাহেবের কাছে আপিল করা চলত। আমি একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, সেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তখন হয়েছে। তাকে ঘিরে একটা আলাদা সমাজ, প্রধানত ছাত্রদের উদ্যোগে, অধ্যাপকও ছিলেন, গড়ে ওঠার চেষ্টা চলছিল। কিছু সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও চলছিল। হতো গান-বাজনা ইত্যাদিও। তার মধ্যে বিশেষভাবে আমার মনে পড়ে ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর[৬] কথা। ১৯২৬ সালে ঢাকায় সাহিত্য সমাজের প্রথম অধিবেশন হয় এবং সেই মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র ছিল *শিখা*[৭]। মুসলিম সাহিত্য সমাজ সম্পর্কে পুরান ঢাকার লোকজনের প্রতিক্রিয়া বলতে গেলে বলতে হয়, প্রথম দিকে তারা এর গুরুত্ব বিশেষ কিছু বোঝেনি। পরে তারা বুঝেছিল। ১৯২৬ সালে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম অধিবেশনে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে দাওয়াত করা হয়। তাঁর আসার কথা ছিল সকালে। সেই খবর শুনে আমি ওখানে গিয়েছিলাম। বর্তমানে যেখানে মেডিকেল কলেজ, তার ওপরে ছিল মুসলিম হল (এসএম হল) ও নিচে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রথম গেট দিয়ে ঢুকলেই তার মুখ বরাবর একটা সম্প্রসারিত জায়গা ছিল, সেটাই ছিল বোধ হয় তাদের ডাইনিং রুম। আমার যদ্দুর মনে পড়ে, অধিবেশনটা হয়েছিল ওখানেই। তবে কাজী নজরুল ইসলাম সকালে এসে পৌঁছাতে পারেননি। ফলে, তাঁকে আমি তখন দেখতে পারিনি। তবে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়েছিল একটা রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে। গানটা ছিল 'দখিন-হাওয়া, জাগো জাগো, জাগাও আমার সুপ্ত এ প্রাণ'। উদ্বোধনী এই রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছিলেন ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু। তিনি তখন খুব সম্ভব বিএ অথবা ল পড়ছিলেন। তাঁর গাওয়া গানটা বেশ আনন্দ দিয়েছিল আমাদের। এর পরপরই যখন থেকে *শিখা* পত্রিকা বের হতে শুরু করে, তখন তার মধ্যে ইসলাম ধর্মবিরোধী নানা কথাবার্তা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করল গোঁড়াপন্থীরা। বিশেষ করে, বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন যখন শুরু হলো, তখন থেকে। পরবর্তীকালে আমি শুনেছিলাম, কাজী আবদুল ওদুদ[৮] সাহেব ও অধ্যাপক আবুল হুসেনের[৯] ওপর কিছুটা নির্যাতন হয়েছিল। ঢাকার নবাববাড়িতে এনে তাঁদের নাকি আটকে রাখা হয়েছিল এবং ক্ষমা চাওয়ার পর তবেই তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এ রকম একটা ঘটনার কথা শুনেছিলাম।

আসলে আমরা তখন মাদ্রাসার ছাত্র হলেও আমাদের চোখ-মুখ তখন খুলে গেছে। বিশেষ করে, তখন ঢাকা মাদ্রাসায় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব ভালো একটা লাইব্রেরি থাকায় ছাত্রদের মন আলোকিত করার কাজে খুবই সহায়ক হয়েছিল। আজকাল তো অনেক লাইব্রেরি। পাবলিক লাইব্রেরি-জাতীয় লাইব্রেরি জেলায় জেলায়। আজকাল তো ছাত্রদের জন্য আলাদা ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান। সেগুলোতে ছিল পৃথক লাইব্রেরি। আমাদের মাদ্রাসায় বাংলাদেশের সব উল্লেখযোগ্য মাসিক পত্রপত্রিকা আসত। আসত উর্দু পত্রপত্রিকাও। আমরা সেগুলো পড়তাম। তার ফলে আমাদের চিন্তাশক্তির কিছুটা উন্মেষ হয়। আমাদের মাদ্রাসায় ছেলেরা খেলাধুলাতেও খুব ভালো ছিল। আপনাদের একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম বলি। তাঁর নাম হাজি রমিজউদ্দিন। একসময় তিনি ভারতবিখ্যাত সেন্টার ফরোয়ার্ড ছিলেন। লিগে কলকাতায় খেলেছিলেন। তিনি এবং এখন *রোববার*-এর সম্পাদক আবদুল হাফিজ, তিনিও ঢাকা মাদ্রাসারই ছাত্র। তাঁরা ছাত্রজীবন শেষে ভালো খেলোয়াড় হয়েছিলেন। নামধাম করেছিলেন। হাজি রমিজউদ্দিন বোধ হয় পরবর্তীকালে সাংসদও হয়েছিলেন। কাজেই আমরা পিছিয়ে পড়াদের দলে ছিলাম না। মওলানা আবু নাসের ওয়াহিদ মাদ্রাসাছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাভাবনার উন্মেষে অবদান রেখেছিলেন। আমরা মাদ্রাসার ছেলেরা নিজেরাও ডিবেটিং সোসাইটি ইত্যাদি গড়ে তুলেছিলাম। আরবি, উর্দু, বাংলা এমনকি ইংরেজি ভাষাতেও আমরা বিতর্কসভার আয়োজন করতাম। আমরা ছাত্ররাই এসবে অংশ নিতাম। শিক্ষকদের মধ্যে কিছু ভালো শিক্ষক ছিলেন।

একজন ছিলেন ড. শহীদুল্লাহর[১০] ভাই খলিলুল্লাহ সাহেব। তিনি বাংলা পড়াতেন আমাদের। মাস্টার ইউসুফ বলে আরেকজন ছিলেন ইংরেজিতে এমএ। তিনি আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। এ রকম আরও কয়েকজন খ্যাতনামা শিক্ষক ছিলেন।

সাধারণ্যে এ রকমের একটা ধারণা ছিল যে মাদ্রাসাগুলো রক্ষণশীলতার দুর্গ। আসলে সেটা ঠিক ছিল না। আমি মাদ্রাসাগুলোকে ঠিক রক্ষণশীলতার দুর্গ বলে মনে করি না, বরং আমরা এই ঢাকা মাদ্রাসার ছেলেরা ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা যেটা, অর্থাৎ পুরোনো সোবের মাদ্রাসার ছাত্রদের খুব একটা ভালো চোখে দেখতাম না।

আমাদের সমকালে বাঙালি মুসলমানরা ঢাকা থেকে তখন *শিখা* ছাড়া অন্য আর কোনো পত্রিকা বের করেছিল কি না, আমার মনে পড়ে না। *ঢাকা প্রকাশ*[১১], *সোনার বাংলা* এগুলো তো আরও পরের ব্যাপার। এ রকম আরও দু-চারটি পত্রপত্রিকা যেগুলো বের হতো, সেগুলোর বেশির ভাগেরই প্রকাশনার সঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায় জড়িত ছিল। অর্থাৎ, তাদেরই পত্রিকা ছিল এগুলো। ঠিক ঢাকা থেকে নয়, নারায়ণগঞ্জ থেকে ওসমান আলী সাহেব *অভিযান* নামের মাসিক একটি পত্রিকা বের করছিলেন। আর তো আমার খুব বেশি কিছু মনে পড়ে না।

১৯২৬ সালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে দাঙ্গা হয়েছিল, তার প্রভাব ঢাকাতেও পড়েছিল। আমিও দাঙ্গার মধ্যে পড়েছিলাম। ঢাকাতেও দাঙ্গা হয়েছিল। তবে তার ব্যাপকতা কেমন ছিল, সে সম্পর্কে আমার খুব বেশি ধারণা নেই। আমি তখন নারিন্দার একটা মেসে থাকতাম। ওদিক থেকে ঢাকা মাদ্রাসায় আসতে হতো লক্ষ্মীবাজার ঘুরে। আমরা মাদ্রাসায় আসতাম লক্ষ্মীবাজার হয়ে পাঁচ ভাইঘাট লেনের[১২] গলির ভেতর দিয়ে। এ পথে তো হিন্দুপাড়া ছিল। আমরা ভয়ে ভয়ে আসতাম। কিন্তু আমি বা অন্য যে ছেলেরা আসতাম, অন্তত পক্ষে তারা কোনো খানে আক্রান্ত হইনি। শুনতাম, কাগজিটোলা[১৩] বা আগামসি লেনের[১৪] দিকে বা অমুক জায়গায় আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। তবে খুব বেশি একটা খুনখারাবি হওয়ার আগেই বোধ হয় সেটা মিটে গিয়েছিল। কিন্তু ওই সময় মফস্বলের অবস্থাটা সম্পূর্ণ অন্য রকম ছিল। আমার মনে পড়ে, আমাদের গ্রামে এবং পার্শ্ববর্তী কোনো গ্রামে সাম্প্রদায়িকতা বলতে আমরা যা বুঝি, তেমন কিছু হয়নি বা তার তেমন অস্তিত্বও ছিল না। সে সময়ে গ্রামাঞ্চলে মানুষজন ঠিক তেমন শ্রেণীসচেতন না হলেও সামাজিক আচার-আচরণ কতকটা শ্রেণীভিত্তিক ছিল। আর সেটা এই অর্থে যে গ্রামে হিন্দু-মুসলমান হিসেবে ঝগড়া হতো না, সেটা হতো আর দশটা ঝগড়া-ফ্যাসাদের মতোই। এসবই আমার বাল্যকালের সামাজিক চালচিত্র। বিশের দশকের ঘটনা। ১৯১৮ থেকে ১৯২৫-২৬ সাল এবং তার পরের কালের ঘটনাও আছে। তখন যে জমিদার ও তালুকদার শ্রেণী, অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে

মধ্যস্বত্বভোগী যে অভিজাত শ্রেণী ছিল, তারা পরস্পর সমানে সমানে ওঠা-বসা করত এবং সাধারণ মানুষের তুলনায় তারা অবশ্যই আলাদা ছিল। হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে তারা ছিল সাধারণ গরিব মানুষ। তাদের ওপর নিপীড়ন বা শোষণ যেটা হতো, হিন্দু-মুসলমান উভয় অভিজাত শ্রেণীই সমানভাবে সেটা করত। আবার উভয় শ্রেণীর অভিজাত ব্যক্তিরা তাদের, অর্থাৎ সাধারণ মানুষজনকে হেয়জ্ঞান করতেন। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা লাগলে, মজার ব্যাপার, উভয় পক্ষে উভয় শ্রেণীর ভেতর থেকেই সাক্ষী-সাবুদ পাওয়া যেত। এসব মামলা-মোকদ্দমা বা গ্রাম্য ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে ঠিক সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ছিল না। এসব ঘটনাকে সাম্প্রদায়িকভাবেও মোকাবিলা করা হতো না।

১৯১১ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে এ দেশে যে ভূমি জরিপ এবং এ-সংক্রান্ত যে আপসরফা হয়, তাতে করে ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের প্রভাব কিছুটা পরিলক্ষিত হয়। ওই সময় একদিন আমাদের বাড়িতে এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক এলেন। তাঁর সঙ্গে আরও পাঁচ-ছয়জনের মতো লোক ছিলেন। তাঁরা দুটো চেয়ার বা জলচৌকিতে বসেছিলেন। ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকটির নাম ছিল হেমন্ত কুমার ভট্টাচার্য। এসে তিনি আমার বাবাকে বললেন, 'মুনশি সাহেব', আমার বাবাকে তারা মুনশি সাহেব বলতেন, 'এ তো বড় মুশকিলের ব্যাপার হলো। যে অবস্থা দেখছি, তাতে করে আমাদের পক্ষে তো আর মানসম্মান নিয়ে বাস করাই মুশকিল হয়ে পড়বে। সাধারণ লোকজন গাছটাছ সব কেটেকুটে নিয়ে যাচ্ছে। পুকুর নিতে এখন আর আমাদের অনুমতি লাগবে না। তারা আমাদের আর নগদ সেলামিও দিতে চায় না। আমাদের তো বড় মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। সাধারণ লোকজনই এসব করছে।'

আরেকটা ঘটনা আমার মনে আছে। ঘটনাটা ঘটেছিল হাটে। আমি সেখানে ছিলাম। কিছু কৈবর্ত বা জেলে মাছ বিক্রি করছিল। একজন কৈবর্তের কাছে কতগুলো বড় কই মাছ ছিল। মাছগুলোর গ্রাহক ছিল বেশি। তার মধ্যে একজন ব্রাহ্মণও দামাদামি করছিলেন। জেলে বেচারা তার মাছের দাম বোধ হয় বেশি চেয়েছিল। হঠাৎ ব্রাহ্মণ করলেন কী, তাঁর পা'টা কৈবর্তের ঘাড়ের ওপর, নাকি মাথার ওপর চাপিয়ে দিলেন। চাপিয়ে দিয়ে বললেন, 'মাছগুলো দে।' কৈবর্ত তখন নিরুপায়। তাঁর খলুইয়ের মধ্যে মাছগুলো তুলে দিল। তার জন্য দাম কত দিয়েছিলেন সেই ব্রাহ্মণ বা আদৌ দিয়েছিলেন কি না, সে কথা এখন আর আমার স্মরণে নেই। কিন্তু কৈবর্তের মাথায় যে পা তুলে দিয়েছিলেন সেই ব্রাহ্মণ, সেটা আমার বেশ মনে আছে।

মুনূই: আপনার বাল্যকালে এবং পরবর্তীকালে যখন মাদ্রাসার ছাত্র, আপনার বয়সী ছেলেরা কি বাধ্যতামূলকভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন? ইসলামি আচার-আচরণ অনুসরণ করতেন?

আ জা শা : বাল্যকালের আমাদের বাড়ির কথা স্বতন্ত্র। কেননা, আমাদের বাড়িতে তো দুই প্রজন্ম আগে থেকেই নিয়মিত ধর্মকর্মের প্রচলন শুরু হয়েছে। আমাকে বোধ হয় সাত-আট বছর বয়সেই নামাজ শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। বাবার সঙ্গে নামাজ পড়তে হতো। তবে মাঝেমধ্যে কাজাও করতাম। একটা ঘটনার কথা মনে আছে। সেটা ছিল রোজার দিন। রমজান মাসে সব ছেলেকে তারাবির নামাজে শামিল হতে হতো। জিঞ্জিরায় তখন এক হাফেজ সাহেব ছিলেন। তাঁকে মোটা হাফেজ বলা হতো। তিনি আমাদের মসজিদে পবিত্র কোরআন খতম করাচ্ছিলেন। পড়াচ্ছিলেন তখন তারাবির নামাজও। সেদিন ছিল বোধ হয় রোজার শেষ দিন। বেশি সওয়াব পাওয়ার দিন। আমি গিয়েছিলাম। আমার বড় চাচাতো ভাইও আমার সঙ্গে ছিলেন। আরবি উচ্চারণ শেখানোর ব্যাপারে ওই হাফেজ সাহেব খুবই দক্ষ ছিলেন। তিনি উচ্চারণ করছিলেন 'আরাইতাল্লাজি...ইয়াউল ইয়াতিম'। এতটাই শুদ্ধভাবে তিনি আরবি কথাগুলো উচ্চারণ করছিলেন যে তাঁর বলার ধরনে পেছনে বসে থাকা আমরা কয়েকজন উচ্চহাসিতে ভেঙে পড়েছিলাম এবং দ্রুতই আমরা সেখান থেকে সরে পড়েছিলাম।

মু নূ ই : মাদ্রাসার ছাত্র হিসেবে নামাজ-রোজা আদায় করা কি তখন বাধ্যতামূলক ছিল? নাকি স্বেচ্ছায় পড়তেন?

আ জা শা : না, বাধ্যতামূলক এমন কিছু ছিল না। ঢাকায় আসার পরও নামাজ হয়তো পড়েছি। অনেক সময় পড়িওনি। কিন্তু ব্যাপারটা তেমন বাধ্যতামূলক কিছু ছিল না। তবে জুমার নামাজে যেতাম, সে কথা মনে আছে। মেসে থাকার সময় বা জায়গির থাকতে অবশ্য ওয়াক্তের নামাজ নিয়মিত পড়তে হতো। তবে মেসে থাকার সময় খুব নিয়মিত নামাজ পড়েছি বলে মনে পড়ে না।

মু নূ ই : সে আমলের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কাদের কাদের কথা আপনাদের মনকে খুব আলোড়িত করত?

আ জা শা : প্রথমেই আমি রাজনীতির কথা বলেছি, আমার বাবা যে কংগ্রেস-খিলাফত কমিটির প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, সে কথা বলেছি। বলেছি তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতির কথা। ওই সময় আমরা সবচেয়ে বেশি শুনেছি মহাত্মা গান্ধী[১৫], আলী ভাইদের নাম, শুনেছি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের[১৬] নামও। আমার বাবা তখন একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা রাখতেন। প্রথম দিকে খুব সম্ভব রাখতেন সাপ্তাহিক *হিতবাদী*। বেশ বড় সাইজের পত্রিকা ছিল সেটা। পরে বোধ হয় তিনি রাখতেন সাপ্তাহিক *মোহাম্মদী*। একটা কাগজে, নাম ঠিক মনে নেই, কাজী নজরুল ইসলামের 'কামাল পাশা' অথবা 'বিদ্রোহী' কবিতা পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছিল। খুব সম্ভব 'কামাল পাশা'। কবিতাটি আসরের নামাজের পর আমার বাড়ির মসজিদের চত্বরে আমার গৃহশিক্ষক পড়ে শুনিয়েছিলেন। আমি শুনছিলাম, আমার বাবাও

শুনছিলেন। কবিতাটি সাংঘাতিকভাবে আমাকে অধিকার করেছিল। আমার মনে একটা রোমান্সের সৃষ্টি করেছিল।

মু নূ ই : এরপর তো আপনি কলকাতায় চলে যান।

আ জা শা : আমি ১৯৩০ সালের শেষের দিকে কলকাতায় চলে যাই।

মু নূ ই : কলকাতায় গিয়ে আপনি যে পরিবেশে পড়লেন, সেখান থেকে যখন ঢাকার কথা মনে পড়ত, তখন ঢাকাকে আপনার কি খুব রক্ষণশীল বলে মনে হতো?

আ জা শা : আমি ঠিক এভাবে চিন্তা করিনি। কারণ, কলকাতায় আমি গিয়েছিলাম কিছুটা রোমান্টিক আইডিয়া থেকে। দেশের জন্য একটা কিছু করতে হবে, এই ভাবনা থেকে। কিন্তু কী করতে হবে, জানতাম না। দেশ ও সমাজের জন্য একটা কিছু করতে হবে। এ ধরনের একটা ধারণা মনের মধ্যে জন্মানোর মূলে ছিলেন আমার গুরু এবং আত্মীয় ও কবি বেনজীর আহমদ[১৭]। আমি পড়ালেখা ছেড়ে কলকাতায় চলে গেলাম। গিয়ে এমন একটা পরিবেশে পড়লাম যে দিন কয়েকের ব্যবধানেই মনে হলো, জীবনটা অতটা সহজ নয়। কলকাতায় গিয়ে সেটা প্রথম বুঝি। হাজার খুঁজেও চাকরি পাই না। রোজগার করতে পারি না। এমনকি খালি পায়েও কলকাতা শহর ঘুরতে হয়েছে। অবশেষে কবি আশরাফ আলী খান[১৮], তিনি তখন *সোলতান*-এর সম্পাদক, সেখানে ঢুকি আমি সাব-এডিটর হিসেবে। তবে আমাকে ইংরেজি থেকে নয়, উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে হতো। *সোলতান*-এর সঙ্গে কোনো নিউজ এজেন্সির যোগাযোগ ছিল না। পুরোনো কাগজ, আগের দিনের কাগজ থেকে অনুবাদ ইত্যাদি করে একটা যেমন-তেমন কাগজ বের করতেন। এই চাকরিতে আমার বেতন ছিল ৩০ টাকা। কিন্তু একসঙ্গে বোধ হয় দুই টাকার বেশি কোনো দিনই পাইনি।

মু নূ ই : এটা কোন সময়ের কথা?

আ জা শা : এসবই ১৯৩১ সালের কথা। ওই সময় আশরাফ আলী খান ছেড়ে দিলে আবুল কালাম শামসুদ্দীন[১৯] সাহেব কিছুদিন *সোলতান*-এর এডিটর ছিলেন। এরপর সিলেট থেকে একজন এসেছিলেন। নামটা মনে নেই। নোয়াখালী থেকেও একজন এসেছিলেন। কিছুদিন পর সেটা বন্ধ হয়ে যায়। তখন আমি খুবই অসুবিধায় পড়ি। কলকাতায় বসে ঢাকার কথা তখন এভাবে স্মরণ করিনি যে কোনটা বেশি রক্ষণশীল, আর কোনটা কম রক্ষণশীল। তবে কলকাতা কসমোপলিটন সিটি হওয়ায় সেখানে এত রক্ষণশীলতা ছিল না। আমি প্রথম ৩৬ আপার সার্কুলার লেনে কবি আশরাফ আলী খান ও চৌধুরী শামসুর রহমানের[২০] সঙ্গে থাকতাম। তাঁরা দুজনই মনেপ্রাণে মুসলমানের উন্নতি চাইলেও আচার-আচরণের দিক থেকে কোনো রক্ষণশীলতা তাঁদের মধ্যে দেখিনি, নামাজ-রোজা

করতেন বলেও ঠিক মনে পড়ছে না।

মু নূ ই : আরেকটা কথা। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৩ সাল সময় পরিসরে অনেক রাজনৈতিক ব্যাপার ঘটে যায়। যেমন জিন্নাহ সাহেবের ১৪ দফা, মতিলাল নেহরুর ব্যাপার, গোলটেবিল বৈঠক[২১], সূর্য সেনের[২২] ফাঁসি। আপনারা তখন যাঁরা তরুণ, যাঁরা কলকাতায় সাংবাদিকতা ও সাহিত্যকর্মের দিকে ঝুঁকেছেন, এসব ঘটনা আপনাদের কীভাবে স্পর্শ করেছে বা কতটা গভীরে স্পর্শ করেছে?

আ জা শা : আমার ব্যক্তিগত কথা আমি বলতে পারি। আমাকে তখনকার সশস্ত্র আন্দোলন ভয়ানকভাবে রোমাঞ্চিত করত। যেমন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা, পরবর্তীকালে সরদার ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত ও চন্দ্রশেখর আযাদের মতো বিপ্লবীদের কার্যকলাপ আমাকে ভয়ানকভাবে রোমাঞ্চিত করত। অন্যদিকে, গোলটেবিল বৈঠক হচ্ছে, জিন্নাহ সাহেবের ১৪ দফা দেখছি, মহাত্মা গান্ধীও সেখানে গিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে ১৪ দফাকে তখন মনে মনে সমর্থন করলেও রাজনৈতিক দল হিসেবে আমি কংগ্রেসকে প্রাধান্য দিতাম এবং হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হয়ে যাক, মনেপ্রাণে সেটা চাইতাম। কিন্তু নেতৃত্বের দিক থেকে আমি মহাত্মা গান্ধীকে জিন্নাহর ওপরে স্থান দিয়েছি বলে এখনো মনে পড়ছে। আমি মুসলিম লীগের সদস্য কখনো হইনি। আমার কল্পনার মধ্যেও কখনো সেটা আসেনি। আমি ভুলেও চিন্তা করিনি যে ভারত বিভক্ত হবে কিংবা হওয়া উচিত।

সালাহউদ্দীন আহমদ : আমরা এতক্ষণ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে আপনার কথাবার্তা শুনছিলাম। আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে, গ্রামীণ রক্ষণশীল মুসলমান পরিবারে আপনার জন্ম, শৈশবে মাদ্রাসায় লেখাপড়া শিখেছেন, তা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে, বিশেষ করে কলকাতায় আসার পর সব ধরনের তথ্য, বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে আপনাকে দেখতে পাই এবং আরও পরে আপনি এম এন রায়ের[২৩] অনুসারী বিপ্লবী মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। আপনার মধ্যে এই যে বিবর্তন, একটা রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে এসে একজন মুক্তমনের বুদ্ধিজীবী হিসেবে আপনার এই যে বিবর্তন, সেটা কী করে সম্ভব হয়েছিল?

আ জা শা : তাহলে আবার আমাকে আমার পরিবারের অন্দরে ঢুকতে হয়। আমার বাবার আচরণ থেকে আমি যা দেখেছি, সেটা হচ্ছে এই, তিনি গোঁড়া ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। কারণ, আমাকে নিয়ে তিনি যখন ওই ব্রাহ্মণবাড়িতে ছোটবেলায় যেতেন, তারা আমাকে নাড়ু, মোয়া ইত্যাদি খেতে দিতেন। এসব কিছু যে আমি গ্রহণ করতাম, তাতে তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না। আবার ঈদের চাঁদে আমার সমবয়সী সব না হলেও কিছু কিছু ব্রাহ্মণ ছেলে আমাদের বাড়িতে এসে কোরমা-পোলাও খেয়েছে, দু-একজন ব্রাহ্মণ নারী, বিশেষ করে

একজন ব্রাহ্মণ নারী আমার মায়ের বন্ধু ছিলেন। বিধবা। তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং আমার মায়ের সঙ্গে গল্পগুজব করতেন। এ থেকে বুঝতে পারছেন, কিছুটা স্বাধীনতা, মানে চিন্তার স্বাধীনতা আমাদের ছিল। পরবর্তীকালে কলকাতায় যাওয়ার পর আমি আকৃষ্ট হই প্রধানত চলমান মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ব্যাপারে। আসল কথা হলো, স্বাধীনতা অর্জনের অনুকূল যেকোনো আন্দোলন, সেটা যেদিক থেকেই হোক, অর্থাৎ ব্রিটিশবিরোধী যেকোনো আন্দোলনের প্রতি আমার সব সময় একটা বিশেষ রকমের পক্ষপাতিত্ব ছিল। প্রথমে আমি যখন কলকাতায় যাই, সংবাদপত্রজগতের সঙ্গে কিছু লোকের মাধ্যমে কবি বেনজীর আহমদ, আশরাফ আলী খান, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পরবর্তীকালে আবুল মনসুর আহমদ[২৪] প্রমুখের মতো অনেকের সঙ্গে পরিচিত হই। পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে এই যে কয়েকজনের কথা বললাম, তাঁরা ইউরোপীয় সাহিত্য, সেকালে হাতের সামনে যা পাওয়া যেত, তা-ই পড়তেন। বিশেষ করে, ইবসেন, বার্নার্ড শর লেখা তাঁরা নিয়মিত পড়তেন এবং আমাদেরও তাঁরা বলতেন এসব পড়তে। ফলে, তাঁদের পরামর্শমতো পড়াশোনা করতাম। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, কবি বেনজীর আহমদ খুব সম্ভব ১৯৩২-৩৩ সালের দিকে আমাকে কার্ল মার্ক্সের দুই খণ্ডের *দাস ক্যাপিটাল* (এ-জাতীয় বই তখন প্রকাশ্যে বেচাকেনা হতো না) এবং এম এন রায়ের *ইন্ডিয়া ইন ট্রানজিশন* বইটি পড়তে দেন। তিনি বই দুটো কোথা থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন, জানি না।

ওই বয়সে *দাস ক্যাপিটাল*-এর ইংরেজি অনুবাদ, ইডেনের অনুবাদ ছিল বোধ হয়, পড়ে বুঝতে খুব কষ্ট হয়েছে। আমার বিদ্যা বলতে তো ওই ম্যাট্রিক পাস পর্যন্ত। তার বেশি নয়। তবে কষ্ট হলেও আমি পাঁচ-ছয় মাসে দুই খণ্ডের *দাস ক্যাপিটাল* ও *ইন্ডিয়া ইন ট্রানজিশন* বইটিও পড়ে শেষ করেছিলাম। পড়ার পর, বিশেষ করে বার্নার্ড শ ও ইবসেনের বই পড়ার পর আমার মন অনেকটা মুক্ত হয়ে যায়। তবে একটা কনট্রাডিকশন যে মনের মধ্যে ছিল না, এমন নয়। মানে একদিকে যেমন মুসলিম সমাজের প্রতি, ইসলামের প্রতি ঝোঁক ছিল, অন্যদিকে তেমনি সর্বভারতীয় মানুষের সার্বিক উন্নতি এবং তাদের স্বাধীনতার ব্যাপারেও আগ্রহ ছিল। এর মধ্যে এম এন রায় সম্ভবত ১৯৩৭ সালে জেল থেকে বের হন। কলকাতায় আসেন। তাঁর সান্নিধ্যে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন খুব সম্ভব বসুধা চক্রবর্তী ও বেনজীর আহমদ দুজনে মিলে। আপনারা জানেন, কবি বেনজীর আহমদ *নওরোজ* পত্রিকা বের করেছিলেন। তিনি সন্ত্রাসবাদী ছিলেন। সেকালে সন্ত্রাসবাদীদের ডাকাতও বলা হতো। তিনি ওই পথেই অর্থ সংগ্রহ করে তাঁর পত্রিকা বের করেছিলেন। সেকালে হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে যেসব পত্রপত্রিকা বের হতো, সেগুলোর মধ্যে *নওরোজ* ছিল প্রথম শ্রেণীর একটা পত্রিকা। তবে তার আয়ু ছিল মাত্র কয়েক মাসের।

সে সময় আমি ঢাকায়। *নওরোজ* পত্রিকা এখানে আসত। আমরা পড়তাম। নজরুল ইসলাম তাতে লিখতেন। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যাপার, কাজী নজরুল ইসলামের সান্নিধ্য। নজরুল ইসলামের লেখা যেটা যখন পেয়েছি, পড়েছি। তিনি আমাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে যোগ দিতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সাহিত্যটাহিত্য যা করছি, তার প্রথম অনুপ্রেরণা দিয়েছেন নজরুল ইসলাম। উদ্বুদ্ধও করেছেন তিনি। কাজী নজরুল ইসলামের খ্যাতি তখন আকাশসমান। হিজ মাস্টার ভয়েজে অন্য শিল্পীদের দিয়ে গান রেকর্ড করান। আমার সেই দৃশ্যটা এখনো মনে আছে। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন। দোতলায় গিয়ে বসলাম। এটা খুব সম্ভব ১৯৩৫-৩৬ সালের বা তার আগেকার কথা। আমার কিছু গল্পটল্প তখন বেরিয়েছে। তবে, *পরিত্যক্ত স্বামী* বের হয়েছে কি না, মনে নেই।

মু নূ ই : আপনি কখন গল্প লিখতে শুরু করেন?

আ জা শা : আমার প্রথম লেখা বের হয় ১৯৩৩ সালে। প্রথম প্রকাশিত আমার রচনাটা ছিল ইংরেজিতে লেখা। বের হয়েছিল ১৯৩২ সালে *স্টার অব ইন্ডিয়ায়*। পরে প্রকাশিত হয় বাংলা রচনা। প্রথম বের হয় একটা প্রবন্ধ। তারপর গল্প। আমার রচনা প্রকাশের শুরু ১৯৩৩ সাল থেকে। তার কিছুদিন পর কাজী নজরুল ইসলামের বাসায় যাই। কবি আবদুল কাদির[২৫] সাহেবের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। ঢাকায় নয়, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঢাকা থেকে কলকাতায় যাওয়ার পথে। তিনি আমাকে ওই বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। দৃশ্যটা মনে পড়ে। দোতলায় গিয়ে বসলাম। বসার পরই কিছু খাবার এল। মিষ্টি। কাজী বললেন, 'আমি আসছি।' নিচে থেকে তিনি সেজেগুজে এলেন। যখন এলেন, তখন তাঁর পরনে একটা সিল্কের পাঞ্জাবি ও ধুতি। মাথায় খদ্দরের টুপি এবং সারা গা থেকে বের হচ্ছে ভুরভুরানো সুগন্ধি। তিনি সুগন্ধি খুব ভালোবাসতেন। তাঁর তখন একটা গাড়ি ছিল। মোটরগাড়ি। আমাদের বললেন, 'চলো।' আমাদের তুললেন তাঁর গাড়িতে। ড্রাইভার চালিয়ে নিয়ে গেল।

পরে বললেন, 'আমি হিজ মাস্টার্স ভয়েসে নেমে যাব। তোমাদের ওই পর্যন্ত নিয়ে যাই।' তিনি ওখানে নামলেন। আমরা ওখান থেকে চলে আসি। এই হচ্ছে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি। পরবর্তী জীবনে তাঁকে আমরা আরও অনেক জায়গায় দেখেছি। দেখেছি *নবযুগ* পত্রিকায়। ১৯৪২ সালের দিকে পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক ছিলেন। আমিও কিছুদিন *নবযুগ*-এ চাকরি করেছি। তারপর দু-একটি বাসায় তাঁর সঙ্গে আমি সংগীতের জলসায় উপস্থিত ছিলাম।

যে কথা বলছিলাম, এই যে আমি কিছুটা মুক্তচিন্তা করতে সক্ষম হয়েছি, তার স্থলে রয়েছে নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে আমার মেলামেশার ফল। কাজী নজরুল

ইসলামের অনুপ্রেরণা এবং শেষ পর্যায়ে এসে এম এন রায়ের সঙ্গে পরিচয় আমাকে আলোকিত হতে সাহায্য করেছে। এম এন রায় যে *ইনডিপেনডেন্ট ইন্ডিয়া* বের করেছিলেন, আমি ছিলাম সেই পত্রিকার কলকাতা সংবাদদাতা। পরে *ডেইলি ভ্যানগার্ড* দিল্লি থেকে বের করতেন, তারও কলকাতা সংবাদদাতা ছিলাম আমি। এম এন দীন ছদ্মনামে আমি তাঁর পত্রিকা *ইনডিপেনডেন্ট ইন্ডিয়া*তে কিছু প্রবন্ধ লিখেছি। যখন এম এন রায় এখানে আসতেন, তাঁর সঙ্গে মাঝেমধ্যে কিছু আলাপ-আলোচনা হতো। তিনি যেসব রাজনৈতিক বক্তৃতা দিতেন, সেগুলো শুনতাম। লক্ষ্ণৌতে যুদ্ধের সময় একটা সম্মেলন হয়। র‍্যাডিকাল পার্টির ওই সম্মেলনে আমি যোগ দিয়েছিলাম। আমার মুক্তচিন্তা করতে পারার মূলে প্রধান অবদান রেখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। কবি বেনজীর আহমদও প্রথম দিকে বইপত্র দিয়ে সহায়তা করেছেন। আমার জীবনে কবি আবদুল কাদিরেরও প্রভূত অবদান রয়েছে। আর শেষের দিকে এসে আমার মানস গঠনে সাহায্য করেছেন এম এন রায়।

মুনমুই: আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ১৯২৮ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত যেসব রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছিল, সেগুলো আপনার ওপর কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিল? এ ব্যাপারে অবশ্য আপনি নিজের কথা বলেছেন। কিন্তু তখনকার কলকাতার বাসিন্দা আপনাদের বয়সী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা মোটামুটিভাবে কি একই ধরনের চিন্তাভাবনা করতেন, নাকি তাঁদের চিন্তা অন্য রকম কিছু ছিল?

আ জা শা: ১৯২৮ থেকে ১৯৩৩ সাল অবধি মেসে থেকেছি। ওই সময়, আমার ব্যক্তিগত ধারণা, আমি যাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, তাঁদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চিন্তা খুব বেশি একটা ছিল না। তাঁরা মুসলমান সমাজের উন্নতি কামনা করতেন। কিন্তু যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িকতা পরবর্তীকালে দেখা দিয়েছিল, তেমন কিছু ছিল না। তখনো পর্যন্ত বেশির ভাগ শিক্ষিত মুসলিম তরুণ ছিলেন কংগ্রেসপন্থী এবং ১৯৩৩ সালের আন্দোলনের সময় তাঁদের অনেকেই খদ্দর ধরেছিলেন। আমি নিজেও তখন খদ্দর ধরেছিলাম। সিগারেটের পরিবর্তে অনেকেই বিড়ি ধরেছিলেন।

ওই সময় রাজনৈতিক দিক থেকে, আমার মনে হয়, কংগ্রেসই সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল। সে সময় অবশ্য বামপন্থী রাজনীতিও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে। কমিউনিস্ট পার্টি স্বনামে না থাকলেও ছিল ছদ্মাবরণে। তার নাম ছিল 'ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া'। সে সময় আমাদের অনেকেই মুজফ্‌ফর আহমদ[২৬] সাহেবের সঙ্গে, যেমন আমি নিজেও, পরিচিত হয়েছিলাম। কাদির সাহেবই আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। মুজফ্‌ফর আহমদ, হালিম, মোমেন প্রমুখ ছিলেন ওই পার্টির, মানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা। এই সময় কাজকর্মের ভেতর দিয়ে তাঁরাও কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। এই সময় তাঁদের

উদ্যোগে অক্টারলনি মনুমেন্টের নিচে বড় বড় শ্রমিক-জমায়েত হতে দেখেছি। কাজেই মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে যে উৎকট সাম্প্রদায়িকতা, তার শুরুটা হয়েছিল ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর থেকেই। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৭ সালে ফজলুল হক সাহেব মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেই মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে বসলেন; যদিও তিনি কৃষক প্রজা পার্টি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। উৎকট সাম্প্রদায়িকতা বলতে গেলে তখন থেকেই শুরু হয়ে যায়। অর্থাৎ, ১৯৩৫ সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট সাম্প্রদায়িকতার উৎস হিসেবে কাজ করেছে। কারণ, ওই অ্যাক্টের মধ্যে সেপারেট ইলেক্টোরেট ও সিডিউলকাস্টদের জন্য বিশেষ আসন সংরক্ষণ-সংক্রান্ত ধারা ইত্যাদিই ছিল। আমার ধারণা, ১৯৩৫ সালের ওই কনস্টিটিউশন, অর্থাৎ ভারত শাসন আইনের মধ্যেই ভারত বিভাগের বীজ উপ্ত ছিল।

মু নূ ই : আপনার কলকাতার জীবন শুরু করেন সাংবাদিক হিসেবে। *আজাদ* পত্রিকা কীভাবে বের হয়, তার পেছনে কারা কারা ছিলেন? এবং ওই পত্রিকার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ কীভাবে হয়, সে সম্পর্কে যদি কিছু আলোকপাত করেন...।

আ জা শা : *আজাদ* পত্রিকা যখন বের হয়, অর্থাৎ তার প্রাথমিক উদ্যোগ-আয়োজনের সঙ্গে আমার কোনো ধরনের যোগাযোগ ছিল না। ফজলুল হক সাহেব যখন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন, তখন ওই মন্ত্রিসভায় নলিনী সরকারও[২৭] ছিলেন, অর্থমন্ত্রী তিনি। মওলানা আকরম খাঁ[২৮] সাহেব তো সারা জীবন কংগ্রেসই করতেন। পরবর্তীকালে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন। ওই সময় তিনি দরখাস্ত দিয়ে সরকারের কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা পান। তা-ই দিয়ে তিনি কাগজটা বের করেছিলেন। এটা ছিল একেবারেই অভিনব একটা ব্যাপার এবং সাংবাদিকতার জগতে বোধ হয় সচরাচর ঘটে না, এমন একটা ব্যাপার।

মু নূ ই : আপনার সাহিত্যচর্চার বিষয়ে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আমার যত দূর মনে হয়, আপনি প্রধানত ছোটগল্পই লিখেছেন, কিন্তু আপনার খ্যাতির সূচনা উপন্যাস *পরিত্যক্ত স্বামী* থেকে। আপনার ওই উপন্যাসে যে ধরনের ঘটনা তুলে ধরেছেন, সে ধরনের জীবনধারা মুসলমান সমাজে তখন ছিল না। এই উপন্যাস লেখার প্রেরণা বা ইচ্ছা আপনার কী করে হলো?

আ জা শা : ওই সময় আসলে খুব চিন্তাভাবনা করেটরে যে লেখালেখি শুরু করেছিলাম, সে কথা এখন আর খুব মনে পড়ে না। তবে ইবসেন আর বার্নার্ড শর বই-পুস্তক পড়ার প্রভাব যে আমার ওপর পড়েছিল, সে কথা অস্বীকার করা যাবে না এবং *পরিত্যক্ত স্বামী*তে বর্ণিত ঘটনার মতো ঘটনা যে ওই সময় সমাজে কিছু কিছু ঘটেনি, তা-ও নয়। তবে বুঝতেই পারেন, ওটা ছিল কাঁচা হাতের লেখা। আমি তো ঠিক ওই ধরনের সমাজের একজন ছিলাম না। কলকাতা আসলে কসমোপলিটন

সিটি। হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে যে ধরনের সমাজে বসবাস করত, ওই উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার মতো ঘটনা ঘটা সেখানে অসম্ভব কিছু ছিল না। আমি তো দূরে থেকে দেখেছি। বলতে পারি, তার সবটাই কল্পনা। ওই উপন্যাসে বাস্তব জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। বইটির খ্যাতির মূল কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, ওই সময় কোনো মুসলমান লেখকের কলম থেকে ও ধরনের কোনো বই লেখা হয়নি। হ্যাঁ, আপনাদের মতে দুঃসাহসিক লেখাই বলতে পারেন। তার পর থেকে তো লেখা চলতে থাকে। এই সময় আমার আরেকটা বই বের হয়। নাম ছিল *মুক্তি*। সেটা ছিল কিছুটা কাল্পনিক, কিছুটা দর্শননির্ভর। তার পর থেকে যত গল্প-উপন্যাস লিখেছি, প্রায় সব কটিই সজ্ঞানে, ভেবেচিন্তেই লিখেছি। লক্ষ্য-আদর্শহীন কোনো সাহিত্যে আমি বিশ্বাস করি না। 'আমি আর্ট ফর আর্টস সেক'-এ বিশ্বাস করি না। আমি বরং টলস্টয়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত। তিনি বলেছেন, যে সাহিত্যের পেছনে কোনো লক্ষ্যাদর্শ নেই, সেটা কোনো সাহিত্যই নয়। সে বিচারে আমি পরবর্তীকালে যা লিখেছি, অর্থাৎ *পদ্মা-মেঘনা-যমুনা* এমনকি তার পরও যতগুলো উপন্যাস বা গল্পের বই লিখেছি বা প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে আমার কিছু বক্তব্য, অর্থাৎ সামাজিক চিন্তাভাবনা, সমাজের লক্ষ্যাদর্শ কী হওয়া উচিত বা আমার কী লক্ষ্যাদর্শ, মোটামুটি তা আমার এসব সাহিত্যকর্মে স্থান পেয়েছে।

মু নূ ই : চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে রেনেসাঁ সোসাইটি হয়েছিল এবং তাদের একটা কনফারেন্সও হয়েছিল। সংগঠনটির সঙ্গে আপনি যুক্ত ছিলেন, এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

আ জা শা : ওটার নাম ছিল পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি। তার মিটিংয়ে আমি মাঝেমধ্যে যেতাম। একটা মিটিংয়ের কথা আমার মনে আছে। মুজীবর রহমান খাঁ[২৯] বোধ হয় ওটার সেক্রেটারি ছিলেন। একটা মিটিংয়ে আমি ছিলাম। আমাদের জহুরও (জহুর হোসেন চৌধুরী, দৈনিক *সংবাদ*-এর সম্পাদক) বোধ হয় উপস্থিত ছিল। তখন ড. সাদেক বলে অর্থনীতির একজন অধ্যাপক ছিলেন। তিনি অর্থনীতির ওপর একটা প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তান হলে টাকাকড়ির ব্যাপারে আমরা মোটেও আটকাব না। আমরা নিজেরাই সব নোট ছাপাব। এভাবে অর্থনীতিকে আমরা চাঙা করে তুলব। আমার মনে আছে, অর্থনীতির ছাত্র না হলেও আমি আগাগোড়া একজন স্বশিক্ষিত মানুষ ছিলাম। আমি জনাব সাদেকের ওই বক্তব্যের ব্যাপারে একটা বিতর্কের সৃষ্টি করেছিলাম। এটা যে একটা ফ্যান্টাস্টিক ননসেন্স ছিল, সে ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম। তর্ক-বিতর্কের সূচনা করেছিলাম। রেনেসাঁ সোসাইটির সভায় মাঝেমধ্যে প্রবন্ধ পড়া হতো। আমি কোনো কোনো মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতাম।

মু নূ ই : আপনি *আজাদ*-এ যোগ দিয়েছিলেন কখন?

আ জা শা : *আজাদ*-এ খুব সম্ভব ১৯৪১-৪২ সালের দিকে রাতের শিফটে সাব-এডিটর হিসেবে যোগ দিই। সার্বক্ষণিক নয়, খণ্ডকালীন হিসেবে। ঘণ্টা তিন-চার কাজ করতে হতো। আমার কাজ ছিল ইংরেজি থেকে বাংলায় সংবাদ অনুবাদ করা। পরবর্তীকালে আমি একই সঙ্গে তিন-চার জায়গায় কাজ করতাম। ১৯৪৩ সালের শেষ ভাগ সেটা। ভয়ানক দুর্ভিক্ষ চলছে তখন। কাজ করতাম *ইনডিপেনডেন্ট ইন্ডিয়া* ও *ভ্যানগার্ড*-এর কলকাতা প্রতিনিধি হিসেবে। ওরিয়েন্ট প্রেস অব ইন্ডিয়া নামে একটা নিউজ এজেন্সি ছিল, মুসলিম লীগেরই প্রতিষ্ঠান ছিল সেটা, সেখানেও আমি মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহর[৩০] সহকারী হিসেবে কাজ করতাম। আবার রাতের শিফটে, আগেই বলেছি, দৈনিক *আজাদ*-এ কাজ করতাম। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসের দিকে আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমি বিশ্রামের জন্য কিছুদিন গ্রামের বাড়িতে চলে যাই। এই সময় *আজাদ* পত্রিকার তরফ থেকে আমাকে চিঠি লিখে বলা হয়, 'আপনি চলে আসুন।' আমি ১৯৪৫ সালে আবার কলকাতায় চলে যাই। তখন তারা আমাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব দিল। তখন বোধ হয় *ইত্তেহাদ* বেরিয়েছে কি বেরোয়নি, আমার ঠিক মনে নেই। ১৯৪৬ সালের দিকেই বোধ হয় সেটা বের হয়।

যা-ই হোক, *আজাদ*-এর তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটরের প্রয়োজন ছিল। আমি বললাম, আমার শরীর এখনো খুব সুস্থ নয়। আমি তো স্থায়ীভাবে কলকাতায় থাকতে পারছি না। আরও কিছুদিন বিশ্রাম নিতে হবে। তখন *আজাদ* কর্তৃপক্ষ আমাকে প্রস্তাব দিল, 'আমরা ঢাকায় অফিস খুলছি। আপনাকে ঢাকা অফিসের দায়িত্ব দিচ্ছি। ঢাকার প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করছি। আপনি রাজি আছেন কি না?'

বলে দিলাম, ঠিক আছে। এটা আমার জন্য ভালোই হবে। ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি ঢাকায় এসে আমি *আজাদ*-এর স্থানীয় ঢাকা অফিস স্থাপন করি।

মু নূ ই : কোথায় ওটা হয়?

আ জা শা : তখন ঢাকায় বাড়ি পাওয়া মুশকিল ছিল। কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তখন শেষ অবস্থা। মার্কিন সেনারা তখনো এখানে আছে। এদিকে সর্বপ্রথম আমি ফুলবাড়িয়া রোডে একটা রুম ভাড়া নিই। মাসিক ভাড়া ১০ টাকা। অপ্রশস্ত রুম। খুবই অসুবিধা হতো কাজকর্ম করতে। পরে ওটা বদল করি। ইংলিশ রোডে ইয়ার মোহাম্মদ খানের কাছ থেকে একটা রুম নিই। সেখানেও খুব অসুবিধা হয়। পরে ইয়ার মোহাম্মদ খান কলতাবাজারে একটা বাড়ি করেন। সেই বাড়ির তিনটা কামরা ভাড়া নিয়ে অফিস এবং আমার থাকার ব্যবস্থা দুটোই একসঙ্গে করি। ১৯৪৬ সালের দিকে কলতাবাজারে অফিস খুলতে সক্ষম হই।

মু নূ ই : ঢাকেশ্বরী রোডে পরে যে *আজাদ* অফিস হলো, সেটা কীভাবে হলো? আপনি তো ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই জমি নেওয়া থেকে শুরু করে *আজাদ*

অফিস খোলা পর্যন্ত, যা কিছু ঘটেছে, তার একটা বিবরণ যদি দেন।

আ জা শা : এ ব্যাপারে আমি গোড়া থেকেই জড়িত ছিলাম। যখন পার্টিশন হয়ে গেল, তখন আমাকে মাঝেমধ্যে কলকাতা যেতে হতো। আজাদ কর্তৃপক্ষ একদিন আমাকে বলল, বিশেষভাবে মওলানা আকরম খাঁর বড় ছেলে সদরুল আনাম খাঁ ও মওলানা আকরম খাঁ নিজেও বললেন, 'আমরা ঢাকা থেকে কাগজ বের করব ঠিক করেছি। তুমি একটু চেষ্টা করো।' আমি এসে চেষ্টা করতে লাগলাম। নাজিমুদ্দিন সাহেব ছিলেন। নূরুল আমীন[৩১] সাহেব তখন খাদ্যমন্ত্রী। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে লাগলাম। কলকাতা থেকে *আজাদ* ঢাকায় আসুক, সে ব্যাপারে তাঁরা যে খুব একটা আগ্রহান্বিত ছিলেন, সে কথা বলা যায় না। হামিদুল হক চৌধুরীর তো আদৌ কোনো ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমরা কথাবার্তা চালিয়ে যেতে লাগলাম। এর মধ্যে আবার খায়রুল কবির[৩২] সাহেবকে আমার সঙ্গে কাজ করার জন্য ঢাকায় পাঠানো হলো। তিনি কলকাতায় *আজাদ*-এ যোগ দিয়েছিলেন। খায়রুল কবির ও আমি দুজন মিলে এখানকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা-চালাচালি করতে লাগলাম। এ ব্যাপারে নূরুল আমীন আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন এবং ওদিক থেকে খলিল মিয়া, অর্থাৎ সদরুল আনাম খাঁ, মওলানা আকরম খাঁর ছেলে, ওই সময় তিনিও প্রায়ই ঢাকায় আসতেন। শেষ পর্যন্ত পাঁচ বিঘা জমি লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকারের তরফ থেকে পাওয়া গেল। আমার যত দূর মনে পড়ে, প্রতি বিঘার তখন সেলামি ছিল চার কিংবা পাঁচ হাজার টাকা। এই সেলামি দিয়ে জমিটা লিজ নেওয়া হয়েছিল। লিজ নেওয়ার ওই সময়টায় মওলানা আকরম খাঁ কিছুদিন ঢাকায় ছিলেন। এসেছিলেন তিনি আমার কলতাবাজারের দোতলার বাসায়। ওই সময় আমাকে যেমন *আজাদ* পত্রিকার ঢাকার প্রতিনিধিত্ব করতে হতো, তেমনি পত্রিকাটির কার্যালয় প্রতিষ্ঠায় ইট-কাঠ সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে সব কাজই করতে হতো। তখন আমাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। মওলানা আকরম খাঁ শেষ পর্যন্ত আমার ডেরা থেকে চলে গিয়ে ঢাকেশ্বরী রোডে থাকতে লাগলেন। এই তো ঢাকায় *আজাদ* অফিস চালু হওয়ার ইতিহাস। আমরা তো ঠিক চাকরি করলেও, *আজাদ*-এর কর্মচারী হলেও ভূমিকাটা ছিল উদ্যোগীর। যেখানে কোনো পত্রিকাই নেই, সেখানে অন্তত একটা পত্রিকা প্রতিষ্ঠা লাভ করুক, এটাই ছিল আমাদের একমাত্র কামনা। এবং সেদিক থেকে যতটা শ্রম দেওয়া সম্ভব, আমি ও খায়রুল কবির দুজনই ঠিক ততটাই দিয়েছিলাম। এভাবেই এখানে *আজাদ* প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঢাকায় *আজাদ* প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমাকে পদ দেওয়া হলো সহকারী সম্পাদকের। খায়রুল কবির হলেন বার্তা সম্পাদক। কিন্তু আমার সঙ্গে *আজাদ*-এর বেশি দিন বনিবনা হলো না। ১৯৫০ সালের জুন মাসে আমার টাইফয়েড হয়। আমি তখন আগামসি লেনে থাকি। এক মাসের ছুটি নিয়েছিলাম। ছুটির পর এক মাসের

বেতন পাওনা ছিল। বেতনটা চেয়েছিলাম। তারা সেটা না দিয়ে চিঠি পাঠাল এই বলে যে ইয়োর সার্ভিস ইজ নো লংগার রিকোয়ার্ড। ফলে, খুবই দুরবস্থায় পড়ে যাই। সেদিন আমার হাতে মাত্র তিন আনা পয়সা ছিল।

সা আ : আপনার সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার কারণটা কী ছিল?

আ জা শা : বনিবনা না হওয়ার মূলে ছিল একটা অদ্ভুত ব্যাপার। এ সম্পর্কে অবশ্য তারা কখনোই কিছু বলেনি। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, মওলানা আকরম খাঁর যে ছোট ছেলে ছিল, সে ছিল একটু বাউন্ডুলে ধরনের। মওলানা আকরম খাঁর স্বাক্ষরে (কলতাবাজারের আমার বাসায় তখন ওই ছেলে থাকত) চেকের টাকা ভাঙানো হতো। চেক বইটা বোধ হয় নিচের অফিসরুমে ছিল। হঠাৎ একদিন দেখি, একটা চেক নেই, চেকের পৃষ্ঠাও কম। আমি সাংঘাতিকভাবে ভয় পেয়ে গেলাম। ব্যাপারটা অনতিবিলম্বে আমি ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়াকে জানালাম। ওখানেই ছিল মওলানা আকরম খাঁর অ্যাকাউন্ট। আমি ওখানে টেলিফোন করে বললাম, 'একটা চেক দেখছি না। আপনারা ওই চেকের এগেনেস্টে কোনো পেমেন্ট করবেন না।' মওলানা আকরম খাঁকেও বললাম, 'আপনি কি কোনো চেক সই করেছেন?'

তিনি জানালেন, না।

পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, আসলে তাঁর ছোট ছেলেটাই মওলানা আকরম খাঁর স্বাক্ষর জাল করে চেকটা নিয়ে গেছে।

আমি খুব ক্ষুব্ধ হলাম। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আমি ছেলেটাকে গালমন্দ করার একপর্যায়ে তাকে বোধ হয় এ কথা বলেছিলাম, তোমাকে চড় মারা দরকার। তবে মুখে বললেও চড়টা মারা হয়নি। কথাটি বোধ হয় মওলানা আকরম খাঁকে জানানো হয়েছিল। একজন কর্মচারী তার মনিবের ছেলেকে, সে যত অপরাধই করুক না কেন, তার সঙ্গে এ রকম আচরণ করবে, এটা তো সহ্য করার কথা নয়। পরবর্তীকালে *আজাদ* যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এবং তাদের কাছে আমার চাকরি বা সেবার কোনো প্রয়োজন আর থাকল না এবং আমিও তাদের সামনাসামনি নেই, টাইফয়েডে শয্যাশায়ী, এই সুযোগের সদ্ব্যবহারটাই করা হলো। ওই যে মওলানার ছেলেকে একদিন অপমান করেছিলাম, আমাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়ে বোধ হয় তারই প্রতিশোধ গ্রহণ করা হলো। অবশ্য আমি একা ছিলাম না। মোহাম্মদ মোদাব্বেরও চাকরি পায়নি ওখানে। পরবর্তীকালে আবুল কালাম শামসুদ্দীনও বিতাড়িত হয়েছিলেন। চাকর-মনিবের সম্পর্ক এ রকমই হয়।

মু নূ ই : আপনি বললেন যে *আজাদ* যখন প্রথম ঢাকায় আসে, অর্থাৎ কলকাতা থেকে তার চলে আসার কথা হয়, তখন নাজিমুদ্দিন সাহেব, হামিদুল হক চৌধুরী খুব পক্ষে ছিলেন না। আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, কলকাতাকেন্দ্রিক মুসলিম লীগ

পার্লামেন্টারি পার্টির যে রাজনীতি ছিল, সেখানে তো একদিকে ছিলেন হামিদুল হক চৌধুরী, মওলানা আকরম খাঁ, নাজিমুদ্দিন, মোহন মিয়া প্রমুখ এবং অন্যদিকে ছিলেন সোহরাওয়ার্দী সাহেব, আবুল হাশিম সাহেব প্রমুখ। তাহলে *আজাদ* পত্রিকাকে ঢাকায় আনতে তাঁরা আপত্তি করছিলেন কেন?

আ জা শা : তাঁদের এই আপত্তির পেছনে একটা মনস্তাত্ত্বিক কারণ ছিল বলে আমি মনে করি। মওলানা আকরম খাঁ পশ্চিম বাংলার লোক। মুসলিম লীগের কাগজ নিয়ে এখানে (কাগজ তো একটা বড় অস্ত্র) এসে তাঁদের ওপর প্রভুত্ব করবেন, এটা বোধ হয় তাঁরা চাননি। মোহন মিয়া চাননি। হামিদুল হক চৌধুরীও চাননি। নাজিমুদ্দিনও চাননি। মুখে কিন্তু বলেছেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসা দরকার। কিন্তু তাদের দীর্ঘসূত্রতা থেকে আমাদের মনে হয়েছে, ব্যাপারটা তাঁরা চাননি। তবে নূরুল আমীন সাহেব এ ব্যাপারে একটু স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁদেরই দলের লোক। কিন্তু তিনি কেন জানি না, *আজাদ*কে ঢাকায় আনার ব্যাপারে একটু বেশিই সহানুভূতিশীল ছিলেন। প্রধানত নূরুল আমীনের চেষ্টাতেই *আজাদ*-এর জন্য জমিটা পাওয়া গিয়েছিল।

মু নূ ই : আপনি রাজনৈতিক দিক থেকে এম এন রায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আর লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে *আজাদ* সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষপাতী হয়ে গেল। *আজাদই* এই আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। তখন এখানকার *আজাদ* অফিসে তার প্রাথমিক অবস্থায় সাব-এডিটর, পরে অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটরের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে আপনি অ্যাডজাস্ট করেছিলেন কীভাবে?

আ জা শা : অ্যাডজাস্ট করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটা কাজ করেছে, সেটা হচ্ছে মওলানা আকরম খাঁ সরাসরি তাঁর নিজস্ব সম্পাদকীয় বা লেখাগুলো লিখে দিতেন। আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবকে ওপরে ডেকে নিয়ে গিয়ে হয়তো কখনো আলোচনা করতেন। কিন্তু একটা লেখার ওপর ডাইরেক্টলি হস্তক্ষেপ তিনি করতেন না। আমি যখন সম্পাদকীয় লিখতাম, আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেব সেগুলো দেখে দিতেন। মুসলিম লীগের পয়েন্ট অব ভিউ থেকেই সবকিছু লেখা হতো। তবে তার মধ্যে যতখানি সম্ভব, আমি নিজে একটু র‍্যাডিক্যাল মনোভাব বা যুক্তিনির্ভর সম্পাদকীয় লেখার চেষ্টা করতাম। একটা ঘটনার কথা আমার মনে আছে। আমি একটা সম্পাদকীয় লিখেছিলাম। আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেব সেটা পাস করে দিয়েছিলেন। ছাপাও হয়ে গিয়েছিল। সম্পাদকীয়টা যখন লিখেছিলাম, তখন একটা ব্যাপার ভয়ানকভাবে চলছিল, মুসলিম লীগের তথাকথিত কর্মীদের গুন্ডামি ও দুর্নীতি তখন প্রায় আকাশচুম্বী। ঢাকায়ও চুরিচামারি, দুর্নীতি ইত্যাদি আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে এ রকমের একটা ধারণা ছিল যে দুর্নীতিবাজ আর চোর-বাটপার মুসলিম লীগারদের

ধরে নিয়ে চালান দেওয়া হলো, কিন্তু থানাওয়ালাদের বলে-কয়ে, তদবির করে মুসলিম লীগের নেতারা তাঁদের কর্মী বলে বের করে আনতেন। এ সম্পর্কেই তখন আমি একটা কড়া এডিটোরিয়াল লিখেছিলাম, সেটা ছাপাও হয়েছিল।

ছাপা হওয়ার পর ব্যস, আর কোনো কথা নেই, বোধ হয় সৈয়দ আবদুস সেলিম বা সাহেব আলমসহ ঢাকার মুসলিম লীগের আরও জনপ্রিয় নেতা মওলানা আকরম খাঁর কাছে অভিযোগ নিয়ে যান। তিনি ব্যাপারটাকে তাঁর গ্রাহ্যের মধ্যে নেন। আমাকে ডেকে একটা কথা বলেছিলেন তিনি। বেশি কিছু বলেননি, কেবল বলেছিলেন, 'তুমি একটা সাদাসিধে লোক।' এর বেশি কোনো মন্তব্য তিনি করেননি। বলেছিলেন, 'এ ধরনের লেখাটেখা ঠিক নয়।'

এ ধরনের ব্যাপারস্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে তেমন একটা বনত না। তবে আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেব লিখতেন মুসলিম লীগের পয়েন্ট অব ভিউ থেকে। কিন্তু আমরা যারা তাঁর সহকারী ছিলাম, তাদের লেখার ওপর তিনি খুব বেশি একটা হাত দিতেন না। তবে তাঁর একটা কথা আমার এখনো মনে আছে। তিনি একদিন বলেছিলেন, আমার একটা লেখা প্রসঙ্গে যে, 'দেখেন, সাধারণ পাঠকসমাজেরও কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। তারাও নিজের ধরনে চিন্তাভাবনা করে থাকে। এ কথাটা মনে রেখেই লেখা লিখবেন এবং যতটা সম্ভব সংক্ষেপে লিখবেন। তাদের চিন্তাভাবনা করার সুযোগটাও রাখবেন।'

এভাবে কোনোমতে *আজাদ*-এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম। আসলে ওটা ছিল আমার চাকরি। এখনো তো একটাই যুক্তি। আজকের দিনেও একটাই যুক্তি, যাঁরা চাকরি করেন, তাঁরাও প্রোগ্রেসিভ। কিন্তু চাকরি করি বলেই হুকুম মানতে হয়।

মু নূ ই: বাস্তব কারণেই খাপ খাইয়ে নিতে হয়। আপনার কাছে শেষ প্রশ্ন, তেভাগা আন্দোলন[৩৩] যখন বাংলাদেশের বেশ কতগুলো জায়গায় শুরু হয়, সেই আন্দোলন যদি সফল হতো, তাহলে মুসলমান চাষিরাই উপকৃত হতেন বেশি। সে সময় তো আপনারা কলকাতায় ছিলেন। আন্দোলনটা দেখেছেন। ওই সময় *আজাদ* পত্রিকার ভূমিকা কী ছিল?

আ জা শা: আমি ঠিক তখন কলকাতায় ছিলাম না বোধ হয়। তেভাগা আন্দোলনটা বোধ হয় ১৯৪৪-৪৫ সালের আগে থেকেই শুরু হয়। শুরু হয় ছেচল্লিশ সন থেকে। তখন আমি ঢাকায়। কারণ, ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি *আজাদ*-এর এখানকার প্রতিনিধি হিসেবে আমি ঢাকায় চলে আসি। তেভাগা আন্দোলন আমাকে খুবই আকর্ষণ করত। তবে সেটা ব্যক্তিগতভাবে এবং আমি ওটার সমর্থকও ছিলাম। কিন্তু *আজাদ*-এর ভূমিকা বোধ হয়, আমার মনে যত দূর পড়ছে, সর্বতোভাবে তেভাগা আন্দোলনের এবং তাতে অংশগ্রহণকারী জনগণের বিরোধীই ছিল। তাদের তো একমাত্র পুঁজি ছিল ইসলাম। তবে কখনো কখনো

জনগণের কিছু দাবিদাওয়া তো সমর্থন করতেই হতো। সে রকমও তারা করত। আমার ঠিক এখনো এটা মনে পড়ছে না। তবে তেভাগা আন্দোলনকে তো সাংঘাতিকভাবে দমন করা হয়েছিল এবং রাজশাহী জেলে তো গুলি পর্যন্ত চালানো হয়েছিল। এতে অনেক লোকজনও মারা গিয়েছিল। তারপর হাজং-টংকদের নিয়ে মণি সিংহদের যেসব আন্দোলন, সেগুলোও সাংঘাতিকভাবে দমন করা হয়েছিল। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর তো সেই আন্দোলনকে আরও বেশি দমন করা হয়। অথচ এসবই ছিল জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন। কিন্তু সে বিচারে জনগণের অধিকার আদায়ের বিরোধী ছিল মুসলিম লীগ, সে জন্য তাদের প্রতিষ্ঠা হয়নি। মুসলিম লীগ তো জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত বিভাগ করেনি। তারা সেটা করেছিল মুসলমানরা যে আলাদা জাতি, সেটা প্রমাণ করার জন্য। তাদের মধ্যে কোনো শ্রেণী নেই, এ রকমটাই তারা ভাবত। মুসলমানরা আলাদা জাতি যখন, জাতি হলেই হলো। আর লিডারশিপ সম্পর্কে এডমান বার্ক বলেছিলেন, চার্চ ও অভিজাত শ্রেণীই হচ্ছে ন্যাচারাল রুলার। তো মুসলিম লীগও ছিল চার্চ ও রুলিং ক্লাসের প্রতিনিধি। মি. জিন্নাহ তো ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁরা দেশ শাসন করবেন। আলাদাভাবে লুটপাট করবেন। এই মনোভাব ছাড়া তো আর কোনো মনোভাব কোনো রকম হাই ফিলোসফি বা মতাদর্শ তাঁদের ছিল বলে আমার মনে হয় না।

মু নূ ই : আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আ জা শা : আপনাকেও ধন্যবাদ।

কপি অনুলিখন : রীতা ভৌমিক

তথ্যসূত্র :

১. ১৮৫৭ সালে ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে প্রধানত সিপাহিদের নেতৃত্বে যে ব্যাপক সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটে, তা-ই সিপাহি বিদ্রোহ নামে পরিচিত। একে ভারতের প্রথম স্বাধীনতাসংগ্রাম বলে অভিহিত করা হয়। সিপাহি বিদ্রোহের প্রথম সূচনা ঘটে পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে। ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ মঙ্গল পাণ্ডে তাঁর বন্দুকের গুলি ছুড়ে প্রথম সিপাহি বিদ্রোহের সূচনা করেন।

২. অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মক্কায় আবদুল ওয়াহাব নামক এক ধর্মীয় সংস্কারকের নেতৃত্বে যে আন্দোলন পরিচালিত হয়, তা-ই ওয়াহাবি আন্দোলন নামে পরিচিত। ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের সূত্রপাত করেন সৈয়দ আহম্মদ বেরলভী।

৩. মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ব্রিটিশবিরোধী প্রথম সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হচ্ছে অসহযোগ আন্দোলন। এর উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি ছিল সব বিদেশি পণ্য, বিদেশি খেতাব ও মাদকদ্রব্য বর্জন এবং বিদেশি শিক্ষাব্যবস্থা ও বিচারব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে সব ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করা, চরকায় সুতা কাটা, খদ্দর পরিধান করাসহ সব বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়া।

মুসলিম দুনিয়ার খলিফা হিসেবে বিবেচিত তুরস্কের খলিফা ও তুর্কি খিলাফতকে রক্ষার জন্য ১৯১৯ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানদের নেতৃত্বে ইংরেজবিরোধী যে আন্দোলন পরিচালিত হয়, তা-ই খিলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত।

৪. পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরের পূর্ব দিকে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক উদ্যানে জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল নিরস্ত্র জনতার ওপর ইংরেজ সরকারের একদল সেনা বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়, তা-ই ইতিহাসে 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' হত্যাকাণ্ড নামে পরিচিত।

৫. রাওলাট অ্যাক্ট হচ্ছে সন্ত্রাসবিরোধী একটি কঠোর আইন। ভারতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমনের জন্য এ আইনে নানা কঠোর ব্যবস্থার বিধান করা হয়।

৬. ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু (১৯০৩-১৯৫৯) একজন উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পী। পিতা জাইদুল হোসেনের কাছ থেকে বাঁশিতে তালিম নেন। এ ছাড়া সংগীত সম্পর্কে বিভিন্ন ওস্তাদ, যেমন রংপুরের ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খাঁ, মাতামহ জানে আলম চৌধুরী, ওস্তাদ নাসিরুদ্দীন খাঁ, ওস্তাদ কালে খাঁ, ওস্তাদ মঈজুদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ মসিত খাঁ, ওস্তাদ ওয়াজীর খাঁ, ওস্তাদ মোহাম্মদ আলী খাঁ, জব্দান বাঈ, ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ প্রমুখ ব্যক্তির কাছ থেকে সংগীতের ওপর বিভিন্ন তালিম গ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। অর্জন করেছেন সংগীতাঙ্গনের বিভিন্ন পুরস্কার।

৭. *শিখা* ১৯২৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক আবুল হুসেন ছিলেন *শিখা* পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদক। *শিখা* পত্রিকা বছরে একবার প্রকাশিত হতো। প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হয় চৈত্র ১৩৩৩ (৮ এপ্রিল ১৯২৭)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মোহাম্মদ আবদুর রশিদ ও আবুল ফজল। *শিখা* ছিল সমকালের অন্যান্য সাময়িকপত্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। মুসলিম সাহিত্য সমাজের সারা বছরের কর্মকাণ্ডের পরিচয় বহন করত *শিখা*। *শিখা*র প্রতিটি সংখ্যায় শিরোনামে 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব' কথাটি মুদ্রিত থাকত। পাঁচটি সংখ্যার পর এটি আর প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। *শিখা* মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র হলেও এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আবুল হুসেন।

৮. কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) একজন লেখক ও চিন্তাবিদ। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত *তরুণপত্র* পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন। ১৯২৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর অন্যতম নেতা। বিশ দশকে ঢাকায় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি একজন সজাগ বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও লেখক হিসেবে সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ে নিজের প্রজ্ঞা ও সংবেদনশীলতাকে সক্রিয় রেখেছিলেন।

৯. আবুল হুসেন (১৮৯৬-১৯৩৮) একজন চিন্তাবিদ ও প্রাবন্ধিক। বাংলার বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত ওয়াক্ফ আইনের মূল খসড়ার রচয়িতা। ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র *শিখা*র প্রথম বর্ষের সম্পাদক। একজন মননশীল ও যুক্তিনিষ্ঠ প্রাবন্ধিক হিসেবে খ্যাত।

১০. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) একজন ভাষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক ও শিক্ষাবিদ। তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি, *আল এসলাম* পত্রিকা, *বঙ্গীয় মুসলমান*

সাহিত্য পত্রিকাসহ বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগে শিক্ষকতা করেন। এ ছাড়া তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তিনি কিছুদিন বাংলা একাডেমী ও পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটিতেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ওপর বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। পেয়েছেন বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইমেরিটাস অধ্যাপক। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সম্পাদনা তাঁর জীবনের প্রধান একটি কাজ। বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ও প্রাচ্যের অন্যতম ভাষাবিজ্ঞানী। একজন খাঁটি বাঙালি ও ধর্মপ্রাণ মুসলমান। জাতীয় ও ধর্মীয় চেতনা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য : 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ রেখে দিয়েছেন যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।' ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে, না বাংলা হবে—এ বিতর্ক সৃষ্টি হলে তিনি জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

১১. উনিশ শতকের ষাটের দশকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সবচেয়ে দীর্ঘকাল ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হওয়া পত্রিকা হচ্ছে *ঢাকা প্রকাশ*। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালের ৭ মার্চ এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ব্রজসুন্দর মিত্র, দীনবন্ধু মৌলিক ও ঈশ্বরচন্দ্র বসু। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। পত্রিকাটি প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হতো।

১২. পুরান ঢাকার রোকনপুরের কাছে পাঁচ ভাইঘাট লেন অবস্থিত। একসময় এ লেনের মাথায় ছিল ধোলাই খাল। এ খালে স্থানীয় মহল্লার এক পরিবারের পাঁচ সন্তান একটি বাঁধানো ঘাট নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। সে থেকে এই নামে পরিচিতি পায়।

১৩. পুরান ঢাকার কুলুটোলার পাশেই কাগজীটোলার অবস্থান। ঢাকায় মোগলযুগে এই অঞ্চলে একসময় কাগজীরা বসবাস করত। মোগল দপ্তর, বিচার-আদালত ও বাণিজ্যিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ এই কাগজীরা হাতে তৈরি করত। ঢাকায় তাদের জন্য নির্ধারিত বাসস্থানটি কাগজীটোলা নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৪. জমিদার আগা বাকের খানের অন্যতম পুত্রের নামে নামকৃত একটি এলাকা। আগামসি আঠারো শতকের মাঝামাঝি ঢাকায় বাস করতেন এবং তিনি ঢাকায় শিয়া সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন।

১৫. মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) ভারতের জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতাসংগ্রামের একজন নেতা। গান্ধীজির রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয় দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ সরকারের নানা অন্যায়-অত্যাচার ও বিধিবিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। ১৯১৫ সাল থেকে তিনি স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাস করতে থাকেন। ১৯১৭ সালে তিনি ভারতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে গান্ধীজির নেতৃত্বে প্রথম জাতীয় আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এ সময় তিনি মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনকেও সমর্থন করেন। এ ছাড়া তিনি ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৩২ সালে তিনি আমরণ অনশন শুরু করেন। ১৯৪২ সালে গান্ধীজির নেতৃত্বে শুরু হয় ভারত ছাড় আন্দোলন। গান্ধীজির আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ও

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হয় এবং ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়।

১৬. চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫) ভারতের একজন জাতীয়তাবাদী নেতা। দেশের জন্য সর্বত্যাগী এই নেতা 'দেশবন্ধু' নামে সুপরিচিত। তিনি একজন কবি হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন ও কারাবরণ করেন। ১৯২২ সালে তিনি 'স্বরাজ্য দল' গঠন করেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠায় স্বরাজ্য দল চেষ্টা করে এবং এর ফলে ১৯২৩ সালে মুসলমানদের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় যা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে পরিচিত। রাজনীতিতে অতিরিক্ত ব্যস্ততা ও পরিশ্রমের ফলে চিত্তরঞ্জনের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে, যার কারণে অকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১৭. বেনজীর আহমদ (১৯০৩-১৯৮৩) একজন কবি। অল্প বয়সে স্কুল ত্যাগ করে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগদান। খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। দীর্ঘদিন কারাগারে অবরুদ্ধ জীবন কাটান। পরবর্তীকালে মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনে যোগদান করেন। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি *নওরোজ* পত্রিকা, *দৈনিক আজাদ* পত্রিকা ও *দৈনিক নবযুগ* পত্রিকায় কাজ করেন। তিনি একজন মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী কবি। কাব্যরীতির ক্ষেত্রে তিনি কাজী নজরুল ইসলামের অনুসারী।

১৮. আশরাফ আলী খান (১৯০১-১৯৩৯) একজন কবি ও সাংবাদিক। ছাত্র অবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৯২৭ সালে তিনি সাপ্তাহিক *বেদুইন* নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরবর্তী সময়ে ১৯২৮-১৯২৯ সালে *সোলতান* পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকায় যুব আন্দোলন, মসজিদ রক্ষা আন্দোলন ইত্যাদিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় *নও-জোয়ান* প্রকাশিত হয়। তিনি বিপ্লবের বেদনার ও সাম্যের কবি হিসেবে পরিচিত।

১৯. আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮) একজন সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ। কংগ্রেসের আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। *দৈনিক মোহাম্মদী* পত্রিকা, *সাপ্তাহিক মুসলিম জগৎ* ইংরেজি সাপ্তাহিক *দ্য মুসলমান*, নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত *সওগাত*, *দৈনিক আজাদ*, *দৈনিক জেহাদ* ও *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকায় কাজ করেন। ত্রিশের দশকে মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হন। পাকিস্তান আন্দোলন ও ভাষা আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননা। তিনি ছিলেন বাঙালি মুসলমান সমাজের সাংবাদিকতার অন্যতম পথিকৃৎ।

২০. চৌধুরী শামসুর রহমান (১৯০২-১৯৭৭) একজন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। তিনি *দৈনিক সুলতান*, *সাপ্তাহিক মুসলিম বাণী*, *সাপ্তাহিক হানাফী*, *বাংলার কথা*, *বেঙ্গল উইকলি*তে সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন। লিখেছেন জীবনী, উপন্যাস, গল্প, অনুবাদ সাহিত্য।

২১. ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে লন্ডনে ভারতে সংবিধান সংস্কার ও ভারতীয়দের দাবিদাওয়া নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ১৯৩০-৩২ সময়কালে যে আলোচনা হয়, তা গোলটেবিল বৈঠক নামে পরিচিত। লন্ডনে মোট তিনটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকগুলোর সব সিদ্ধান্ত ও আলোচ্য বিষয় ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে শ্বেতপত্র আকারে প্রকাশ করে।

২২. মাস্টারদা সূর্য সেন (১৮৯৩-১৯৩৪) একজন বিপ্লবী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে চট্টগ্রামে

গোপন বিপ্লবী দল সংগঠনের কাজ শুরু করেন। যুগান্তর দলের সঙ্গে সংযোগের মাধ্যমে গোপন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও জালালাবাদ পাহাড়ে সংঘটিত যুদ্ধে নেতৃত্বদান। তারপর পলাতক জীবন। ১৯৩৩ সালে আত্মগোপনরত অবস্থায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য সূর্য সেন নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

২৩ মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪) ব্রিটিশ ভারতের বিপ্লবী ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতা। বাঘা যতীনের সহকর্মী হিসেবে গুপ্ত সংগঠন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এরপর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার কাজে লিপ্ত হন। ১৯১৪ সালে ইংরেজদের প্রধান শত্রু জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। গোপন কার্যক্রমের জন্য ছদ্মনামে বাটাভিয়া, ফিলিপাইন, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। আমেরিকার র‍্যাডিক্যালদের প্রভাবে মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী হন এবং সোশ্যালিস্ট ভ্রাতৃসংঘের প্রথম ভারতীয় সদস্য হন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থার বিশিষ্ট সদস্য এবং বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠিত এই সংস্থার বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বের ১৭টি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা আনুমানিক ৬৭।

২৪. আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) একজন সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। তিনি সাপ্তাহিক *সোলতান*, সাপ্তাহিক *মোহাম্মদী*, *দ্য মুসলমান* পত্রিকা, *দৈনিক কৃষক* পত্রিকা, *দৈনিক ইত্তেহাদ* পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি কংগ্রেসের আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন, মুসলিম লীগের রাজনীতি ও আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির প্রণেতা। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় থেকে সুযোগ্য রাজনীতিবিদ হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনীতির আদর্শের অনুসারী ও তাঁর একজন নিষ্ঠাবান ভক্ত। দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও পূর্ব বাংলার স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে আপসহীন ভূমিকা পালন করেন। রচনা করেছেন গল্প, প্রবন্ধ, ব্যঙ্গ রচনা, শিশুসাহিত্য, স্মৃতিকথা ও আত্মকথা।

২৫. আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪) একজন কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক, ছান্দসিক ও সম্পাদক। তিনি *সওগাত*, মাসিক পত্রিকা *জয়তী*, *নবশক্তি*, *যুগান্তর*, *নবযুগ*, *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী*, অর্ধসাপ্তাহিক *পয়গাম*, মাসিক *মাহে নও* পত্রিকায় দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেন। মুসলিম সাহিত্য সমাজের নেতৃত্বে ঢাকায় যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন হয় তার তিনি অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি বার্ষিক *শিখা* পত্রিকার প্রকাশক ও লেখক। রচনা করেছেন বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম। পেয়েছেন বিভিন্ন সম্মাননা ও পদক।

২৬. মুজফ্‌ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩) একজন রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও লেখক। ১৯১৮ সালে কলকাতায় রাজনীতি, সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেন। *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য* পত্রিকা, সান্ধ্য দৈনিক *নবযুগ*, সাপ্তাহিক *ধূমকেতু*, *গণবাণী* পত্রিকা, সাপ্তাহিক *গণশক্তি*, *দৈনিক স্বাধীনতা* ইত্যাদি পত্রিকায় সম্পাদক ও সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। এরপর বিভিন্ন সময় কারাবরণ করেন। ১৯৪০-৪২ সময়কালীন আত্মগোপনে থেকে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব দেন। চীন ও রাশিয়ার আদর্শগত দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হলে তিনি সিপিএমের পক্ষাবলম্বন করেন। রচনা করেছেন স্মৃতিকথা ও আত্মজীবনী। কৃষক শ্রমিক

তথা সমাজের সাধারণ মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে সারা জীবন আপসহীন সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন।

২৭. নলিনীরঞ্জন সরকার (১৮৮২-১৯৫০) একজন অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ। শিক্ষাজীবন শেষ করে ১৯১১ সালে যোগ দেন হিন্দুস্তান কো-অপারেটিভ ইনস্যুরেন্স সোসাইটিতে। ১৯২৩-২৮ সাল পর্যন্ত স্বরাজ পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, কলকাতা করপোরেশনে ও সর্বভারতীয় বণিক সভায় দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৭ সালে এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত বঙ্গীয় সরকারের মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৪৯ পর্যন্ত রাজনৈতিক জীবনে বহুবার বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২৮. মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) একজন সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। পড়াশোনার পাট শেষ করার পর তাঁর সম্পাদনায় মাসিক *মোহাম্মদী* পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এ ছাড়া তিনি মাসিক *আল এসলাম*, মাসিক *মোহাম্মদী*, দৈনিক *আজাদ*-এ সাংবাদিকতা করেন। একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। আকরম খাঁ বাংলা গদ্য সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট শিল্পী। একই সঙ্গে তিনি রাজনীতি, ধর্ম ও সমাজচিন্তামূলক গ্রন্থ রচনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। অবিভক্ত বঙ্গে মুসলিম জাগরণের আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের সাংবাদিকতার পথিকৃৎ ছিলেন।

২৯. মুজীবর রহমান খাঁ (১৯১০-১৯৮৪) একজন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। ১৯৩৯-১৯৬৫ পর্যন্ত দৈনিক *আজাদ* পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। কলকাতার *সাপ্তাহিক কমরেড*, ঢাকার মাসিক *মোহাম্মদী*, দৈনিক *পয়গাম*, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি, পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন একাধিক সম্মাননা।

৩০. মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ (১৯০৭-১৯৭৮) একজন সাংবাদিক ও লেখক। আর্থিক সংকটের কারণে কলেজের পাঠ ত্যাগ করে রেঙ্গুনের *ডেইলি নিউজ*-এর ক্যাজুয়াল রিপোর্টার হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে কলকাতার *স্টার অব ইন্ডিয়া*, দৈনিক *আজাদ*, দৈনিক *ইত্তেহাদ* পত্রিকায় কাজ করেন। ছাত্র অবস্থায় কংগ্রেসের রাজনীতি করলেও পরবর্তী সময়ে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন। লালকোর্তা ছদ্মনামে তিনি পত্রপত্রিকায় সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ও লেখালেখি করতেন।

৩১. নূরুল আমীন (১৮৯৩-১৯৭৪) একজন রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বিরোধিতা করেন। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন শুরুর আগ পর্যন্ত মুসলিম লীগের রাজনীতির একজন বিশিষ্ট নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে আইয়ুব সরকারের অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট হন। ১৯৬৯ সালে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যু পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।

৩২. খায়রুল কবির (১৯২১-১৯৯৭) একজন সাংবাদিক ও ব্যাংকার। কর্মজীবনে দৈনিক *আজাদ*, পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েট প্রেস, দৈনিক *জিন্দেগী*, দৈনিক *সংবাদ*, পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়, বার্তা সংস্থা এপিপি, ইউনাইটেড ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, সিটি ব্যাংক ও ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। একজন সাংবাদিক ও ব্যাংক-বিমা ব্যবসায়ের অগ্রকর্মী ছিলেন। ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাব স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

৩৩. তেভাগা আন্দোলন বাংলার ইতিহাসের একটি কৃষক আন্দোলন। ১৯৪৬ সালে বাংলার রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহসহ উত্তরবঙ্গে এ কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। তেভাগা আন্দোলনের মূল দাবি ছিল উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পাবেন চাষি এবং এক ভাগ পাবেন মালিক। তেভাগা আন্দোলনের মূল দাবি ছিল 'জান দেব তবু ধান দেব না'।

বই আলোচনা

মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর কথোপকথন

মুনির-উজ-জামান

মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর কথোপকথন, এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান ও এস আর মির্জা, প্রথমা, ঢাকা ২০১১।

ব্রিটিশ ও মার্ক্সবাদী ইতিহাসবিদ এরিক হবস্‌বম বর্তমান অথবা সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস রচনায় বিড়ম্বনার ওপর তাঁর রচিত *অন হিস্ট্রি* গ্রন্থের একাংশে (পরিচ্ছেদ ১৮, ২১) আলোকপাত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। ১৯৪৪ সালে নাৎসি বাহিনী ইতালি থেকে পশ্চাদপসরণের সময় আরেজ্জো প্রদেশের সিভিটেলা গ্রামের ১৭৫ জন যুবাপুরুষকে হত্যা করে এবং তাদের মৃতদেহগুলো পুড়িয়ে ফেলে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৫০ বছর পর ১৯৯৪ সালে নাৎসি হিংস্রতার স্মরণে ইউরোপীয় ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের যে অধিবেশন হয়, সেখানে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে।

জার্মান ইতিহাসবিদেরা বিব্রত বোধ করলেন। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীও ওই অঞ্চলে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে একজন ইতিহাসবিদ দাবি করলেন। রুশ প্রতিনিধিরা মনে করলেন যে সম্পূর্ণ অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য হলো, স্টালিন আমলের ভীতিকর ব্যবস্থা থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া। স্থানীয় জনসাধারণ, যাদের অনেকেই নাৎসি হত্যাকাণ্ডের চাক্ষুষ দর্শক এবং জীবিত, তাদের মধ্যেও ঘটনার মৌখিক বর্ণনায় পার্থক্য দেখা দিল। দক্ষিণপন্থী ক্যাথলিক অধিবাসীদের বর্ণনা নাৎসি প্রতিরোধকারী বামপন্থীদের বর্ণনা থেকে বেশ ভিন্ন। একই ঘটনা, কিন্তু তার বর্ণনা ও মূল্যায়ন ভিন্ন। যাঁরা গ্রামবাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও আলোচনার মাধ্যমে ঘটনা সম্পর্কে অধিবেশনে উপস্থিতির জন্য তথ্য সংগ্রহ করছিলেন, তাঁদের জন্য একটি বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হলো।

বর্তমান কালের ইতিহাস রচনায় এরূপ বিভ্রাট সম্পূর্ণ নতুন নয়। একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে সম্রাট আকবরের রাজনীতি ও প্রশাসনব্যবস্থা নিয়ে ইতিহাস-রচয়িতা বদাউনি ও সুপণ্ডিত আবুল ফজলের পরস্পরবিরোধী মতামত। ইতিহাস রচনায় সমস্যার সৃষ্টি হয় তখনই, যখন সাম্প্রতিক ঘটনার মূল্যায়নে ইতিহাস-রচয়িতা অথবা বর্ণনাকারী তাঁর নিজস্ব সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে পক্ষপাতহীন হতে পারেন না। তাঁরা ইতিহাস রচনায় আংশিক অথবা অসম্পূর্ণ তথ্যের ওপর কিছু কল্পনা এবং নিজস্ব মতের সংযোগ করেন। তাঁদের রচনাকে 'সংযোজক ইতিহাস' বলা যেতে পারে। অন্য পক্ষে যাঁরা প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে রচনা করেন, তাঁদের রচনাকে বস্তুনিষ্ঠ 'প্রামাণ্য ইতিহাস' বলাই সংগত হবে। শেষ পর্যন্ত সিভিটেলার হত্যাকাণ্ডের ওপর অধিবেশন সফলভাবে সমাপ্ত হলো, কেননা ইতিহাসবিদেরা তথ্যের প্রমাণযোগ্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতার ওপর তাঁদের অঙ্গীকার দৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করেছিলেন।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর সমাজ ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটনাবহুল হলেও তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও গবেষণামূলক ইতিহাস রচনার কাজ খুব বেশি অগ্রসর হয়নি। এর শুধু একটি ব্যতিক্রম এবং তা হলো, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা, তাঁদের কেউ কেউ আংশিক ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্বল করে কিছু কিছু বই লিখেছেন। মরহুম হাসান হাফিজুর রহমান গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করে সরকারি সাহায্যে পুস্তক আকারে প্রকাশ করেছেন। সাম্প্রতিক কালে মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের একটি মূল্যবান কাজ হলো, যুদ্ধ সম্পর্কে যাঁদের ব্যক্তিগত ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁদের 'মৌখিক বর্ণনা' মোট ২২ খণ্ডে প্রকাশ করা। ভবিষ্যতে ইতিহাসবেত্তাদের জন্য এসব বর্ণনা মৌলিক তথ্য হিসেবে গৃহীত হবে, কিন্তু যতক্ষণ প্রমাণের কষ্টিপাথরে তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা নির্ণয় না করা হচ্ছে, ততক্ষণ বর্ণনা শুধু বর্ণনাই, ইতিহাস নয়।

সত্যতা যাচাই না করে অথবা দুর্বল বর্ণনার ভিত্তিতে বক্তব্য রাখার প্রবণতা কিছুটা উৎকৃষ্টতর গ্রন্থেও দেখা যায়। যেমন বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত *হিস্ট্রি অব বাংলাদেশ*-এর প্রথম খণ্ডের ২০ নম্বর পরিচ্ছেদে (৬২২ নম্বর পৃষ্ঠা) বলা হচ্ছে, 'Moment before he was incarcerated, Mujib, the Bangabandhu, proclaimed Bangladesh as a sovereign, independent nation...' কিন্তু ২১ নম্বর অধ্যায়ে (৬৩৪ পৃ.) বলা হয়েছে :

'I major Zia provisional commander-in-chief of the Bangladesh Liberation Army hereby proclaim on behalf of our great national leader Sheikh Mujbur Rahman, the independence of Bangladesh.' সম্পূর্ণ

অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং দেখা যায় যে আইনসমর্থিত ও গঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রতি ও গণহত্যার বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীর সমর্থনের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। মেজর জিয়ার ঘোষণার আগের দিনে একই বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের নেতা আবদুল হান্নানের দেওয়া একটি ভাষণ উল্লেখ করে পাদটীকায় বলা হয়েছে, বেতার কেন্দ্রের ট্রান্সমিটারের সীমিত ক্ষমতার কারণে অনেকেই হান্নান সাহেবের ভাষণ শুনতে পারেননি। অবশ্য পরের দিন জিয়ার ভাষণ অনেকেই শুনেছেন।

একই গ্রন্থের দুই ভিন্ন অধ্যায়ে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য রচনার মানকে নিষ্প্রভ করে। দুই অধ্যায়ের রচনাকার ভিন্ন। গ্রন্থের সম্পাদক ইতিহাসবিদ সিরাজুল ইসলামের পাণ্ডিত্যের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে বলব যে তিনি তাঁর পূর্বসূরি *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*-এর সম্পাদক ড. আর সি মজুমদার এবং দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদক স্যার যদুনাথ সরকারের পথ অবলম্বন করে কিঞ্চিৎ শক্ত হাতে ইতিহাস রচনার মূল শৃঙ্খলা, অর্থাৎ প্রমাণযোগ্য বস্তুনিষ্ঠতা প্রয়োগ করতেন, তাহলে এই ইতিহাসবিভ্রাট ঘটত না।

মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কালের রচনায় সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে এই শাস্ত্রচর্চার বিকৃত রাজনৈতিকীকরণ। আমার নেতার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে হলে ওদের নেতাকে খাটো করতে হবে, তাঁর কর্মকাণ্ডকে মসীলিপ্ত করতে হবে—এই হলো ইতিহাসের অতি রাজনৈতিকীকরণের আশ্রয়বাক্য। 'ওই কবরে অমুক নেতার লাশ নেই', 'উনি আবার কবে মুক্তিযুদ্ধ করলেন?' এই ধরনের উদ্ভট উক্তি উচ্চপর্যায়ে অহরহ ব্যক্ত হচ্ছে। মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে কোনো রাজনৈতিক পয়েন্ট অর্জন করা যায় না, কোনো নেতাকে শ্রেষ্ঠতর করা যায় না, কোনো জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করা যায় না, প্রামাণ্য ইতিহাস তো একেবারেই না।

এই লালিত্যহীন ধূম্রজালে আবদ্ধ বোধশক্তির দশকে সেদিন একটি বই পড়লাম ও চমৎকৃত হলাম। বইয়ের নাম *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর কথোপকথন*, লেখক ও কথক তিনজন—এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার (মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উপপ্রধান, বর্তমানে সরকারের মন্ত্রী), মঈদুল হাসান (প্রবাসী বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী, প্রাক্তন সাংবাদিক ও *মূল ধারা '৭১*-এর লেখক) এবং পাকিস্তান বিমানবাহিনীর সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গঠিত যুবশিবিরের মহাপরিচালক এস আর মির্জা। তাঁদের প্রত্যেকেই প্রবাসী সরকারের নীতিনির্ধারণসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

এই তিন প্রত্যক্ষদর্শকের যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে লিখিত বইটির রচনাশৈলী কিছুটা প্লেটোর *ডায়লগ* স্মরণ করিয়ে দেয়। তফাত প্রধানত দুটি : আলোচনার বস্তু

কোনো তাত্ত্বিক বিষয় নয়, যেমন নৈতিক বিশুদ্ধতা অথবা আদর্শ রাষ্ট্র। কথোপকথনের বিষয়বস্তু হলো, মুক্তিযুদ্ধের সময় কোনো ঘটনা, ব্যক্তিগত অবস্থান বা সমষ্টিগত কর্মকাণ্ড এবং তার অন্তর্নিহিত কারণগুলো অভিজ্ঞতা ও যুক্তির মাধ্যমে অনুসন্ধান করা। দুই নম্বর পার্থক্য হলো, কথোপকথনে কোনো প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে সত্য নিরূপণের প্রচেষ্টা নেই। যা আছে তা হলো, ১০টি অধ্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে এবং বেশির ভাগ বিষয়ই তিন কথকের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বাইরে নয়। তাঁরা একেকটি বিষয়ের ওপর আলোচনা করেছেন, ক্ষেত্রবিশেষে নতুন তথ্য ও ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন এবং এভাবে পরস্পরের মতামতকে কিছুটা সংশোধিত অথবা পরিবর্ধন করেছেন। যার ফলে বেশ কিছু বিষয়ের অন্তর্নিহিত কারণ আগে অজ্ঞাত থাকলেও পরে দৃশ্যমান হয়েছে। তথ্য ও যুক্তিনির্ভর এই পন্থা অনুসরণের ফলে প্রতিটি আলোচিত বিষয়ে একটি গ্রহণযোগ্য উপসংহারে আসা সম্ভবপর হয়েছে।

কথোপকথনে ১০টি অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে। বেশ কয়েকটি অধ্যায়ের তথ্যপ্রমাণ ও বক্তব্য যেকোনো পর্যালোচনায় অগ্রাধিকারের দাবি রাখে। বিষয়গুলো নিম্নরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়।

১. দিকনির্দেশনায় রাজনৈতিক দোলাচল
২. প্রতিরোধ ও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ের অগ্রগতি
৩. তাজউদ্দীনের আংশিক মূল্যায়ন
৪. মুজিব বাহিনী

দিকনির্দেশনায় রাজনৈতিক দোলাচল

১৯৭১ সালের ১ মার্চ পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের এক ঘোষণায় পূর্বনির্ধারিত জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। সম্ভবত ১৮ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের এক বৈঠকে ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের গণভোটে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে তাঁর অনিচ্ছা উল্লেখ করেন। এর পরপরই পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই প্রক্রিয়া উদ্বেগের সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্য এবং অন্যরা লক্ষ করেন।[১] এই প্রক্রিয়া সেনাবাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তা ও অন্যরা আওয়ামী লীগ নেতাদের কাছে পৌঁছে দেন। প্রতিদিন সৈন্য বৃদ্ধি যে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই করা হচ্ছে, এ নিয়ে কারও মনে দ্বিধা ছিল না। মঈদুল হাসান শেখ মুজিবের সঙ্গে মেজর মসিহ-উদ-দৌলার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করেন এবং পাকিস্তানিদের ঠেকাতে একটি Pre-emptive

strike-এর কথাও উল্লেখ করলেন। যেহেতু মার্চ মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে বাঙালি সেনারা সংখ্যায় বেশি, সে কারণে সময়মতো প্রথমেই আঘাত করলে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল, এ কথা বাঙালি অফিসাররা বিশ্বাস করতেন। এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকারও এ কথা বলেছেন।

শেখ মুজিব মঈদুল হাসানের কথা শুনে নিজে কিছু না বলে, তাজউদ্দীনের সঙ্গে কথা বলতে বললেন, অর্থাৎ বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন। পাকিস্তানি সেনাদের দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি (যার একটিই অর্থ হতে পারে) সত্ত্বেও সিদ্ধান্তে তাঁর এই অনীহা কেন? এর দুটি কারণ হতে পারে। এক. পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি ও সামরিক জান্তার চাপ এবং অপর দিকে ছাত্রলীগ ও তরুণ কর্মীদের আপসহীন চাপ—এই দুই চাপ মিলে কোনো সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষে এক ধরনের বাধার সৃষ্টি করেছিল। দুই. ছয় দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন আদায়ের অঙ্গীকারে শেখ মুজিব নির্বাচিত হয়েছেন। তখনো পর্যন্ত এই অঙ্গীকারে তিনি বিশ্বাসী। মঈদুল হাসান ৭ মার্চের বক্তব্যের তাৎপর্যের ওপর কিছুটা আলোচনা করেছেন। 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', এই উক্তি থাকলেও ওই ভাষণের মূল বক্তব্য হচ্ছে তিনটি শর্ত সাপেক্ষে : ১. সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার, ২. সামরিক আইন প্রত্যাহার ও ৩. সেনাবাহিনী কর্তৃক হত্যা ও নির্যাতনের ক্ষতিপূরণ। এসব শর্তে সংসদের অধিবেশনে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ, অর্থাৎ অহিংস ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন আদায়। 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করা যায়। পূর্ণ স্বাধীনতা থেকে স্বায়ত্তশাসনের সীমিত স্বাধীনতা, সব সম্ভাবনাই বিভিন্ন অর্থে বিদ্যমান। তবে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং শর্ত সাপেক্ষে সংসদ অধিবেশনে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ পরস্পরবিরোধী অবস্থান।

মঈদুল হাসান প্রশ্ন রেখেছেন : সেই সামরিক সরকার যারা এক দিনের জন্যও সৈন্য ও সমরসম্ভার নিয়ে আসা থেকে বিরত হয়নি, তারা তাঁকে স্বায়ত্তশাসন দেবে? কারা শেখ মুজিবকে আস্থা জুগিয়েছিল? এ প্রসঙ্গে মঈদুল হাসান মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রকাশিত তথ্যের বরাত দিয়ে বলেন, ঢাকায় আমেরিকান কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড শেখ মুজিবের গোপন প্রতিনিধি আলমগীর রহমানকে জানান যে, ইয়াহিয়া ১৫ মার্চ আলোচনার জন্য ঢাকায় আসছেন এবং মুজিব-ইয়াহিয়া বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আর্চার ব্লাডের একটি পরিকল্পনা আছে, যা তিনি কিছু পরেই স্টেট ডিপার্টমেন্টকে জানান। কিন্তু তার পর থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত অধিকাংশ দলিলই প্রকাশিত না হওয়ার জন্য ওই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কী ছিল, তা জানা যায় না। তথ্যপ্রমাণের ওপর নির্ভরশীল কথকত্রয় এ নিয়ে আর অগ্রসর হননি। মঈদুল হাসান শুধু একটি ইঙ্গিত করেই এ সম্পর্কে বক্তব্য শেষ করেছেন।

শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতারা দুঃসময়ে কোনো দিকনির্দেশনা দিতে পারলেন না। শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হলো। তাঁর সহকর্মী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা আত্মগোপন করলেন এবং পরে বিদেশে, বিশেষ করে ভারতে আশ্রয় নিলেন। শুরু হলো নারকীয় হত্যাকাণ্ড ও সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধ। পাকিস্তানিদের নারকীয় তাণ্ডব শুরু হওয়ার আগে ২৫ মার্চ সন্ধ্যাবেলায় শেখ সাহেবের বাড়িতে তাজউদ্দীন একটি খসড়া ঘোষণা পড়তে বলেন। তাজউদ্দীন ওই ঘোষণায় স্বাক্ষর করতে অথবা টেপ রেকর্ড করতে শেখ সাহেবকে রাজি করাতে পারেননি। যা-ই হোক, মেজর জিয়া কালুরঘাটে বিদ্রোহী বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন এবং এই ঘোষণার ফল হলো অসামান্য। তিনজন অংশগ্রহণকারীর সবাই বলেছেন, ঘোষণাটি পড়ার পর সারা দেশের ভেতরে ও সীমান্তে যত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বড় ধরনের ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, জয়দেবপুর, ঢাকা, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, যশোর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহসহ প্রায় সব জায়গায় প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। সামরিক, আধা সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্য পুলিশ, সাধারণ মানুষ যোগদান করেছিল সেই প্রতিরোধযুদ্ধে। তখন রাজাকার শব্দটির উৎপত্তি হয়নি এবং অত্যন্ত রক্ষণশীল রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদেরও প্রতিরোধযোদ্ধাদের সাহায্য করতে শুনেছি। আক্রান্ত হয়ে প্রতিরোধের এই যুদ্ধ বিক্ষিপ্তভাবে এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত চলে। মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁদের সামনে রয়েছে বৃহত্তর মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব। প্রাথমিক প্রতিরোধপর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর চলমান মুক্তিযুদ্ধকে চারটি অংশে ভাগ করা যায়।

১. Retreat বা প্রস্থান

এই Retreat আমরা অনেক সশস্ত্র বিপ্লবে দেখেছি। যেমন চীনের বিপ্লবী কমিউনিস্ট মুক্তিযোদ্ধাদের বিশাল চীনের দক্ষিণ থেকে উত্তরে কৌশলগত প্রস্থান (Long March)। বাংলাদেশ অনেক ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্র হওয়ার কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। শুধু রাজনীতির কারণে নয়, রণনীতির সাফল্যের জন্য এর প্রয়োজন ছিল খুবই পরিষ্কার।

২. Regrouping and Consolidation বা শক্তির পুনর্বিন্যাস

৪ এপ্রিল তেলিয়াপাড়ায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা

সেনাবাহিনী পুনর্গঠনে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। এগুলো হলো :

ক. অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠন করা প্রয়োজন।

খ. কর্নেল ওসমানী মুক্তিবাহিনীর সর্বপ্রধান হবেন।

গ. মুক্তিবাহিনীর পুনর্বিন্যাসের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন।

প্রায় একই সময়ে ইন্দিরা গান্ধী তাজউদ্দীনের সঙ্গে আলোচনার সময়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। ১০ এপ্রিল তাজউদ্দীন সাহেবের নেতৃত্বে প্রবাসী সরকার গঠিত হলো। প্রধানমন্ত্রী ১১টি সেক্টরবিশিষ্ট চারটি সামরিক অঞ্চল ঘোষণা করলেন। আঞ্চলিক কমান্ডাররা হলেন মেজর সফিউল্লাহ, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ ও মেজর আবু ওসমান চৌধুরী। কর্নেল ওসমানী হলেন মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক।[২]

মুক্তিবাহিনীর প্রশাসনিক কাঠামো যত সহজে গঠন করা গেল, সশস্ত্র বাহিনীর পুনর্গঠন তত সহজসাধ্য ছিল না। কথোপকথনে কিছু মারাত্মক দুর্বলতার কথা বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। একটি প্রথম শ্রেণীর দুর্বলতার কারণ, সেনাবাহিনীর প্রধান কর্নেল ওসমানীর খামখেয়ালি ও সিদ্ধান্তহীনতা। খেয়াল হলো ব্রিগেড গঠন করতে হবে। ব্রিগেড গঠিত হলো। চিন্তা করলেন না পর্যাপ্ত লোকবল ও উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা আছে কি না। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান রণকৌশল ছিল শত্রুর অবস্থান জেনে সুবিধাজনক স্থানে অতর্কিত আক্রমণ ও ত্বরিত প্রস্থান। কর্নেল ওসমানী গেরিলা যুদ্ধকৌশল বুঝতেন না বলে প্রতীয়মান হয়।

দ্বিতীয় অসুবিধা হলো, ১৪০০ মাইল বিস্তৃত সীমান্তজুড়ে যে রণক্ষেত্র, তার প্রতিটি সেক্টর ও সাবসেক্টরে যোদ্ধাদের অবস্থান, শক্তি ও দুর্বলতা, চাহিদা জানা ও নির্দেশনা দেওয়া—এসব ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য যে যোগাযোগব্যবস্থা দরকার, তা বাংলাদেশ বাহিনীর ছিল না। বেতারব্যবস্থা এবং সিগন্যালের জন্য ভারতীয় সেক্টর অধিনায়কদের মাধ্যমে কাজ করতে হতো। এতে অনেক সময় লাগত। তা ছাড়া অনেক বিষয় ছিল, যা বাংলাদেশ সেক্টরপ্রধানদের জানানো দরকার কিন্তু সরকারের পদস্থ কর্মকর্তারা ভারতীয়রা জানুক, এটা চাইতেন না। মঈদুল হাসান ও এ কে খন্দকার দুজনই এভাবে বিষয়টি দেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন বিকল্প ব্যবস্থার সম্ভাবনা নিয়ে এ কে খন্দকারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। যা-ই হোক, যোগাযোগের অপ্রতুলতা চলমান মুক্তিযুদ্ধের জন্য একটি প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল (পৃষ্ঠা-৫৯)।

যোগাযোগসংক্রান্ত অবিশ্বাস ছাড়াও অন্য অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্রুটিপূর্ণ ছিল, এটাও প্রতীয়মান হয়। যেমন বাংলাদেশি যুবকদের গেরিলা প্রশিক্ষণ ও তাদের তৎপরতার প্রকৃতি। মাত্র তিন সপ্তাহের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে

১০ জনের একটি গেরিলা দলকে একটি পিস্তল ও ১০টি গ্রেনেড দিয়ে বাংলাদেশ সেক্টর অধিনায়কদের না জানিয়ে ভারতীয় কর্মকর্তারা দেশের অভ্যন্তরে পাঠাতেন। এই সামান্য অস্ত্র নিয়ে কিছুই করা সম্ভব ছিল না। এস আর মির্জা উল্লেখ করেছেন, এক ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা আমাদের ৩০ জন গেরিলা যোদ্ধাকে শুধু হ্যান্ডগ্রেনেড দিয়ে বগুড়ায় পাঠিয়েছিলেন যুদ্ধের জন্য। ৩০ জনের মধ্যে ২৮ জনই ধরা পড়ে এবং পাকিস্তানিরা তাদের হত্যা করে। এ কে খন্দকার বলেছেন, 'আমাদের নিয়মিত বাহিনীর সদস্য ও আরও অনেকের মধ্যে যে ভারতবিদ্বেষী মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছিল, তার জন্য কিছুটা দায়ী এসব ঘটনা।'

আর একটি প্রধান অসুবিধা ছিল, সেটা হলো, মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচনকে রাজনৈতিকীকরণ। শুধু এমএনএ ও এমপিরা দলের সমর্থক যুবকদের নির্বাচন করবে, এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত ও তাঁর নিজস্ব প্রতিবাদের কথা মির্জা এক স্থানে উল্লেখ করেছেন। মির্জা যুবশিবিরের দায়িত্ব নেওয়ার পর দেখলেন, আওয়ামী লীগের এক স্তরে বামপন্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে ব্যাপক অনীহা বিদ্যমান। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ—এটা একটি জনযুদ্ধ, তা উপলব্ধি করা ছিল অনেকেরই চিন্তা ও মানসিকতার বাইরে।

৩. প্রস্তুতি, গেরিলা যুদ্ধ ও প্রতি-আক্রমণ

৯ আগস্ট চীনকে সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে। নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সামরিক ব্যবস্থার একটি অংশ হিসেবে ব্যাপক হারে মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। কিছুদিন পর বামপন্থী যুবকদের ওপর থেকে প্রশিক্ষণের বাধানিষেধ বাতিল করা হয়। এ কে খন্দকার বলেছেন, ইন্দো-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে অধিকতর অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ প্রদান ও গেরিলা যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণে অর্থ প্রতি মাসে ২০ হাজারে উন্নীত করলে অক্টোবর মাস থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা, যার উল্লেখ আগে করা হয়েছে, তা অনেকটা দূরীভূত হয়। যেমন গেরিলাদের নিয়মিত বাহিনীর কর্তৃত্বের অধীনে নিয়ে আসা হলো। মঈদুল হাসান মন্তব্য করেছেন, গেরিলা ও মুক্তিযোদ্ধাদের দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো শুরু হয় জুন-জুলাই মাসে। তাদের কৌশল ও দক্ষতা আসতে দুই-তিন মাস লেগেছে। সে জন্য অক্টোবরের আগে পুরো প্রতিক্রিয়া (মুক্তিযোদ্ধাদের কাজের ফলাফল) বোঝা যায়নি। মুক্তিযোদ্ধারা ছাড়াও বিভিন্ন বাহিনী যেমন : কাদেরিরা বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী ইত্যাদি যারা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বাইরে নিজেদের লোকবল ও উদ্যোগে প্রশংসনীয় কৌশলে ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, তাদের কার্যকলাপের ফলাফল

কথোপকথনে বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কে খন্দকার বলছেন, অক্টোবরের শেষের দিকে এবং নভেম্বর মাসে পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি স্থানেই প্রচণ্ড রকমের মার খায় এবং হতাহতের শিকার হয়ে মানসিকভাবে দুর্বল বা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। (পৃষ্ঠা-৮৫)।

৪. শেষ অধ্যায় হচ্ছে, সার্বিক আক্রমণ ও দেশে প্রত্যাবর্তন

১৬ ডিসেম্বরে ভারতীয় বাহিনীর নেতৃত্বে গঠিত যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। মঈদুল হাসান বলেছেন, ভারতীয় বাহিনী হয়তো আদৌ আসত না, যদি জনগণ যুদ্ধকে সমর্থন না করত এবং মুক্তিযোদ্ধারা সাফল্য লাভ না করত। ১৬ ডিসেম্বরের আগেই ৯ ডিসেম্বর প্রথম আত্মসমর্পণের কথা ওঠে, কিন্তু বিভিন্ন কারণে (তার মধ্যে জাতিসংঘের কথাও আছে) তা হয়ে ওঠেনি। আক্রমণের মাত্র ছয় দিনের কম সময়ের মধ্যে ৯৩. হাজার সেনার একটি আধুনিক ও সুশিক্ষিত বাহিনীর পরাজয়ের দৃষ্টান্ত আর কোথাও নেই। সেটা সম্ভব হতে পেরেছে, কেননা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে আর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। কুষ্টিয়া, যশোর থেকে সংঘবদ্ধভাবে ঢাকার দিকে না এসে তারা বিভিন্ন পথে পালাতে শুরু করল। এ থেকে বোঝা যায়, তারা কতখানি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল (পৃষ্ঠা ১১৪)। যৌথ বাহিনী গঠনের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন বলেছেন, বাংলাদেশের সীমান্তে যদি পাকিস্তানি বাহিনীকে নড়বড়ে না করা যায়, তাহলে ভারতীয় বাহিনী আক্রমণের ঝুঁকি নেবে না। মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্তে এবং অভ্যন্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর খুঁটিকে শুধু নড়বড়েই করেনি, অনেক জায়গায় তা প্রায় উপড়ে ফেলেছিল। এ ছাড়া, পাকিস্তানি বাহিনীর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করার অসমর্থতার অন্য কোনো ব্যাখ্যা নেই।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের দূরদর্শিতা

কথোপকথনে স্বল্প কথায় তাজউদ্দীনের একটি মূল্যায়ন হয়েছে। সেটি এই রূপ :

তাঁকে কেউ বলে যায়নি অথবা তিনি জানতেন না তাঁকে কী করতে হবে। ক্রমে ক্রমে তিনি সম্ভাবনার সূত্র খুঁজে নিতে শুরু করেন, লক্ষ্য স্থির করেন, সংগঠন গড়ে তোলেন, বিশ্বের সহায়ক শক্তিগুলোর আস্থা ও সাহায্য অর্জন করে দেশকে স্বাধীন করতে সমর্থ হন (পৃ. ৩২)। এই মূল্যায়নের সঙ্গে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই, তবে কথোপকথনে বর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতে কিছু মতামত সংযোজন করা যায়।

তাজউদ্দীনকে শুধু প্রবাসী সরকারের প্রধান হিসেবে না দেখে তাঁকে একটি War Cabinet-এর প্রধান হিসেবে দেখা যায়। এই সরকারকে দেশ শাসন করতে হয়নি,

দেশ যখন শত্রুর কবলে, তখন দেশ শাসনের প্রশ্ন ওঠে না। যা করতে হয়েছে তা হলো, যুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে শত্রুমুক্ত করা, ভারতের সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে একটি কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন করা ও অন্যান্য সহায়ক শক্তি, যেমন বিশ্বজনমত ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রভাবকে কাজে লাগানো।

স্বাধীনতার ঘোষণা, প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিরোধযুদ্ধ, তেলিয়াপাড়ায় সেনা কর্মকর্তাদের বৈঠকে নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠনের আশু প্রয়োজনীয়তা—এসব ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর অগ্রণী ভূমিকা তিনি লক্ষ করেন। ১০ এপ্রিল তাঁর নেতৃত্বে প্রবাসী সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মুক্তিবাহিনীর পুনর্বিন্যাসের নির্দেশ জারি করেন।

খামখেয়ালি ও বয়স্ক সেনাপ্রধান জেনারেল ওসমানীকে সামলানো একটা বড় ব্যাপার ছিল। বিশেষ করে যৌথ সামরিক কমান্ড গঠনে ওসমানীর বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে তাজউদ্দীন শক্তভাবেই তাঁকে সামলান। মুক্তিযোদ্ধাদের অভাবনীয় সাফল্যের পরও, চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে যে Final Thrust দরকার, তা একটি যৌথ কমান্ড ছাড়া আসবে না, তা তিনি ভালো করেই বুঝেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে স্বল্প সময়ে প্রশিক্ষিত গেরিলাদের ওপর ভারতীয় সেনা কর্মকর্তাদের খবরদারি, অপরিকল্পিত গেরিলা আক্রমণ, ভারতীয়দের মাধ্যমে সেক্টর কমান্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সিগন্যালের কাজ করা ইত্যাদি বিরক্তিকর অসুবিধা দূর করার জন্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন পরিষ্কারভাবে তাঁর মত ব্যক্ত করেন এবং ধীরে ধীরে বিশেষ করে ৯ আগস্টের পর অসুবিধাগুলো প্রায় দূরীভূত হয়ে যায়। ভবিষ্যতের স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে দলের ঊর্ধ্বে কার্যক্রম গ্রহণের একটি সর্বদলীয় ব্যবস্থার দরকার, এটা তাজউদ্দীন বুঝেছিলেন। মওলানা ভাসানী ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর পরই ভাসানীসহ বয়োজ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে একটি সর্বদলীয় উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করেন। বামপন্থী যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে প্রশিক্ষণের বাধাগুলো বিলুপ্ত করা হয়, তা আগেই বলা হয়েছে।

শুধু একটি বিষয়ে তাজউদ্দীন সফল হননি। তা হলো, মুজিব বাহিনী গঠনে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় সংস্থাকে নিবৃত্ত করতে না পারা। মুজিব বাহিনী গঠিত হলো সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বের বাইরে। প্রথমে এর সৃষ্টি ও গঠনপ্রণালি সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী, তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা বা সেনাবাহিনীর কেউই কিছু জানতেন না। সদস্যদের বাছাই করা হয় আওয়ামী লীগের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' তাদের প্রশিক্ষিত করে গোয়েন্দা সংস্থার জেনারেল উবানের অধীনে একটি বাহিনী হিসেবে গঠন করে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর সাহায্যে গঠিত দেরাদুনের অদূরে চাকরাতা নামক স্থানে একটি অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণকেন্দ্রে তাদের

প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকার তাদের কর্তৃত্বের বাইরে এই গোপন বাহিনী গঠন, তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের উদ্বেগের কথা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন স্তরে জানায়, কিন্তু ফললাভ হয়নি। মঈদুল হাসান, যিনি এসব আলোচনায় মাঝেমধ্যে অংশ নিয়েছেন, তাঁর ধারণা, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেও এমন কিছু অসুবিধা ছিল, যা এড়িয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এই বাস্তব অসুবিধা কী, তা কিছুটা অনুমান করা অসম্ভব নয়। মুজিব বাহিনীর প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য হচ্ছে, স্বাধীন বাংলাদেশে বামপন্থীদের দমিয়ে রাখা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে যুদ্ধ করেছে বামপন্থী বিপ্লব ঠেকাতে। ভারতে তখন মাওবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সুতরাং বিপ্লবী বামপন্থীদের দমন করা সম্পর্কে ভারত ও মার্কিন নীতির মধ্যে একটি মিলসূত্র বোধ করি খুঁজে পাওয়া যায়। চাকরাতার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে সিআইএর সাহায্যে গঠিত ও চালিত হওয়ার আদি লক্ষ্য হচ্ছে, প্রশিক্ষিত লোকদের মাধ্যমে চীনের বিরুদ্ধে তিব্বতে গোলযোগ সৃষ্টি করা। সুতরাং, সেখানে বাংলাদেশের প্রশিক্ষিত যুবকদের কার্যকলাপ নিয়ে একটি সীমিত পরিসরের মধ্যে সিআইএর মতামত উপেক্ষা করা ভারতের পক্ষে সহজ ছিল না। সিআইএ ও ভারতীয় 'র'-এর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রকৃতি বোঝার জন্য কথোপকথনের ১৩৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া 'মেমোরেন্ডাম' পড়ে দেখা যেতে পারে।

শুনেছি *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর কথোপকথন* অনেকেই বেশ আগ্রহের সঙ্গে পড়েছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে 'কথোপকথন' জাতীয় একটি শ্রেষ্ঠ অধ্যায় বোঝার জন্য কোনো কালজয়ী অবদান রাখবে। বিভ্রান্ত, বোধশক্তির গোষ্ঠীগত বিভক্তি এবং আশ্রয়ের সময়ে বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত একটি দলিলের প্রভাব কী হবে, তা বলা সহজ নয়। কেমব্রিজের লোকান্তরিত ইতিহাসবিদ ই এ কারের বক্তব্যের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধটি শেষ করতে চাই। তিনি যা বলেছিলেন তা মোটা দাগে এই, 'যে সমাজ বর্তমান নিয়ে বিভ্রান্ত এবং ভবিষ্যতে দৃষ্টিপাত করার ক্ষমতা হারিয়েছে, বিগত দিনের ইতিহাস সে সমাজে একগাদা অর্থহীন, সম্পর্কহীন ঘটনা বলে মনে হবে। তবে সমাজ যদি বর্তমানের ওপর কর্তৃত্ব ও ভবিষ্যৎ বোঝার বোধশক্তি অর্জন করতে পারে, তবে একই পন্থায়, অতীতকে বোঝার অন্তর্দৃষ্টি ফিরে পাবে।' সে পন্থা হলো, আত্মসম্ভ্রম ও আত্মবিশ্বাস।

তথ্যসূত্র

১. এমন একজন হলেন ইয়াহিয়া মন্ত্রিসভার বাঙালি সদস্য ও পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী মরহুম আহসানুল হক।

২. এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত *হিস্ট্রি অব বাংলাদেশের* ২১ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

* ইতিহাসের একটি ঘটনারই নানা রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয়ে থাকে। এই বইতে মূলত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী সংগঠকদের তিনজন মুক্তিযোদ্ধা তাঁদের নিজস্ব একটি ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই বইয়ের তথ্য নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। এই মতবিরোধ বিবেচনায় রেখেই গ্রন্থটি বৃহত্তর পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে উৎসাহিত হয়েছি। গ্রন্থটিতে বেশ কয়েকটি জায়গায় মতপার্থক্যের সুযোগ আছে। প্রথমত, ২৫ মার্চের ঘটনার আগে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল, যা রাজনৈতিক নেতৃত্ব করতে পারেনি। কিন্তু এই প্রস্তুতির ধরন কী হবে, সেটিই হলো মূল রাজনৈতিক প্রশ্ন। এই রাজনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসার পরিণতিতে আমরা দেখি, আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব জনসম্পৃক্ততার পথ ধরেই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, ২৫ মার্চের ঘটনাকে এই গ্রন্থের লেখকেরা একটি 'রাজনৈতিক ব্যর্থতা' বলে মনে করেছেন। এ ক্ষেত্রে নানা মত ও ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে। একটি মত হচ্ছে—মুজিব যদি গ্রেপ্তার না হতেন, তাহলে বাংলাদেশ ইস্যুটি এত দ্রুত বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পেত না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মুজিবের মুক্তি, দেশে প্রত্যাবর্তনের পরপরই ভারতীয় সৈন্যদের ফিরিয়ে নেওয়া ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে মুজিবের গ্রেপ্তার যে কৌশলগতভাবে ঠিক ছিল, তা ইতিমধ্যে ইতিহাস-স্বীকৃত। তৃতীয়ত, বইটিতে বলা হয়েছে, মুজিব বাহিনী কেবল বামপন্থীদের ঠেকানোর জন্যই গঠন করা হয়েছিল। বাস্তবতাসহ এই দৃষ্টিভঙ্গি একপেশে। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ভারত-সোভিয়েত চুক্তি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে না। এমন সব বিষয়ে দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও আমরা এ ধরনের লেখা ছাপালাম। এর মূল কারণ, *প্রতিচিন্তা* একটি বহুত্ববাদী চিন্তার পাটাতন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আশা করি, পাঠকেরা আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন ও উৎসাহিত করবেন। — **সম্পাদক।**

বই আলোচনা

পরিবেশতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বাংলা বদ্বীপের রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাস

আজিজুল রাসেল

দ্য বেঙ্গল ডেল্টা : ইকোলজি, স্টেট অ্যান্ড সোশ্যাল চেঞ্জ, ১৮৪০-১৯৪৩, ইফতেখার ইকবাল, বেসিংসটোক : পার্লগ্রেভ ম্যাকমিলান, ২০১০।

দ্য বেঙ্গল ডেল্টা: ইকোলজি, স্টেট অ্যান্ড সোশ্যাল চেঞ্জ, ১৮৪০-১৯৪৩ গ্রন্থে ইফতেখার ইকবাল বাংলা বদ্বীপের, বিশেষ করে বদ্বীপের পূর্বাংশের, এক শ বছরের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং রাষ্ট্র গঠনের ব্যাখ্যা করেছেন। বাংলা তো বটেই, দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশতাত্ত্বিক ইতিহাসে *দ্য বেঙ্গল ডেল্টা* একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ইফতেখার ইকবালের আগে বাংলা বদ্বীপ, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনকে কেউ পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ব্যাখ্যা করেননি। সেদিক দিয়ে ইকবালের এই প্রচেষ্টা বাংলার পরিবেশতাত্ত্বিক ইতিহাস রচনার প্রথম প্রয়াস। এর আগে মূলধারার বেশির ভাগ ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিত পরিবেশকে শুধু পটভূমি হিসেবে বর্ণনা করার মাঝেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাঁরা পরিবেশকে একটি অপরিবর্তনশীল বিষয় হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু ইকবালই প্রথম বাংলা বদ্বীপের ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন, কীভাবে পরিবেশগত পরিবর্তন এ অঞ্চলের সমাজ, রাজনীতি ও রাষ্ট্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ঔপনিবেশিক আমলে পরিবেশ (ecology) ও সমাজের মধ্যে যে পরিবর্তনশীল সম্পর্ক ছিল, তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইকবাল তিনটি বৃহৎ ইস্যু সামনে এনেছেন। এগুলো হলো : ১. এ অঞ্চলে খোদ পরিবেশ জগতে (ecological regime) যে পরিবর্তন হচ্ছিল তা; ২. এ পরিবর্তন কীভাবে গ্রামীণ অর্থনীতি ও

সমাজের ওপর প্রভাব ফেলেছিল এবং ৩. এ প্রভাবের ধরন এবং ফলটা কেমন ছিল, অর্থাৎ কীভাবে বিভিন্ন সামাজিক শক্তি (social forces) দীর্ঘ সময় ধরে এ পরিবেশগত সম্পদকে (ecological resources) তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে।

ইকবালের মতে, পূর্ব বাংলার পরিবেশের, বিশেষ করে নদী ও বনব্যবস্থার বিপর্যয়ের কারণ হলো জটিল এক রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং ব্যাপক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, যা কুড়ি শতকে এ অঞ্চলের রাজনীতির ধারা, অর্থনীতি এবং সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে (পৃ. ৪-৫)। কিন্তু পূর্ববঙ্গের গতিশীল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশ ইতিহাসবিদদের জন্য গবেষণার উর্বর ক্ষেত্র হলেও তা এখন পর্যন্ত ইতিহাসবিদদের তেমন আকৃষ্ট করেনি। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল নিয়ে পরিবেশ ইতিহাসবিদেরা কাজ করলেও বাংলা, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ রয়ে গেছে উপেক্ষিত। তা ছাড়া লেখকের মতে, দক্ষিণ এশিয়ার যেসব ইতিহাসবিদ পরিবেশ ইতিহাস নিয়ে কাজ করেছেন, তাঁদের বেশির ভাগই দৃষ্টি দিয়েছেন পরিবেশ 'ধ্বংস' এবং 'রক্ষা' এ দুইয়ের ওপর। কিন্তু কীভাবে এ উপমহাদেশের, বিশেষ করে বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক চর্চার মধ্যে পরিবেশকে চিহ্নিত করা যায়, তার ওপর সেভাবে দৃষ্টিই দেওয়া হয়নি। এভাবে অনেক অঞ্চলই, যেমন বাংলা বদ্বীপ, বাদ পড়ে গেছে পরিবেশ ইতিহাস থেকে (পৃ. ৫)। তাঁর মতে, পরিবেশ ইতিহাসবিদেরা ধীরে ধীরে কৃষি ইতিহাসকে (agrarian history) তাঁদের গবেষণার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কিন্তু মূলধারার ইতিহাসবিদেরা পরিবেশকে তাঁদের ইতিহাসতত্ত্বের মধ্যে স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ইকবালের মতে, দক্ষিণ এশিয়ার বেশির ভাগ পরিবেশতাত্ত্বিক ইতিহাস রাষ্ট্রকে দেখেছে, প্রকৃতি ব্যবস্থাপনায় প্রধান কর্তা। যেমন যাঁরা সংরক্ষণ নীতি বিশ্বাস করেন, তাঁদের কাছে শক্তিশালী রাষ্ট্রের ধারণা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন তাঁরা দেখেন যে বোটানিক্যাল গার্ডেন ব্যবস্থাপনা করছে রাষ্ট্র, বিজ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে রাষ্ট্র এবং ঔপনিবেশিক ল্যাবরেটরি বা গবেষণাগার চালাচ্ছে রাষ্ট্র। আবার অনেকে আছেন, যাঁরা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে দেখেন নির্বিচারে প্রকৃতি ধ্বংসকারী হিসেবে। তাঁদের মতে, মুনাফা অর্জনের ক্ষুধা এবং খাজনা আদায়ের মোহ থেকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র পরিবেশ ধ্বংসের কাজে উৎসাহিত হয়েছিল। যেসব এলাকায় এসব সংরক্ষণ এবং পরিবেশ ধ্বংস করা হয়েছে, সেসব এলাকায় ঘটে যাওয়া নিম্নবর্গের বিদ্রোহ এবং তা দমনে সরকারি বিভিন্ন পদক্ষেপকেও রাষ্ট্রের অপরিসীম ক্ষমতা হিসেবে দেখানো হয়েছে। লেখকের মতে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের যখন কোনো নির্দিষ্ট এলাকার কৃষি-পরিবেশ (agro ecology) সম্পর্কে অজানা বা কম জানা থাকে, তখন ঔপনিবেশিক আধুনিক রাষ্ট্রও কম কর্তৃত্বশীল ও সীমাবদ্ধ ছিল।

এখন দেখা যাক কীভাবে ইকবাল তাঁর প্রধান প্রধান যুক্তিকে দাঁড় করিয়েছেন

যে বাংলা বদ্বীপে পরিবেশ কখনো পটভূমি বা স্থবির উপাদান হিসেবে হাজির ছিল না বরং এটি সব সময়ই সজীব, গতিশীল এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকেও এ পরিবেশের কাছে বশবর্তী হতে হয়েছে। ভূমিকা ও উপসংহারসহ মোট নয়টি অধ্যায়ে লেখক তাঁর *দ্য বেঙ্গল ডেল্টা* গ্রন্থটিকে সাজিয়েছেন। প্রথম অধ্যায় হলো ভূমিকা। 'ইকোলজি অ্যান্ড এগ্রেরিয়ান রিলেশন ইন দ্য নাইনটিনথ সেঞ্চুরি', শিরোনামে দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, পরিবেশের সঙ্গে কৃষি প্রশ্নের কী সম্পর্ক ছিল (পৃ. ১৮-৩৮)। এ অধ্যায়ে তিনি আলোচনা করেছেন কীভাবে বাংলা বদ্বীপ, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের পরিবেশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের রাজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং কৃষি ও কৃষকদের ওপর বিভিন্ন পদক্ষেপকে প্রভাবিত করেছে, নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে অথবা ব্যর্থ করেছে। এখানে উদাহরণ হিসেবে তিনি টেনেছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা। তিনি দেখিয়েছেন, ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করলেও বাংলায় এ ব্যবস্থা ঠিকভাবে কার্যকর ছিল না। বাংলার পরিবর্তনশীল ও গতিশীল পরিবেশ ব্রিটিশদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের খুঁটিনাটি এখানে প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করেছিল। যেমন তিনি দেখিয়েছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলায় চালু হলেও একটি বিশাল অংশ এর আওতার বাইরে ছিল। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো সুন্দরবন। এ ছাড়া পূর্ববঙ্গের নদীগুলো ক্রমাগত বিভিন্ন চর সৃষ্টি করছিল। প্রশাসকদের জন্য এসব জায়গা পরিমাপ করা ছিল দুঃসাধ্য। কারণ, কখন কোনখানে চর তৈরি হবে তা ধারণা করা সাধ্যের বাইরে। যেমনটা ব্রিটিশ এক প্রশাসক বলেছিলেন, এ অঞ্চলে প্রায় প্রতিদিনই নতুন চর জেগে উঠছিল। এ ছাড়া পুনরুদ্ধার করা হচ্ছিল চাষযোগ্য জঙ্গলাকীর্ণ জায়গা। এসব জেগে ওঠা চর এবং জঙ্গল ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতার বাইরে। এভাবে ইকবাল দেখাচ্ছেন, কীভাবে পরিবেশ ঔপনিবেশিক সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক পদক্ষেপকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। গতিশীল পরিবেশের কাছে হার মানতে হচ্ছে প্রশাসনকে।

তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক আলোচনা করেছেন কৃষির বাণিজ্যিকীকরণে পরিবেশের ভূমিকা। কীভাবে পরিবেশ রাষ্ট্র ও কৃষককে নির্দিষ্ট কৃষিপণ্য উৎপাদনে প্রভাবিত করেছিল। এ অধ্যায়ে লেখক বিশ্লেষণ করেছেন, কী প্রক্রিয়ায় কৃষির উন্নতি এবং মানুষের ভালো থাকাকে (well-being) ও কৃষি সামাজিক গঠনকে (agrarian social formation) বদ্বীপের পরিবেশ প্রভাবিত করেছিল। বাংলা বদ্বীপের, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের পরিবেশ এখানকার কৃষি উৎপাদনের ওপর বিশেষ প্রভাব রেখেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটি, যা কৃষি উৎপাদনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে, তা হলো এখানকার নদী। নদীগুলো দুটি উপায়ে বাংলা বদ্বীপের পূর্ব অংশ, অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের ইকোসিস্টেমে ভূমিকা রেখেছে। এ অঞ্চলের নদীগুলো যে

পলি জমা করে তা নতুন চর সৃষ্টি ছাড়াও সবচেয়ে বড় উপকারী যে ব্যাপারটি কৃষির জন্য করে, তা হলো নদীগুলো পলি বয়ে নিয়ে এসে পুরো catchment অঞ্চলকে উর্বর করে। দ্বিতীয়ত, নদীগুলো থেকে যে পরিমাণ পানি এবং যে গতিতে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে যায়, তা লবণাক্ত পানি সমুদ্রে নির্গমন করে স্বাদু পানির ইকোসিস্টেম চালু রাখতে সহায়তা করে। পূর্ব বদ্বীপের পরিবেশ ধান উৎপাদনের জন্য সহায়ক। এ জন্য দেখা যায়, এ অঞ্চলে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার ধান প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সারা বিশ্বে ধান উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে তাই বাংলাদেশের খ্যাতি রয়েছে। ধান এখানকার প্রধান ফসল। এ ছাড়া পাট চাষের জন্য পূর্ববঙ্গের পরিবেশ বেশ সহায়ক। বিশ্বের বাজারে পূর্ববঙ্গের পাটের বেশ সমাদর ছিল। ডান্ডি উৎপাদনকারীদের অর্থনৈতিক সহযোগিতায় পশ্চিম আফ্রিকা ও ব্রিটিশ গায়ানায় পাট উৎপাদনের প্রচেষ্টা হাতে নেওয়া হয়েছিল। জাপান এবং চীনেও সফলভাবে অল্প পরিমাণে পাট উৎপাদন করা হয়েছিল। কিন্তু বাংলার কাঁচা পাট সব সময়ই একচেটিয়া অধিকার ভোগ করেছিল। লেখক যে সময়ের কথা বলছেন, সে সময়ে পূর্ব বাংলার নদীগুলো ছিল সজীব ও গতিময়। অপরদিকে একই সময়ে নদীর গতিমুখ পরিবর্তন হয়ে তা পশ্চিম বদ্বীপকে অনুর্বর করে তুলেছিল। ঔপনিবেশিক সরকারের বিভিন্ন প্রতিবেদন, বিশেষ করে ডাফরিন এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিক প্রশাসকের প্রতিবেদন, বিশ্লেষণ করে লেখক দেখিয়েছেন, এ অঞ্চলের কৃষকদের অবস্থা অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক ভালো ছিল।

ইকবাল দেখিয়েছেন, কৃষি-পরিবেশগত সম্পদ যে সুযোগ-সুবিধা পূর্ববঙ্গের কৃষকদের দিয়েছিল, কৃষকেরা এর যৌক্তিক এবং বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার করেছেন। দেখা যায়, তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন ভূমি অধিকার নিশ্চিত এবং শস্য উৎপাদনে ভূমিকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করার ব্যাপারে। পরিবেশ জগৎ আরেকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা হলো এটি কৃষকদের সক্ষম করেছিল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার বদলের ওপর ভিত্তি করে তাদের উৎপাদন বদলাতে। উদাহরণ হিসেবে লেখক দেখিয়েছেন, ১৮৭০ সালে পাটের দাম যখন হঠাৎ পড়ে যায়, তখন পূর্ববঙ্গের কৃষকেরা পাটের বদলে ধান চাষ করা শুরু করেছিলেন। এ রকম সুযোগ উপমহাদেশের অন্যান্য জায়গায় তেমন ছিল না। যেমন বিহারের কৃষকেরা আখ এবং নীল চাষ বাদ দিতে পারেননি। পূর্ববঙ্গের পরিবেশ অনেকাংশে এখানকার কৃষকদের এ সুবিধা করে দিয়েছিল। বদ্বীপের পরিবেশের কারণে এখানকার মাটি ধান এবং পাট এ দুটি কৃষিপণ্য চাষের জন্যই উপযোগী। লেখকের মতে, অপেক্ষাকৃত অর্থনৈতিক সচ্ছলতা উনিশ শতকে এ অঞ্চলের সমাজের গড়ন ও বিকাশে দীর্ঘস্থায়ী ভূমিকা রেখেছিল। তাঁর মতে, এ অর্থনৈতিক সচ্ছলতাই হয়তো ব্যাখ্যা করতে পারে কেন পূর্ববঙ্গ 'ভিক্টোরিয়ান হলোকাস্ট'[১] এড়াতে পেরেছিল।

চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক আলোচনা করেছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে কীভাবে ফরায়েজি আন্দোলন এত সফলতা লাভ করেছিল।[২] এ ক্ষেত্রে লেখক দেখিয়েছেন, বিশেষ ওই শতাব্দীতে ফরায়েজি আন্দোলনের সফলতার ক্ষেত্রে পরিবেশ বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। লেখক উত্তর খুঁজেছেন, কেন এমন সময়ে ফরায়েজিরা সফল হয়েছিলেন যে সময়ে ভূমিহীনতা অথবা চরম ক্ষুধা প্রকট ছিল না। লেখক যুক্তি দিয়েছেন, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন এজেন্সি, যেমন ভূমি উদ্ধারকরণ প্রকল্পে অর্থলগ্নিকারী এবং জমিদারেরা পরিবেশগত সম্পদের উৎপাদনশীল মূল্যের ভাগ নিতে চেষ্টা করেছিলেন। এসব প্রতিদ্বন্দ্বীর কারণে ভূমিতে কৃষকের অধিকার বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। লেখকের মতে, বিশ্ব পণ্যবাজার এবং পরিবেশগত সম্পদের মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তা ফরায়েজি আন্দোলনের একটি স্পেস বা জায়গা তৈরি করে দিয়েছিল। এমন একটা সময়ে এ আন্দোলন হয়েছিল, যখন তাঁদের ভালো থাকার যে সম্পদ তথা চর এবং বনের অধিকার ছিল হুমকির মুখে। ইকবাল দেখিয়েছেন, ফরায়েজিরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন খাসমহল নিজেদের দখলে নেওয়ার। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, কেনই বা বিংশ শতাব্দীতে এসে ফরায়েজি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। ইকবালের মতে, পরিবেশ এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। বিংশ শতাব্দীতে এসে এ অঞ্চলের নদী-নালাগুলো মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক—দুই কারণেই অবক্ষয় ঘটেছিল। নদী-নালার এ অবক্ষয় ফরায়েজি আন্দোলনের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। জলাবদ্ধতা এবং অস্বাভাবিক বন্যার মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এর ফলে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, যার ওপর ফরায়েজি আন্দোলন ছিল অনেকটা নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত, ফরায়েজি যোগাযোগব্যবস্থা ছিল মূলত নদীকেন্দ্রিক। পানিপথকেন্দ্রিক ফরায়েজিদের প্রধান কেন্দ্রগুলোও নদীর সঙ্গে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত ছিল। এভাবে ফরায়েজিরা পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলজুড়ে খুব সহজেই যাতায়াত করতে পারত। ইকবাল দেখিয়েছেন, উনিশ শতকের অন্যতম বড় আন্দোলনের, ফরায়েজি আন্দোলন, খুব গভীর সম্পর্ক ছিল পরিবেশের সঙ্গে। কিন্তু একটি বিষয় নিয়ে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, লেখক যেসব সামাজিক আন্দোলন ও কৃষক সংগ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন, এসব কি শুধুই পরিবেশ প্রভাবিত? তিনি কি পরিবেশকে অত্যধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন? নাকি কিছুটা হলেও ঔপনিবেশিক সরকারের হস্তক্ষেপ নীতি বা কর্মকাণ্ড উসকে দিয়েছিল এই আন্দোলন-সংগ্রামকে? পার্বত্য অঞ্চলে, বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত পার্বত্য চট্টগ্রাম, যেসব বিদ্রোহ হয়েছিল সেগুলোকে তিনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?[৩] উল্লিখিত সময়ে পূর্ব বঙ্গীপে গতিশীল পরিবেশের জন্য যেসব আন্দোলন-সংগ্রামের কথা লেখক বলছেন, ঠিক সেই সময়ের কাছাকাছি সময়েই সাঁওতাল ও খাসিয়া বিদ্রোহ হয়েছিল। তাহলে এসব

বিদ্রোহ কি পরিবেশ প্রভাবিত? নাকি সে সময়ে পাহাড়ে ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে বিদ্রোহের স্ফুরণ ঘটেছিল, সে প্রশ্ন থেকে যায়। আরেকটি ব্যাপার, তা হলো, বাংলায় বিপ্লব বিদ্রোহ তো শুধু লেখক উল্লিখিত বাংলায় কৃষিসহায়ক পরিবেশের কাল উনিশ শতকেই হয়নি? আঠারো শতকের ষাটের দশক থেকে শতকের শেষ পর্যন্ত ফকির সন্ন্যাসী এবং কৃষক বিদ্রোহ ছিল জোরদার। তাহলে এসব বিদ্রোহকে লেখক পরিবেশতত্ত্ব দিয়ে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

পঞ্চম অধ্যায়টি গ্রন্থের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় (পৃ. ৯৩-১১৬)। এ অধ্যায়ে বিদ্যমান ইতিহাসতত্ত্বকে তিনি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। কর্তৃত্বশীল ইতিহাসতত্ত্বের মতে, ১৯৩০-এর দশকে মহামন্দা কৃষিতে যে প্রভাব ফেলে, এর ফলে ধনী কৃষক অপেক্ষাকৃত গরিব কৃষকের সহায়-সম্বল কিনে অনেক লাভবান হয়েছিলেন। এভাবে কৃষিতে ধনী কৃষকের আধিপত্য তৈরি হয়েছিল। এ ধনী কৃষকশ্রেণীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রেণীও পেরে ওঠেনি। যার ফল শেষ পর্যন্ত গিয়ে গড়ায় ১৯৪৩-এর মহাদুর্ভিক্ষে। এ ইতিহাসতত্ত্ব দুর্ভিক্ষের জন্য ধনিক কৃষক শ্রেণীকে অনেকাংশে দোষী করেছে।[৪] কিন্তু ইকবালের মতে তা সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ, দেখা গিয়েছিল ১৯০৩ সালে স্বদেশি আন্দোলনের পর থেকে ভদ্রলোকেরা আবার সরাসরি কৃষিতে ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁদের কৃষিতে এ প্রত্যাবর্তন ছিল আগের চেয়ে ভিন্ন। কারণ, এ সময়ে তাঁরা সরাসরি কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। কৃষিতে ভদ্রলোক শ্রেণীর সরাসরি ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে উৎসাহিত করেছিল। আর্কাইভসের প্রাথমিক প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে তিনি দেখিয়েছেন, বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভদ্রলোক সন্তানেরা ফরিদপুর, বরিশালসহ পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে খাসজমি বন্দোবস্ত নিয়ে নিজেরাই চাষাবাদ শুরু করেছিলেন। এভাবে তিনি দেখিয়েছেন, কৃষিতে ধনী কৃষকদের একচ্ছত্র যে আধিপত্যের কথা সুগত বোস, পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা এ মতের অনুসারী ইতিহাসবিদেরা বলেছেন, তা প্রশ্নযোগ্য। তা ছাড়া তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ১৯৩০-এর অর্থনৈতিক মহামন্দার সময়ে জমিদারেরা যেখানে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছেন, ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন, সেখানে ধনী কৃষকেরা কীভাবে মহামন্দার প্রভাব এড়িয়েছিলেন? কীভাবেই বা তাঁরা ক্ষুদ্র কৃষকদের সহায়-সম্বল কিনতে সমর্থ হয়েছিলেন?

লেখক দেখিয়েছেন, পূর্ববঙ্গে রেলওয়ে বিস্তারের সঙ্গে এর পরিবেশ ধ্বংসের একটি সম্পর্ক ছিল। পূর্ববঙ্গের মতো নদীবিধৌত ও জলাশয়পূর্ণ একটি এলাকায় রেলওয়ে নির্মাণ করা মানে ছিল অসংখ্য বাঁধ, কালভার্ট এবং ব্রিজ নির্মাণ করা। রেলওয়ে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান এবং রেলওয়ে প্রকৌশলীরা তখন পরিবেশের কথা বলতে গেলে ভাবেনইনি। অসংখ্য বাঁধ এবং কালভার্ট নির্মাণ করায় পুরো পূর্ববঙ্গ

ভাগ হয়ে গিয়েছিল ছোট ছোট জমিখণ্ডে। এতে পানি চলাচল অবরুদ্ধ হয়েছিল। ইকবাল দেখিয়েছেন, এসব দায়ী ছিল এ অঞ্চলের কৃষির অবনতির জন্য। রেলওয়ের বিস্তার এ অঞ্চলে অস্বাভাবিক বন্যা এবং রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে লেখক আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের কথা লিখেছেন। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে পূর্ববঙ্গের পরিবেশ বিপর্যয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিল। রেলওয়ে ব্রিজ, কালভার্ট বা বাঁধের বিরূপ প্রভাব হিসেবে তিনি তুলে ধরেছেন হার্ডিঞ্জ ব্রিজের উদাহরণ। তিনি দেখিয়েছেন ব্রিজের পিলার নদীতে চর এবং নাব্যতা সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। দেশের অন্যতম বড় জলাশয় চলনবিলে পানি এবং মৎস্য সম্পদ হ্রাস পাওয়ার পেছনে এ ব্রিজ ভূমিকা রেখেছিল।

এ ছাড়া বিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে পূর্ব বদ্বীপে পরিবেশ ধ্বংসের আরেকটি বড় কারণ হিসেবে ইকবাল উল্লেখ করেছেন কচুরিপানার বিস্তারকে (পৃ. ১৪০-১৫৯)। কচুরিপানা নিয়ন্ত্রণ বা ধ্বংস নিয়ে ঔপনিবেশিক সরকার সব সময়ই ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের কেউ কেউ ভেবেছেন কীভাবে কচুরিপানাকে কাজে লাগানো যায়। অনেকে মতামত দিয়েছিলেন কচুরিপানাকে সার হিসেবে ব্যবহার করায়, যেহেতু কচুরিপানায় উচ্চমাত্রায় পটাশিয়াম পাওয়া যেত। আবার অনেকে ভেবেছিলেন একে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে পটাশিয়ামের ব্যাপক চাহিদা ছিল। ঔপনিবেশিক সরকার মেসার্স সও অ্যান্ড ওয়ালেস কোম্পানির সঙ্গে এ ব্যাপারে একটি চুক্তিও করেছিল যে তারা বাণিজ্যিকভাবে কোম্পানিটিকে কচুরিপানা পোড়ানো ছাই সরবরাহ করবে। সরকারের অন্য একটি দল ছিল কচুরিপানাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার পক্ষে। বিশ শতকে কচুরিপানা কৃষি ও পরিবেশের জন্য কতটা ক্ষতিকর ছিল, তা বোঝা যায় ইকবালপ্রদত্ত কয়েকটি উদাহরণ থেকে। তিনি দেখিয়েছেন, ১৯১৫ সালে কুমিল্লা জেলার নাসিরনগরের একদল কৃষক সরকারের কাছে পিটিশন করেছিলেন যে, বন্যা ও কচুরিপানার ফলে তাঁদের সব ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া ঢাকার পাশে মুন্সিগঞ্জের আড়িয়ল বিলে ব্যাপক পরিমাণ ধান নষ্ট হয়েছিল কচুরিপানার তাণ্ডবে। ১৯২৬ সালে একটি সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয় যে বছরের পর বছর ১৫ থেকে ২০ ভাগ আমন ধান নষ্ট হয়েছিল। শুধু ঔপনিবেশিক আমলেই নয়, উত্তর ঔপনিবেশিক বাংলায়ও কচুরিপানা কৃষি ও পরিবেশের জন্য ছিল বড় হুমকি। আহমেদ কামাল তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, উত্তর ঔপনিবেশিক বাংলায় কুমিল্লাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে কচুরিপানার তাণ্ডবে আউশ ও আমন ধান উৎপাদনে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল। আখাউড়ায় করণপুর গ্রাম থেকে কুমিল্লা জেলার পত্তন ইউনিয়ন পর্যন্ত প্রায় চার মাইল বিস্তৃত এলাকার ২০ হাজার একর ধানি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কচুরিপানার কারণে।[৫]

১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষ নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক গবেষণা হয়েছে। বিভিন্ন পণ্ডিত এবং ইতিহাসবিদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মহাদুর্ভিক্ষের কারণকে ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ কেউ, যেমন অমর্ত্য সেন, মহাদুর্ভিক্ষকে দেখেছেন খাদ্যের প্রাপ্যতার হ্রাস হিসেবে।[৬] অনেকে সমালোচনা করেছেন যে অমর্ত্য সেন এবং তাঁর মতের অনুসারীরা দীর্ঘ দিন ধরে বাংলার কৃষিতে যে পরিবর্তন ঘটেছিল, তা বিবেচনায় নেননি। তাঁরা দুর্ভিক্ষের কারণ খুঁজতে আরও পেছনে গিয়েছেন। দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে তাঁরা খাদ্য উৎপাদনে পরিবর্তন, কর বৃদ্ধি এবং ১৯৩০-এর দশকের মহামন্দা এ অঞ্চলের কৃষি ও অর্থনীতির ওপর যে প্রভাব ফেলেছিল সেসব আলোচনা করেছেন। সম্প্রতি তারেক ওমর আলি তাঁর একটি গবেষণায় দেখিয়েছেন, বিশ্ববাজারের সঙ্গে কীভাবে একেবারে প্রান্তের কৃষকও সম্পৃক্ত ছিল। পণ্যের দামের ওঠানামার সঙ্গে তাঁদের ভালোমন্দ জড়িত ছিল।[৭] তবে এই প্রথম ইকবাল ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষের একটি পরিবেশতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। লেখক বলতে চেয়েছেন, দুর্ভিক্ষের পেছনে বিশ শতকে বাংলা বদ্বীপের পরিবেশ বিপর্যয়েরও একটি হাত ছিল। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে এ অঞ্চলের কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। একসময় পূর্ববঙ্গ প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপাদন করত। পূর্ববঙ্গ থেকে ধান ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি হতো। কিন্তু বিশ শতকে এসে দেখা যায়, পূর্ববঙ্গকেই ধান আমদানি করতে হয়েছিল বার্মা থেকে।

লেখকের মতে, পূর্ববঙ্গে গ্রামীণ দারিদ্র্য শুরু হয়েছে কেবল বিশ শতকে এসে (পৃ. ১৮৪)। লেখকের এ অভিমত নিয়ে বিতর্ক রয়েছে বা থাকতে পারে। উনিশ শতককে লেখক কৃষি সমৃদ্ধির সময় হিসেবে দেখালেও অনেকে দেখিয়েছেন, গ্রামীণ দারিদ্র্য, কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর দুরবস্থা লেখকের উল্লিখিত কৃষি সমৃদ্ধির শতকে বা এর আগেও কমবেশি ছিল। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদ রমেশ চন্দ্র দত্ত এবং দাদাভাই নওরোজী বিশ শতকের প্রথমার্ধে তাঁদের গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু থেকেই ব্রিটিশ নীতি, সম্পদ শোষণ এবং নির্গমনের ফলে এ অঞ্চলের অর্থনীতিকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। এ বিষয়ে রমেশ চন্দ্র দত্ত এবং দাদাভাই নওরোজী অনেক পরিসংখ্যানও প্রদান করেছেন।[৮] কৃষির সমৃদ্ধির যুগেও বাংলার গরিব কৃষকদের অবস্থা যে আজকের দিনের চেয়ে খুব একটা ভালো ছিল, তা বলা যায় না। তাঁরা সব সময়ই শোষণের শিকার হয়েছেন। কখনো বা মোগল রাষ্ট্রযন্ত্র, জমিদার, ব্রিটিশ শোষণ বা ধনী কৃষকদের শোষণের শিকার হয়েছেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন সময়ে বাংলায় দুর্ভিক্ষ গ্রামীণ দারিদ্র্যের প্রমাণ বহন করে। তবে সরকারি বিভিন্ন প্রতিবেদন ব্যবহার করে ইকবাল দেখিয়েছেন যে উনিশ শতকে বাংলার, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের, কৃষকেরা সচ্ছল ছিলেন। সরকারি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তিনি

দেখিয়েছেন, উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা কম ছিল এবং বেশির ভাগ কৃষকই দিনে দুই বেলা এবং তিন বেলা পেট পুরে খেতে পেরেছেন। তবে সরকারি এসব প্রতিবেদন সম্পূর্ণ নয়। ইকবাল শুধু দুই বা তিনটি অঞ্চলের ক্ষেত্রে এ প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া দুই বেলা বা তিন বেলা পেট পুরে খেতে পেলেই যে গ্রামীণ দরিদ্রতা ছিল না বা কৃষকেরা সচ্ছল ছিলেন বলে ইকবাল মনে করছেন, তা ভেবে দেখার বিষয়। সে সময় কৃষকদের বার্ষিক আয় কী রকম ছিল, কত ভাগ কৃষক ভালো বা মোটামুটি ভালো আয় করতেন আর কত ভাগ দারিদ্র্যসীমার নিচে আয় করতেন, তা প্রাসঙ্গিকভাবেই পাঠকের জানার আগ্রহ জাগে। সচ্ছলতার যেসব মাপকাঠি, যেমন উনিশ শতকে গ্রামীণ কৃষকেরা কী কী শৌখিন দ্রব্য উপভোগ করতেন বা তাঁদের সঞ্চয়ই ছিল কি না, তা-ও জানার বিষয়। সে কারণে লেখক যেকথা বলছেন—'Rural poverty in the area that is now Bangladesh emerged only in the twentieth century'—তা জোরালোভাবে প্রমাণ করার জন্য দরকার ছিল আঠারো, উনিশ এবং বিশ শতকে গ্রামীণ কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা।

কিছু কিছু সমালোচক বলেছেন, যে ইকবাল ঔপনিবেশিক যেসব সরকারি প্রতিবেদন এবং তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করেছেন, সেসব আরও সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ব্যবহার করা দরকার ছিল। তা ছাড়া ষষ্ঠ অধ্যায়ে (১১৭-১৩৯) লেখক রেলওয়ে এবং পরিবেশ ধ্বংস ও কৃষির অবনতি নিয়ে যেসব যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, ইতিহাসবিদ পিটার রবের মতে তা একপক্ষীয়। রেলওয়ের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ ও কৃষি ধ্বংসের কথা ইকবাল বলছেন, কিন্তু রেলওয়ে বিস্তার বাংলার অর্থনীতিতে কোনো অবদান রেখেছিল কি না, তা তুলনামূলকভাবে পরীক্ষা করা দরকার ছিল বলে তিনি মনে করেন।[৯] তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া ঔপনিবেশিক নথি ব্যবহারের যে কথা পিটার রব বলেছেন, তা পুরোপরি ঠিক নয়। কারণ, গ্রন্থজুড়েই দেখা যায় ইকবাল সরকারি বিভিন্ন নথিকে প্রশ্ন করছেন। একটি নথির সঙ্গে আরেকটি নথির তথ্যকে যাচাই করছেন। এ ছাড়া ঔপনিবেশিক নথি ছাড়াও অন্যান্য নথির সঙ্গে সেগুলো যাচাই করেছেন।

কেউ হয়তো বলতে পারেন যে পরিবেশতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বা পরিবেশকে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে অন্য অনেক বিষয়কে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে হয়তো ঔপনিবেশিক ইন্টারভেনশন বা হস্তক্ষেপ, নিদারুণ ঔপনিবেশিক শোষণ এবং সম্পদ পাচারকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, যা এ অঞ্চলের ভালোমন্দের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল বলে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ তত্ত্বের অনুসারীরা মনে করেন। বিশেষ করে, দেওয়ানি লাভের পর ঔপনিবেশিক সরকারের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষাও বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল।

কোনো কোনো সমালোচক, যেমন পিটার রব, গ্রন্থটির বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কের অভাব দেখেছেন। এটা ঠিক যে *বেঙ্গল ডেল্টার* অধ্যায়গুলো বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা এবং আঁটসাঁট বন্ধনে আবদ্ধ নয়। তবে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়ই পরিবেশের সঙ্গে জড়িত। প্রতিটি অধ্যায়েই পরিবেশ এসেছে এবং পরিবেশ ও পরিবেশগত পরিবর্তনকে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিরীক্ষা করা হয়েছে। এভাবে একটি অধ্যায়ের সঙ্গে আরেকটি অধ্যায় কোনো না কোনো সূত্রে গাঁথা হয়েছে। গ্রন্থটিতে ইকবাল বাংলা বদ্বীপের অনেক অমীমাংসিত এবং বিতর্কিত বিষয়ের ওপর আলো ফেলেছেন এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দাঁড় করিয়েছেন। সেদিক দিয়ে ইকবালের *দ্য বেঙ্গল ডেল্টা* উপমহাদেশের, বিশেষ করে বাংলা বদ্বীপের ইতিহাসচর্চায় একটি নতুন সংযোজন এবং এ অঞ্চলের ইতিহাসতত্ত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

তথ্যসূত্র

১. *Late Victorian Holocausts:El Niño Famines and the Making of the Third World*, Mike Davis-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে লেখক উপনিবেশবাদের প্রভাব এবং পুঁজিবাদের সূচনা এবং এর সঙ্গে দুর্ভিক্ষের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ইফতেখার ইকবাল এখানে 'ভিক্টোরিয়ান হলোকাস্টকে' দুর্ভিক্ষের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

২. ফরায়েজি আন্দোলন হলো উনিশ শতকে বাংলায় হাজী শরীয়তউল্লাহর নেতৃত্বে সংগঠিত অন্যতম বড় সংস্কার আন্দোলন। প্রাথমিক পর্যায়ে এটি ধর্ম সংস্কার আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠলেও পরবর্তী সময়ে এটি আর্থসামাজিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন ব্যাপকসংখ্যক কৃষক। এটাও দেখা গেছে যে হিন্দু কৃষকেরাও এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন, Muin-ud-Din Ahmed Khan, *History of the Fara'idi Movement in Bengal, 1818-1906* (Karachi: Pakistan Historical Society, 1965).

৩. উল্লিখিত সময়ে পার্বত্যাঞ্চলে উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহের মধ্যে ছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ ও খাসিয়া বিদ্রোহের মতো আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিদ্রোহ ।

৪. এ মতের অন্যতম প্রবক্তা হলেন সুগত বোস, বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Sugata Bose, *Agrarian Bengal: Economy, Social Structure and Politics, 1919–1947* (Cambridge, 1986); আরও দেখুন, Sugata Bose, *Peasant Labour And Colonial Capital* (Cambridge: Cambridge University Press , 2007).

৫. দেখুন, Ahmed Kamal, *State Against Nation: The Decline of the Muslim League in Pre-independence Bangladesh, 1947-54* (Dhaka: The University Press Limited, 2009), পৃ. ১৪৮-৯।

৬. বিস্তারিত জানতে দেখুন, Amartya Sen, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation* (New Delhi: Oxford University Press, 1981).

৭. Tariq Omar Ali, ``The Envelope of Global Trade: The Political Economy and Intellectual History of Jute in the Bengal Delta, 1850s to 1950s,'' (PhD Dissertation, Harvard University, 2012).

৮. দেখুন, Romesh Dutt, *The Economic History of India: In the Victorian Age from the Accession of the Qeen Victoria in 1837 to the Commencement of the Twenteith Century* (London: Kegan Paul, 1902); Dadabhai Naoroji, *Poverty and Un-British Rule in India* (India:Minstry of Information and Broadcasting, 1988), আরও দেখুন Bipin Chandra Pal, *The Rise and Growth of Economic Nationalism in India* (India: Anamika Publishers, 2004).

৯. দেখুন পিটার রবের রিভিউ, can be accessed at http://www.history.ac.uk/reviews/review/1083

লেখক পরিচিতি

হোসেন জিল্লুর রহমান

অর্থনীতি ও রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। দীর্ঘ দুই দশক ধরে তিনি বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের নির্বাহী চেয়ারম্যান। সরকার, উন্নয়ন সহযোগী ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দারিদ্র, স্থানীয় সরকার, ভূমি সংস্কার, সুশাসন, উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক উত্তরণের নানাবিধ গবেষণার সঙ্গে দেশে ও দেশের বাইরে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ : *রি থিংকিং রুরাল পোভার্টি* (সেইজ, ১৯৯৫); *মাঠ গবেষণা ও গ্রামীণ দারিদ্র* (ইউপিএল, ১৯৯৩); *কমিউনিটি ক্যাপাসিটি অ্যান্ড লোকাল গভর্ন্যান্স ইন বাংলাদেশ* (ইউপিএল, ২০০২)।

আল মাসুদ হাসানউজ্জামান

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান। তিনি ব্রিটেনের বাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিল স্কলার, যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনিয়র ফুলব্রাইট স্কলার এবং জাপানের কানাজাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপান ফাউন্ডেশন ফেলো ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ : *রোল অব অপোজিশন ইন বাংলাদেশ পলিটিকস*, (ঢাকা : ইউপিএল); সম্পাদিত গ্রন্থ *বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ*, (ঢাকা : ইউপিএল); *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র, রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স*, (ঢাকা : ইউপিএল); এবং *পলিটিক্যাল ম্যানেজমেন্ট ইন বাংলাদেশ*, (ঢাকা : এএইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস)।

সাঈদ ইফতেখার আহমেদ

বর্তমানে আমেরিকান পাবলিক ইউনিভার্সিটির স্কুল অব সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজের অস্থায়ী শিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন। প্রকাশনা— *ওয়াটার ফর পুওর উইম্যান : কোয়েস্ট ফর অ্যান অলটারনেটিভ প্যারাডাইম* (লেনহাম : লেক্সিংটন বুকস, ২০১৩); লেখালেখির বিষয়— পানি, শাসনব্যবস্থা, ইসলামি মতাদর্শ, গণতন্ত্রায়ণ, জেন্ডার ও উন্নয়ন।

মুহাম্মদ লুৎফুল হক

১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আর্টিলারি কোরে কমিশন পান। ২০০৫ সালে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে অবসর নেন। বাঙালির সামরিক ইতিহাস এবং স্বাধীনতাযুদ্ধ নিয়ে গবেষণা করছেন। প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থ :

স্বাধীনতাযুদ্ধের বীরত্বসূচক খেতাব (২০০৬); *বাঙালি পল্টন: ব্রিটিশ ভারতের বাঙালি রেজিমেন্ট* (২০১২)। সম্পাদনা গ্রন্থ: *রাজশাহী ১৯৭১* (যৌথ, ২০১২); *কামালপুর ১৯৭১* (২০১২); *মুক্তিযুদ্ধে ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্স* (২০১৩); *দিনাজপুর ১৯৭১* (২০১৩)।

সুমন রহমান

কবি, কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক। নগর, জনসংস্কৃতি ও গণমাধ্যমের সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন তাঁর বিদ্যাজাগতিক আগ্রহের বিষয়। সাংস্কৃতিক অধ্যয়নে পিএইচডি করেছেন অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব কুইন্সল্যান্ড থেকে; বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসের (ইউল্যাব) মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *কানার হাটবাজার* (নগর, জনসংস্কৃতি ও গণমাধ্যমের পঠন), *গরিবি অমরতা* (গল্পগ্রন্থ), *সিরামিকের নিজস্ব ঝগড়া* (কাব্যগ্রন্থ) ও *ঝিঁঝিট* (কাব্যগ্রন্থ) ইত্যাদি। এ ছাড়া *নারী ও প্রগতি, বনপাংশুল, জার্নাল অব মাইগ্রেশন অ্যান্ড কালচার, জার্নাল অব ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশনস, এশিয়ান জার্নাল অব কমিউনিকেশনস*সহ নানা দেশি-বিদেশি খ্যাতনামা জার্নালে তাঁর প্রবন্ধাবলি প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

মুনির-উজ-জামান

কবি ও লেখক। বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে সচিব ও পরে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে লেখালেখি করে থাকেন। কবি শামসুর রাহমানের বাছাইকৃত কবিতাসমূহ নিয়ে তাঁর ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ *শামসুর রাহমান: কালেকশন অব পয়েমস (২০১০)* প্রকাশ করেছে আপন চিত্র প্রকাশনা, কলকাতা।

আজিজুল রাসেল

লেখক ও গবেষক। বর্তমানে *প্রথম আলো*তে সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত। পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেদারল্যান্ডসের লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা—প্রবন্ধ: 'আরমেনিয়ান ডায়াসপোরা ইন বেঙ্গল: ট্রেড অ্যান্ড পলিটিকস ইন দ্য সেভেনটিন্থ অ্যান্ড এইটিন্থ সেঞ্চুরিজ' (*বাংলাদেশ হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ*, সংখ্যা ২২, ২০১০-২০১২); গ্রন্থ: *দ্য সেভেনটিন্থ সেঞ্চুরি ডাচ ট্রাভেল লিটেরেচার অ্যান্ড দ্য প্রডাকশন অব নলেজ অন এশিয়া* (২০১৩)।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তার* গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। অফিসে সরাসরি উপস্থিত হলেই শুধু নগদ টাকা গ্রহণ করা হবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুই শত) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চার শত) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/ বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/ দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/ পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি গ্রাহক কার্ড দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ (সিএ ভবন), কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৮১

'আমি মাহবুবুর রহমান

অনার্স (৪ বছর) পরীক্ষা দিয়েই

S@ifur's-এ
Hotline : 01713 432056

প্রিলি, রিটেন ও viva কোচিং করি এবং ৩১তম BCS পররাষ্ট্রে 2nd হই !'

ঘরে বসে

BCS ৩৪তম প্রস্তুতির জন্য
২০০০/- টাকায়

S@ifur's-এর BCS লিখিত কোচিং-এর ৬৫-টি লেকচার শীট পাওয়া যাচ্ছে হেড অফিস পান্থপথে !
(৬৯/বি, মনোয়ারা প্লাজা, ৬ষ্ঠ তলা, গ্রীনরোড, পান্থপথ)

ঢাকার বাহিরে কুরিয়ার যোগে পেতে:
01713 432056

হেড অফিস পান্থপথ
01817 110600

নীলক্ষেত	01713 432072
যাত্রাবাড়ী	01713 432009
মৌচাক	01713 204783
পুরনো ঢাকা	01713 004576
গাজীপুর	01713 432035
ময়মনসিংহ	01713 432028
চট্টগ্রাম	01713 432044
আগ্রাবাদ	01714 163638
GEC মোড়	01713 432075

BCS ৩৫তম প্রিলি ভর্তি চলছে !

ফার্মগেট
01713 432007

আসাদগেট	01198 013113
উত্তরা	01198 013115
মিরপুর-১০	01198 013114
নারায়ণগঞ্জ	01713 035053
মধ্যবাড্ডা	01713 004574
রংপুর	01713 432023
বগুড়া	01713 432038
সিলেট	01714 000998
আম্বরখানা	01713 432008

৩৪তম প্রিলি.-তে ৯২-টি প্রশ্ন কমন এসেছে S@ifur's-এর BCS কোচিং-এর লেকচার শীট থেকে !

Our recent achievement...

Best Financial Institution of Bangladesh Award

In recognition of its consistent performance, Bangladesh Business Award by DHL - Daily Star, awarded Pubali Bank as the Best Financial Institution 2010.

Country's largest online network with 405 branches

With in-house software - Pubali Integrated Banking System (PIBS) - evaluated by PwC, the bank launched its online Banking - becoming the largest online network of the country with 405 branches

Largest Private Bank with 419 branches

Rather than focusing on only in metro areas, to reach the rural economy, the Bank has established 419 branches all over Bangladesh - largest network in private sector banks

Double A Three Credit Rating

Credit Rating Authority of Bangladesh (CRAB) has rated AA3 signifying "Very Strong Capacity" in long term and ST1 signifying "Highest Grade" in short term

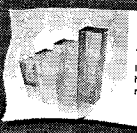

Highest ever growth achieved by Pubali Bank

In the year 2010, the Bank continued its consistent performance and has marked the highest ever growth

One of the largest private sector recruiters

The bank is ensuring employment of Bangladeshi talents through massive recruitment and proper training - this year 550 officers joined the Pubali family

Diverse list of products

The bank introduced diversified products to cater the financial needs of a larger scale - Innovation and emphasis on agriculture, foreign wage earners scheme, remittance, SME, trade finance etc

Introduced Islamic Banking

With increasing demand, the Bank has opened its Islamic wing

Special recognition for CSR

Huge contribution for disaster management, development of health sector, supporting local sports and different other social contributions brought the Special Recognition for CSR by Banker's Forum and others.

...we will continue to strive for excellence in coming days

PUBALI BANK LIMITED

www.pubalibangla.com

DBBL ATM এ প্রকৃত কার্ডবিহীন লেনদেন

বিশ্বে এই প্রথম

ডাচ-বাংলা ব্যাংক
মোবাইল ব্যাংকিং

এখন:
DBBL ATM এ লেনদেনের জন্য কোন ডেবিট কার্ডের প্রয়োজন নেই।
এমনকি DBBL ATM এ লেনদেনের জন্য কোন ক্রেডিট কার্ডেরও প্রয়োজন নেই।
শুধুমাত্র DBBL মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট এবং আপনার মোবাইল ফোন নম্বরটি-ই
DBBL ATM এ প্রকৃত কার্ডবিহীন লেনদেনের জন্য যথেষ্ট।

সকল মোবাইল অপারেটরের গ্রাহকগণ এই সেবা উপভোগ করতে পারবেন।

ডাচ-বাংলা ব্যাংক
আপনার বিশ্বস্ত সহযোগী

আশিয়ান হাসপাতাল

সর্বাধুনিক চিকিৎসা সেবার প্রত্যয়ে

২৪ ঘন্টা সেবা সমূহ

জরুরী বিভাগ
ফার্মেসী
এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস

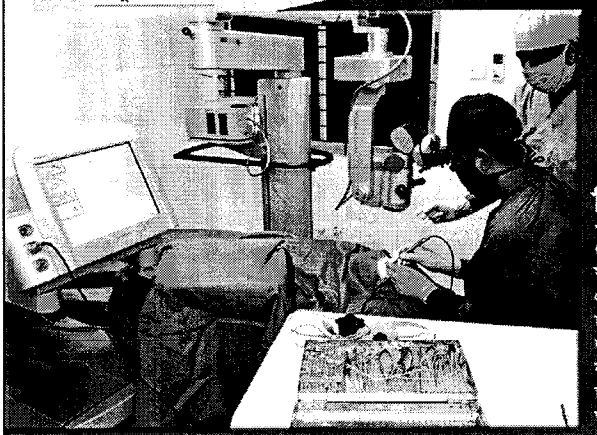

বিভাগসমূহ

মেডিসিন বিভাগ
সার্জারী বিভাগ
প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিভাগ
চর্ম ও যৌনরোগ বিভাগ
দন্ত রোগ বিভাগ
নাক কান গলা বিভাগ
চক্ষু বিভাগ
অর্থোপেডিক বিভাগ
হৃদরোগ বিভাগ
মনোরোগ বিভাগ
কার্ডিওলজি বিভাগ
ফিজিওথেরাপি বিভাগ
রেডিওলজি ও ইমেজিং বিভাগ
এ্যানেসথিসিওলজি বিভাগ
নেফ্রোলজি বিভাগ
ইউরোলজি বিভাগ

নিয়মিত সেবাসমূহ-

* ৬৪ স্লাইস সিটি স্ক্যান * এম আর আই * 4D আল্ট্রাসনোগ্রাম * ডিজিটাল এক্সরে * ওপিজি ডেন্টাল এক্সরে
* ইসিজি * ইকোকার্ডিওগ্রাফী * ভিডিও এনডোসকপি * লেজার স্কীন * ল্যাপরোস কপি
* উন্নতমানের ডায়ালাইসিস ইউনিট * নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্র * শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ওয়ার্ড ও কেবিন
* অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার * আইসিইউ

বকুয়া, বিলক্ষেত, ঢাকা-১২১৯, ফোন: ৮৯৯৯৫৪৩, ৮৯৯৯৫৮০-৮১, মোবাইল: ০১৮৪১-১৩৩৫০১, ০১৮৪১-১৩৩৫০৩, ০১৮৪১-১৩৩৫০৬
e-mail: info@ashiyanhospital.com, web: www.ashiyanhospital.com

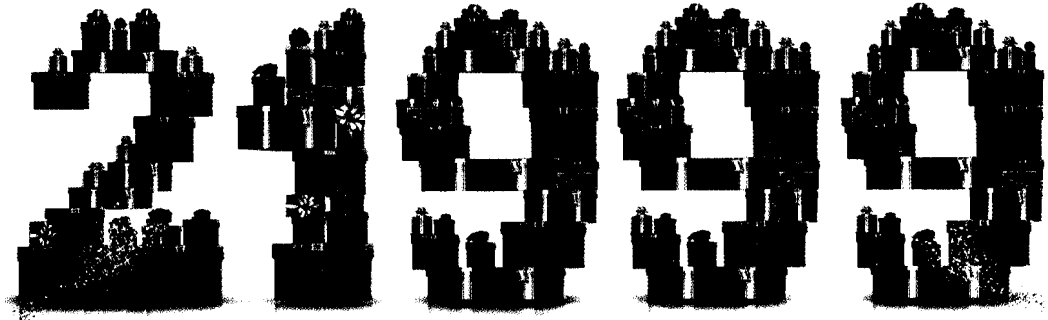

ঘ্যাচাং স্টোর-এ দারুণ সব অফার
Robi লিখে ফ্রি এসএমএস করুন ২১৯৯৯ নম্বরে
21999
আপনার অফার বুঝে নিতে Robi লিখে এসএমএস করুন ২১৯৯৯ নম্বরে অথবা
ডায়াল করুন *৯৯৯#-এ, আর ফিরতি এসএমএস-এ জেনে নিন আপনার ঘ্যাচাং অফার।
জ্বলে উঠুন আপন শক্তিতে
রবি
an axiata company

প্রতিচিন্তা, রেজি. নং-ডিএ নং ঢাকা ৬১০৭, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩, দাম ৫০ টাকা

banglalink™

দিন বদলের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক...
বাংলালিংক নেটওয়ার্ক